নিশ্চিন্তপুরের মানুষ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৭

—সাড়ে পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অংকন—কানাই পাল

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬
হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

পারুলকে

নিশ্চিন্তপুরের মানুষ

মনে হবে বিংশশতাব্দীর এক সভ্য শহরের বুকে আশ্চর্য একটা প্রদর্শনী খুলে দিয়েছে কে। প্রদর্শনী বটে! এখানে দর্শনীয় বস্তু কংকালসার কতকগুলি মানুষের মুখ—ভীত সন্ত্রস্ত বুভুক্ষু দৃষ্টি নিয়ে ওরা তাকিয়ে থাকে। দর্শনীয় বস্তু ছেঁড়া চট মাদুর কাঠের বাকল কি তালপাতার তৈরী তিন হাত পাঁচ হাত সারি সারি ডেরা। দাঁড়ানো দূরে থাক পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসতে গেলেও শুকনো পাতার চালে মাথা ঠেকে, পাতা মচমচ করে ওঠে, গোটা ছাউনিটা কাঁপতে থাকে। একটু জোরে ধাক্কা লাগলে ভেঙে পড়তে কতক্ষণ! ভালো করে হাত-পা টান করে শোবার উপায় নেই। পচা চটের বেড়া ফুটো হয়ে পা বেড়িয়ে পড়ে, হাত বেরিয়ে পড়ে। হয়তো পায়ের গোড়ালি কি হাতের তেলো গিয়ে ঠেকে রোদে পোড়া পেভমেণ্টের গরম সিমেণ্টে। তখন পায়ে ছেঁকা লাগে হাতের আঙুলে ছেঁকা লাগে। আরাম করতে গিয়ে আরাম করা হয় না। তাড়াতাড়ি হাত-পা গুটিয়ে আবার খুপরির ভিতর টেনে আনতে হয়। এমন একটা না, রাস্তার দু-ধারে চট আর পাতার তৈরি দেড়শ ছাউনি চৈত্রের আগুনঝরা রোদ, কার্তিকের হিম, শ্রাবণের পচা আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। বছর ঘুরে গেছে। ছাউনি গুটিয়ে এরা এখান থেকে সরে যাবে দূরে, থাক, আর একদল এসে ওধারের রাস্তায় ঘর বেঁধেছে। আরো দু-শ। এরা ঢাকার ওরা বরিশালের। ওরা ঘর বেঁধেছে মানে সেই চট আর শুকনো পাতা আর কাঠের বাকল আর আধখানা উইয়ে খাওয়া আধখানা পুড়ে যাওয়া বাঁশের খুঁটি একত্র করে ডেরা তুলেছে। তা হলেও তো আশ্রয়। কিন্তু সারাক্ষণ যেখানে কাঠের ছাল বাকল, কাগজ, ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে আনা শালপাতা আর পচা তুলো ন্যাকড়া জেলে তিন ইটের উনুনে এই পরিবারের চালের খুদ, ঐ পরিবারের হলদে শুকনো কপির ডাঁটার সঙ্গে কিছু পোকায় খাওয়া বেগুন ও পাটখড়ির মত সরু ঝনঝনে পাকা সজনে ডাঁটার মিশেল তরকারী, কি আর এক পরিবারের জলের মত পাতলা টলটলে বিউলি বা খেসারি ডাল সিদ্ধ হচ্ছে, সেখানে সারাক্ষণ কী পরিমাণ ধোঁয়া সৃষ্টি হতে পারে তা কল্পনা করা একটুও কষ্টকর না। কাঠ-গোলা থেকে কুড়িয়ে আনা গাছের ভেজা ছাল বাকল অথবা রাস্তার জঞ্জাল থেকে তুলে আনা পচা তুলো ন্যাকড়া শালপাতা যতটা আগুন দেয় ধোঁয়া ছড়ায় তার আটগুণ বেশি এ তো জানা কথা। আর সেই ধোঁয়া এই ডেরার ছেঁড়া চটের বেড়া ডিঙিয়ে ঐ ডেরায় গিয়ে ঢোকে। ওদিকের ধোঁয়া এদিকে আসে। সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত কারোর না কারোর তিন ইটের উনুনের ধিকিধিকি আগুনে এটা ওটা সিদ্ধ হচ্ছে। উপায় কি। এটা তো আপিসের বাবুদের, কি এক সময় দোকানপাট গুটিয়ে বাবা ঘরে

ফিরে ধীরেসুস্থে 'খাওয়াদাওয়া' সারে তাদের সংসার ঘরবাড়ি নয়। এখানে কাঠ থাকলে চাল থাকে না, তেল থাকলেও হলুদ লঙ্কার জোগাড় হতে সময় নেয়—গাদা গাদা সজনে আর কপির ডাঁটা এসে গেল তো কেবল তাই এখন সিদ্ধ করে উনুন নিবিয়ে রাখো—যখন চালের জোগাড় হবে আবার উনুন ধরাবে। এই পরিবার যখন খেয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ করছে তখন সেই পরিবারের সবে কাঠ এসে ডেরায় পৌঁছেছে। কাজেই—

চব্বিশ ঘণ্টা এদিকের ধোঁয়া আর ওদিকের দু-মিনিট অন্তর রাশি রাশি কাঁচা কয়লার ধোঁয়া ছড়িয়ে হুইসেলের তীব্র আর্তনাদ তুলে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াচ্ছে, একটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে। কাজেই এ তল্লাটে আকাশ বাতাস সারাক্ষণ কালো বিষণ্ণ। মনে হয় এখনি একটা ঝড় উঠে প্রলয়কাণ্ড ঘটবে, কি জোরে বৃষ্টি নামবে। এমন বিশ্রী এমন বিদঘুটে আবহাওয়া। এমন যে ফাল্গুনের ফুরফুরে সকাল তা শেয়ালদা স্টেশনের ধোঁয়াটে অপরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে কারো মনে হবার কথা না। কেমন একটা গা-বমি-করা গুমোট ভাব চার দিকে ছড়িয়ে আছে। বাইরেই এমন তো তিন হাত পাঁচ হাত খুপরিগুলোর ভিতরের অবস্থা যে আরো ভয়ংকর হবে তা কে না বোঝে। কাজেই কাক না ডাকতে, পুবের আকাশে ভালো করে আলোর ইশারা না জাগতে ওরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে দল বেঁধে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, বয়সের দিক থেকে ওরা প্রায় সমান। তাই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটা বেশি। বারো থেকে চোদ্দ, বড়জোর পনেরো বছর। তার ওপর কারও বয়স না। বয়সের দিক থেকে তো বটেই, সময় ও অবস্থার দিক থেকেও আজ ওরা পাঁচটি ছেলে সমান হয়ে গেছে। তেমনি শরীর, বুঝিবা মুখের আকৃতির দিক থেকেও। ফরিদপুরের অনন্ত চক্রবর্তীর মোটাসোটা নাদুসনুদুস ফর্সা ধবধবে চেহারার কানুর সঙ্গে বরিশালের বিনোদ কর্মকারের কালো রোগা ঢ্যাঙ্গা চেহারার নিমাইয়ের আজ আর তেমন একটা অমিল নেই। ঢাকার মদন ঢুলির ছেলে পলাশ, বিক্রমপুরের বিধু আচার্যের ছেলে সুকুমার, সব—সবাই এখন এক রকম দেখতে। ছেঁড়া ময়লা হাফ-প্যান্ট পরনে, গায়ে দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, চোখগুলো গর্তে ঢুকেছে, চুলগুলো বড় হয়ে কানের ওপর এসে নেমেছে। চুল পোশাক গায়ের রং যেমন এক হয়ে গেছে তেমনি ওদের চাউনি হাবভাব কথা হাঁটা। পর্যন্ত হাসিটা। ভীরু বিষণ্ণ চোখ মেলে পাঁচ জন যখন সেই কাকভোরে স্টেশনের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে আলো-জ্বালা ট্রামের পাশে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তখন কেউ যদি দয়াপরবশ হয়ে এক আধটা পয়সা কারো দিকে ছুঁড়ে দেয় তখন সবাই ছাতাপড়া হলদেটে দাঁত বার করে একরকম করে হাসে। পেভমেণ্টের শানের ওপর ঠুন্ করে পয়সাটা ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তারা হাসি বন্ধ করে যুদ্ধে নেমে যায়। ধ্বস্তাধ্বস্তি ঠেলাঠেলি মারামারি,

কে পয়সা আগে কুড়িয়ে নেবে। একটা মুদ্রা, মাত্র একটা ডবল পয়সা। কাজেই একজন শেষ পর্যন্ত পয়সাটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে উঠে দাঁড়ায়। তখন বাকি চারজন আর ধ্বস্তাধ্বস্তি কাড়াকাড়ি বা মারামারি করে না। স্থির হয়ে যায়। এমন কি নিমাই পয়সাটা কুড়িয়ে পেল বলে তারা যে তাকে ঈর্ষা করবে বা তার দিকে তাকিয়ে রাগ করে ভেংচি কাটবে তা-ও না। বরং ভীরু বিষণ্ণ চোখ মেলে দূরের বাসটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাস এসে দাঁড়াবামাত্র ওরা জানলার কাছে হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার সেই একটি মুদ্রা—একটা ফুটো পয়সা। হলদেটে বিবর্ণ দাঁতে পাঁচজন একসঙ্গে হাসে। শানের ওপর ফুটো পয়সার করুণ মৃদু আওয়াজ। ধ্বস্তাধ্বস্তি ঠেলাঠেলি। তারপর শান্ত সব, স্থির। এবার কানু কুড়িয়ে পেয়েছে। হাতে একটা ডবল কি ফুটো পয়সা। তার বেশি এখানে আশা করা পাগলামি। 'চ—চ—' বিরক্ত হয়ে একজন আর একজনের হাত ধরে টানে।

হ্যাঁ, বরিশালের কথার এক টান, খুলনার আর এক রকম। ফরিদপুরের কথার অন্য সুর অন্য টান। আজ কিন্তু পাঁচজনের কথার সুর একরকম হয়ে গেছে, এক হয়ে যাচ্ছে। ওরা বুঝতে পারছে না যদিও। কেবল এটুকু ওরা বুঝেছে এর নাম কলকাতা। এখানে মানুষ 'খাইতিছি'-কে খাচ্ছি বলে, 'যেইতেছি'-কে যাচ্ছি বলে। তাই ওরাও এখানকার রাস্তা দোকান বাজার ফেরিওয়ালা ট্রামের লোক বাসের লোক ট্যাক্সির লোকের কাছাকাছি থাকার সুবিধা ভেবে এবং পরিষ্কার করে হুট্‌হাট্ 'খাচ্ছি' 'যাচ্ছি' গুলো বলতে না পেরে 'খাইচ্ছি' 'যাইচ্ছি' 'বইচ্চি' 'রাস্তা মেড়ানো' এবং 'চল্'—কে 'চ' বলতে আরম্ভ করেছে। নিজেদের মধ্যে যখন কথা হয় তখনও। তা না হলে তাড়াতাড়ি এই শহরে চলবার দাঁড়াবার বুঝি বা টিকে থাকবার ছাড়পত্রও পাওয়া যাবে না এই আশঙ্কা কি? হয়তো তাই।

না হলে কানুর বাবা অনন্ত যখন চাটাইয়ের ছাউনির ভিতর গালে হাত দিয়ে বসে দেশের ক্ষেতখামার পুকুর ভিটে গোরুবাছুর হাঁস ছাগলের কথা চিন্তা করছে তখন কানু কেন এই শহরের ট্রামবাস রাস্তা বাজার দোকান আর চারিদিকে ছড়ানো লাখ লাখ মানুষের চলাফেরা কথা এমন খুঁটে খুঁটে লক্ষ্য করছে। তেমনি নিমাই। বিনোদ কর্মকার পেভমেণ্টের ছাউনির তলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে তার দেশের ছেড়ে আসা দোকানটার কথা ভাবছিল। আজ হাটবার। পাঁচটা গাঁয়ের লোক এসেছে বিনোদের দোকানে। সব গোল হয়ে বিনোদের হাপরের কাছে বসে গল্প করছে। বিনোদের দুজন কর্মচারী। বাবলার কাঠ চেঁছে তাতে লাঙলের ফলা জুড়ে দেওয়া, নয়তো গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড়ি পরানো। তা ছাড়া বঁটি খুন্তি গড়াপেটার টুকটাক কাজ আছে। ছিল। আজ সেসব কোথায়!

বিনোদ ভুলতে পারছে না, কিন্তু তার ছেলে চৌদ্দ বছরের নিমাই আঠারো মাসে সব ভুলে এখন কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে ওধারের বড় রেস্টুরেন্ট দেখছে। এই মাত্তর বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মোটা লোকটা দোকানে ঢুকে কেমন মজা করে ডিম রুটি চা খাচ্ছে। যদি এই শহরেই এসে গেল তো নিমাই কবে ওখানে ঢুকে এমন মজা করে খেতে পারবে এই চিন্তা তার মাথায় ঢুকে তাকে বড় বেশি অস্থির করে তুলছে কটা দিন। বিধু আচার্য অনেকদিন স্বর্গীয় হয়েছে। দাদা আর বিধবা মায়ের সঙ্গে সুকুমার দেশ ছেড়ে চলে এল। সুকুমারের দাদা জগদীশ দেশ বাড়ির কথা যে না ভাবে তা না। আবার এখানকার কথাও ভাবে। পঁচিশ বছরের যুবক মাথায় হাত দিয়ে বসে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে না। এখানে কোথায় 'অকল্যাণ্ড', কোথায় 'রাইটার্স-বিল্ডিংস' এবং সেসব জায়গায় তদ্বির-টদ্বির করিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে কিনা কুমিল্লার নগেন ফরিদপুরের অমূল্য বরিশালের ভুবন সরকারের শালা নিত্যানন্দর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চেষ্টা করছে। হয়তো পনেরো দিন সমানে ওরা হাঁটাহাঁটি করল। ওখান থেকে বাবুরা এসে নামধাম নিয়ে গেল, 'বর্ডার সিলিপ' পরীক্ষা করল। তারপর আবার সব চুপচাপ। তারপর দীর্ঘসময় বেকার থেকে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখন এই স্টেশনের চৌহদ্দির ভিতর জগদীশ বিড়ির দোকান খুলে বসেছে। এই দোকানের খদ্দের চট চাটাই মাদুর আর পাতার ছাউনির লোকেরা। দেখাদেখি নিত্যানন্দ ওধারে পানের দোকান খুলেছে। অমূল্য কি করে, সন্ধান পেয়ে আজ চার পাঁচ দিন ধরে সেই কাকভোরে মেটিয়াবুরুজ চলে যায়। সেখানে মাটি খোঁড়ার কাজ পেয়েছে। অমূল্য নিত্যানন্দ জগদীশ নগেন এরা সমবয়সী। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বয়স। কচি বৌ, একটা দুটো তিনটে করে বাচ্চা, বুড়ো বাপ মা কি বয়স্থা বোন এদের ঘাড়ে ঝুলছে। কাজেই এরা কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। নগেন অগত্যা কিছু করতে না পেরে চীনাবাদাম ফেরি করে বিক্রি করতে লেগে গেছে। তা ছাড়া এখানে পাঁচশো পরিবারের মধ্যে না হলেও তিনশো পরিবারে বয়স্থা মেয়ে, যুবতী স্ত্রী আছে। হয়তো আরো বেশি। স্টেশনের বারোয়ারী পায়খানা প্রস্রাবখানা জলের কলে এদের না গিয়ে উপায় নেই। স্টেশনের কলে ভিড় লেগে গেলে কলসী ডেকচি নিয়ে ওদের রাস্তার কলে জল ধরতে যেতে হয়। আর তার সুযোগ নিতে দিনরাত এখানে গুণ্ডা বদমায়েশরা মাছির মত ঘোরাঘুরি করে। অমূল্য টের পেয়েছে, নগেন টের পায়, জগদীশ টের পাচ্ছে। তাই তারা নিজেদের তো বটেই ভিন্ন পরিবারের মেয়েছেলের ওপর যতটা পেরেছে চোখ রেখে চলেছে। এসব নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে অনেকদিন কথা হয়েছে। কেউ বিপদে পড়লে কোন গুণ্ডা বদমায়েশ কারো বৌ-ঝির গায়ে হাত তুলেছে দেখলে বা

খবর পেলে ওরা সব দল বেঁধে ছুটে যাবে। ঝাঁপিয়ে পড়ে বদমায়েশের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। জোয়ান বয়স। ওরা যদি এ কাজে এগিয়ে না যায় তবে কে যাবে।

কাল এই ধরনের একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছিল। বীরভূমের কোন্ কলোনি থেকে পরিবারটা শেয়ালদা ফিরে এসেছে। সেখানে এবার বর্ষার সময় ঘরে জল উঠেছে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সেঘরে বাস করা মানুষের 'অসাধ্য'। সুতরাং আবার যে-কে-সে। আবার শেয়ালদার প্ল্যাটফর্ম। চট চাটাই মাদুর ন্যাকড়ার ডেরা। বিশ্বম্ভর কপালে আঙুল ঠেকিয়ে বলে: 'আমাগো কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়—না অইলে চৌদ্দ মাস এহানে হুকাইয়া থাইকা শেষে যখন টিন বাখারির ঘরে যাইয়া উঠলাম, ভাবলাম দুঃখু সারা অইল, ঘর পাইছি, চাষের জমি পাইছি, আর কি চাই। হা ভগবান, আষাঢ় মাইস্যা বাদলা শুরু অইতে না অইতে ঘরে কোমর হমান পানি। এই দেশে জল নাই, এই দেশ হুকনা টান। তয় এই বছর জল ক্যান—না আমাগো কপালের দোষে। কেমন?' লোকটা সরল। চুল পেকেছে দাঁত পড়তে আরম্ভ করেছে। স্টেশনে ফিরে এসে অনেক নতুন মুখ এবার দেখতে পেয়ে বিশ্বম্ভর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চায়। কিবা বরিশাল কিবা ত্রিপুরা। 'কয়েন আমরা পুব বাংলার পোড়া কপাইল্যার দল। হুঁ, ঐ হনে আমাগো পরিচয়—' বলতে বলতে বিশ্বম্ভরের মরা মাছের চোখের মত ফ্যাকাশে ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। আর এমন ভালো মানুষের মেয়ে সন্ধ্যা কিনা এমন একটা কাজ করল। ওর জন্যই তো গণ্ডগোল পাকাত। এমন চাঁদের আলোর মত গায়ের রং কিন্তু ওর ভিতরটা যে এত কালো কুৎসিত তা বাইরে থেকে বুঝবে কে! শেষ পর্যন্ত যখন জানা গেল যে 'ভদ্দরলোকের' দোষ নেই, সন্ধ্যার দোষ, তখন জগদীশের দল লোকটাকে ছেড়ে দিল। কি ব্যাপার? না 'ভদ্দরলোক' আপিস ফেরতা হয়ে যখন বালিগঞ্জের ট্রেন ধরতে যাচ্ছে তখন সন্ধ্যা তার পিছু নিয়েছে। কলে জল ধরতে যাচ্ছিল। জল ধরবে কি, সেই বারোয়ারী কলতলায় ঘড়া ফেলে রেখে সন্ধ্যা 'বাবুর' পিছু নিয়েছে। ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল নগেনের বোন কুন্তলার। কুন্তলা জল নিয়ে নিজেদের ডেরায় ফিরে গিয়ে নগেনের কানে কথাটা তোলে। নগেন ছুটে এসে জগদীশকে বলে। জগদীশ আর এক সেকেণ্ড দেরি না করে নগেনের হাত ধরে প্ল্যাটফর্মের ভিতর ঢুকে পড়ে। ট্রেন সিটি মেরেছে। 'আর ধরা গেল না আর ধরতে পারলাম না। সেই রংপুরের বাসনারে যেমন সেদিন একটা লোক ফুসলাইয়া স্টেশন থেইকে বার করে নিয়া গেল তেমনি সন্ধ্যারেও আজ নিয়ে গেল। হা-রে কপাল! আমরা এতগুলি জোয়ান ছেইলে থাকতে—' বলাবলি করছিল দুজন। ভাবছিল। কিন্তু ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওপাশের ফাঁকা জায়গায়—নিচে ঘাসের জমিতে দুজন কে দাঁড়িয়ে কথা বলছে

দেখতে পেয়ে জগদীশ আর নগেন বিদ্যুদ্বেগে সেখানে ছুটে যায়। গিয়েই নগেন লোকটার গলা চেপে ধরে। জগদীশ হাত চেপে ধরে। সন্ধ্যার মুখটা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। 'কি ব্যাপার!' জগদীশ লোকটার চোখের কাছে চোখ নিয়ে হুংকার ছাড়তে লোকটা, আশ্চর্য, ভয় না পেয়ে বরং অল্প একটু হাসল। 'আগে আমার কথা শুনুন, তারপর বিচার করুন।' 'কি আবার কথা শুনুম।' নগেন চেঁচিয়ে উঠছিল, জগদীশ চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। তখন ভদ্দরলোক যা বলল: আপিসে যেতে আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে রোজ দু-বেলা তাকে শেয়ালদা আসতে হয়। উপায় নেই। দিন চার-পাঁচ আগে টিকিটঘরের কাছে সে যখন টিকিট কাটছিল তখন মেয়েটা তার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চায়। রিফুইজি মেয়েটার মলিন বেশভূষা চেহারা দেখে তার কষ্ট হয়। পকেট থেকে একটা দু-আনি বের করে মেয়েটার হাতে তুলে দেয়। দু-আনি পেয়ে মেয়েটা এত খুশি হয় দেখে ভদ্দরলোক অবাক হয়। দু-আনিটা চোখের সামনে তুলে ধরে মেয়েটা বার বার নাড়াচাড়া করছিল। ঐ থেকে ভদ্দরলোক এই অনুমান করে যে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে কারো কাছ থেকে মেয়েটা এর আগে একসঙ্গে দু-আনা পায় নি। পরদিন বিকেলে টিকিটঘরের কাছে পৌঁছে ভদ্দরলোক মেয়েটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সেদিন তার সঙ্গে 'রেস্ত' কম ছিল। মেয়েটাকে এড়াবার জন্য সে একটু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু খুঁজে খুঁজে মেয়েটা তাকে ঠিক বার করে। চোখাচোখি হতে মেয়েটা আঁচল দিয়ে নিজের চোখের কোণা মুছে বলল, আজ আবার হাত পাততে লজ্জা করছে, কিন্তু উপায় নেই, তার মা জ্বরে আমাশায় ভুগছে। কিন্তু পয়সার অভাবে ওষুধ কিনতে পারছে না—শুনে অগত্যা ভদ্দরলোক তার টিকিটের পয়সা রেখে শেষ সম্বল দু-আনিটা মেয়েটার হাতে তুলে দেয়। পরদিন আবার দেখা। সেদিন বিরক্ত হয়ে ভদ্দরলোক বলেছিল, স্টেশনে তো আরো কত শত প্যাসেঞ্জার আসছে যাচ্ছে তাদের কাছে গিয়ে ও সাহায্য চাইলে পারে—একলা রোজ সে কত পয়সা দেবে। শুনে মেয়েটা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে—কেউ দেয় না, দিলেও ফুটো পয়সা ডবল পয়সার বেশি কারো হাত দিয়ে গলতে চায় না। শুনে ভদ্দরলোক বিব্রত বোধ করল। ভাবল এক-সঙ্গে পর পর দু দিন দুটো দু আনি দেওয়াতে মেয়েটা তাকে খুবই দয়াবান বলে ধরে নিয়েছে। আজ তার ছ-আনার পয়সার দরকার। বুড়ো বাপের চোখদুটো কাল রাত থেকে ফুলে লাল হয়ে আছে, জল পড়ছে, পিচুটি গলছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে; একজন কি একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়েছে। বউবাজারের মোড়ে বড় মনোহারী দোকানে পাওয়া যায়। এক শিশির দাম ছ আনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়েটা এ-ও বলল, খাওয়া পরা যেমন-তেমন করে চলছে, না এ নিয়ে তার ভাবনা নেই—ঈশ্বর যখন যা জোটাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে

দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু বুড়ো বাপ মার অসুখ-বিসুখ হলে তার মন খারাপ হয়ে যায়—তখন সে লোকের কাছে একটু ওষুধ-পথ্য কিনতে হাত না পেতে পারে না। কি আর করে—ছ আনা সঙ্গে নেই, কলমপেষা কেরানী। মাস গেলে তবে মাইনে। অতিরিক্তি পয়সা পকেটে নিয়ে রোজ চলাফেরা করার অবস্থা না। তা হলেও মেয়েটার কান্না দেখে পকেট থেকে একটা সিকি বার করে তার হাতে তুলে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আর সে সাহায্য করতে পারবে না—অন্তত এ-মাসে না, সামনের মাসে মাইনে পেলে আর দু-চার আনা দিয়ে যদি সাহায্য করতে পারে দেখা যাবে।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্দরলোক চুপ করল। জগদীশ নগেনের মুখ দেখে, নগেন জগদীশের মুখ দেখে। তারপর দুজন একসঙ্গে সন্ধ্যার দিকে তাকায়। দুজন তার দিকে এভাবে কটমট করে তাকাতে সন্ধ্যা ভয় পেয়ে বেত-ডগার মত কাঁপছিল।

তারপর জগদীশ ভদ্দরলোকের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করেছিল ভদ্দর-লোকের কি নাম, কোন্ আপিসে চাকরি ইত্যাদি। কিন্তু নগেন তখনও কটমট করে সন্ধ্যাকে দেখছে। তারপর খপ করে ওর হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছে। 'মিছা কথা কইতে শিখলি, মিছা কথা কইয়া বাবুর কাছ থন রোজ পয়সা চাওয়ার অভ্যাস তোর কেমনে অইল।' শুনে মুখটা আরো নিচু করেছে সন্ধ্যা। নগেন চিৎকার করে বলছিল, 'বিশ্বম্ভরদার সাথে আজ কমসে কম চাইরবার আমার দেখা—কই চক্ষু তো লাল দেখলাম না, ফোলা দেখলাম না—একবার তো কইল না আমার চক্ষুর অসুখ।'

শুধু মিছে কথা বলে ছ আনা চাওয়া নয়, যেন আরো কিছু চাইছিল সন্দেহ করে জগদীশ ভদ্দরলোককে প্রশ্ন করল, 'তয় এইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে ও কি কইছিল। ট্রেন ছাড়ল, ট্রেন চইলে গেল, আপনি তো উঠলেন না।'

সেটাই তো কথা। প্রথম দিন একটা দু আনি দিয়ে তার বিপদ হয়েছে। মানুষ নরম হলে তার ওপর শুধু দাবি নয় জবরদস্তি করতেও সাহস পায় লোকে, পৃথিবীতে এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। চার আনা দিয়ে কিছুতেই ওষুধ কেনা চলবে না। আর দু আনা না পেলে সে স্টেশনের ডেরায় ফিরে যাবে না। বাপের সামান্য চোখের ওষুধ কিনতে না পারার দুঃখে ট্রেনের তলায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে জীবন শেষ করতে হবে। 'এতক্ষণ ধরে তাকে আমি বোঝাচ্ছিলাম। আর দু আনা সে অন্য কারো কাছ থেকে জোগাড় করুক—হয়তো রিফুইজি বলে বউবাজারের দোকানদারও চার আনায় ওষুধের শিশিটা তাকে ছেড়ে দিতে পারে, একবার গিয়ে না হয় চেষ্টা করে দেখুক—কিন্তু কার কে, আর দু আনা না পেলে সে কিছুতেই আমার পিছু ছাড়বে না।'

'সন্ধ্যা! সন্ধ্যা! এ সকল কথা কী শুইনছি।' এবার জগদীশ হুংকার ছাড়ল।

আর নগেন ভদ্দরলোককে বলল, 'আচ্ছা আপনি চইলে যান মশাই,—আর একদিন একটা কানাকড়ি ওর হাতে তুইলা দিবেন না। আমরা ইস্টিশনে থাকি, এক নম্বর গেইটের ধারে আমাগো ডেরা, দরকার অইলে খবর দিবেন।'

মাথা নেড়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরে গেল।

আর জগদীশের শক্ত হাতের ঝাঁকুনি খেয়ে সন্ধ্যা কাঁদছিল। নগেন বলছিল, 'তোগ মত মাইয়ারা বাস্তুহারাগো নাম ডুবাইতাছে। জুলুম কইরা মানুষের কাছে পইসা আদায় করতে কবে থাইকা শিখলি হারামজাদি। চল ইস্টিশনে, মিছা কথা কইয়া তুই পইসা চাছ বাবুগো কাছে তোর বাপকে গিয়া কই—দেহিছ তোর পিঠে কাঠের চেলা ভাঙে কিনা।'

সন্ধ্যা কাঁদতে কাঁদতে নগেনের পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল। মিছা কথাই বটে। বাপ-মার অসুখ না। কিন্তু পয়সা জোগাড় করছিল, ভিক্ষে করে পয়সা জমাচ্ছিল ও একটা সায়া কিনবে বলে। একটা পাতলা ছেঁড়া কাপড় পরে সে রাস্তায় বেরোতে পারে না। যদি সে তার মায়ের মত বুড়িয়ে যেত তবে সে সায়া কিনতে চাইত না। দরকার হত না। পনেরো-ষোল বছর বয়সের মেয়ের কি এভাবে রাস্তায় বেরোনো চলে? কান্না শুনে এবং সব কথা সরলভাবে স্বীকার করছে দেখে জগদীশ ও নগেন চুপ করেছিল। নগেনের পা ছেড়ে মেয়েটা জগদীশের পা জড়িয়ে ধরতে এসেছে—জগদীশ পা সরিয়ে নিয়েছে, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, বিশ্বম্ভরদার কানে আজ কথাটি তুলুম না। কিন্তু খবরদার এভাবে বাবুদের কাছে আর কখনই পইসা চাইবা না। আমরা সাবধান কইরে দিলাম। সমথ বয়সের মাইয়া তুমি। অনেক কালেঙ্কারী ঘটতি পারে, বুঝলা?'

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেছে। জগদীশ নগেনের মুখ দেখছিল, নগেন জগদীশের মুখ দেখছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে। স্টেশনের সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।

'দোষ দেওয়া যায় না। পরনের শাড়িখানা কেমনতর ন্যাতার মতন হইয়া গেছে দেখছ নগেন।'

নগেন চুপ থেকে পরে বলল, 'হুঁ, অভাবে স্বভাব নষ্ট শাস্ত্রের বাক্যি।' তারপর কি ভেবে নগেন আবার বলল, 'ছ্যাশের সব মাইয়া সমান না সকলের মন এক না। আমাগো কুন্তলার যদি গামছা পইরা থাকতি হয় তবু অমন বেসরম অইয়া ইস্টিনের বাবুগো কাছে হাত পাততি আইব না।'

জগদীশ বলল, 'তার মাইঝে আর একখানা কথা আছে নগেন। এই যে সন্ধ্যার দুই আনা পাইয়া লোভ অইল, তারপর আবার হাত পাতল, আবার পাতল, এইডা খুব খারাপ। লোভ করলে বিপদ ঘটে। রংপুরের [illegible] কি অইল। একটা টাহা দিল বাবু পইলা দিন পরদিন আবার হাত পাতল হেই

বাবুর কাছে। পাইল দুই টাহা। তারপর তো হুনলাম শাড়ি বেলাউজ আদায় করছিল বাসনা। তারপর তো একদিন বাসনারে ট্যাক্সি গাড়িতে তুইলা লইয়া পলাইয়া গেল।'

'গেছে মরুক। সব মাইয়া সমান না আবার সকল বাবু একরকম না। এই বাবুটা ভালো। অই শালা আছিল লুইচ্চা—তাই তো টাহা-পইসার লোভ দেখাইয়া বাসনারে গাড়িতে তুইলা হাওয়া হইয়া গেল।'

বিড়ির পাতা কাটতে কাটতে জগদীশ এসব কথা ভাবছে আর জগদীশের ষাট বছরের বুড়ী মা পোকায় খাওয়া তিনটে শুকনো বেগুন হাতে করে বসে চিন্তা করছে এখন উনুন ধরিয়ে বেগুন তিনটে পুড়িয়ে নিয়ে ভাত চাপিয়ে দেবে কিনা এবং এবেলা কেবল বেগুন পোড়া আর ভাত খেয়ে ছেলে দুটো সন্তুষ্ট হবে কিনা। চিন্তা করতে করতে বুড়ীর মন শেয়ালদা স্টেশনের নোংরা গুমোট পরিবেশ আর তিন হাত পাঁচ হাত চটের ছাউনি ছেড়ে সাঁ সাঁ করে কখন উড়ে গেছে বনতুলসী আর বাবলার বনের পাশ কাটিয়ে চলা আঁকাবাঁকা এক মাটির রাস্তায়। পিছনে একটা রাংচিতা গাছে সেই সাত সকালে বেনেবউ পাখি 'সতীন ঝি, সতীন ঝি, সতীন ঝি' ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে। কিন্তু সেই ডাকের দিকে মন নেই বুড়ীর। বুড়ী দেখছিল ফাল্গুন মাস না পড়তে কর্মকারদের সজনে গাছটায় ঝাঁটার কাঠির মত সরু চিকন অগুনতি ডাঁটা নেমে পাতা ঢেকে ফেলেছে। আর দু দিন আর তিনটে দিন গেলে ডাঁটাগুলো রসেমাসে একটু মোটা হবে, তখন মটর ডাল কি এমনি সর্ষে দিয়ে চচ্চড়ি রেঁধে খাওয়া চলবে। কর্মকারদের সজনে গাছ দেখতে দেখতে বুড়ী বামুনদের নতুন দীঘির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। দীঘি কেটে এখানটায় মাটি ফেলা হয়েছে আর নতুন মাটির রস পেয়ে বামুনদের কলাবাগান মোটা মোটা ডগা, সবুজ পাতা, অগুনতি মোচা, মোচার কুঁড়ি আর নধর পুষ্ট সব কলার ছড়ি নিয়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। দেখে বুড়ীর চোখের পলক পড়ে না। পাতার গন্ধে মোচার গন্ধে কাঁচা কলার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে।

এখন এখানে শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বাইরে শুকনো শক্ত ঠনঠনে সিমেন্টের ওপর উবু হয়ে বসে ফাল্গুন সকালের বামুনদের সেই কলাবাগানের কচি কাঁচা গন্ধভরা বাতাসের কথা মনে পড়ে বুড়ীর চোখে জল এসে গেল। জলে চোখের পিচুটি গলে বুড়ীর নাকের ডগায় এসে ঝুলতে থাকে। ঘাড় ফিরিয়ে জগদীশ বুড়ীকে কাঁদতে দেখে বিরক্ত গলায় ধমক দেয়, 'আবার! তা কেবল চক্ষুর জল ঝরালে কি গরর্নিমেন্ট তোমারে এখান থাইকা তুইলা নিয়া ঘর দিবে জমি দিবে টাহা দিবে লাঙল গরু কিনবার লাইগা! তুমি একলা না। পাঁচশ ঘর এহানে ইট কামড়াইয়া পইড়া আছে। রাত দিন কাঁদলে চলবে কেনে। কষ্ট করছ আরো কর। ঠাকুরের যদি বাঁচাইবার মন থাহে বাঁচমু—মন না

থাকলে এই ইস্টিশানে শেষ অইয়া যামু।'

বিড়ির পাতা কাটতে কাটতে জগদীশ যখন বুড়ী মাকে সান্ত্বনা দেয় আর আজ আবার হঠাৎ 'অকল্যাণ্ড' 'রাইটার্স বিল্ডিং'এর কথা ভেবে চুপ করে থাকে, তখন তার ভাই সুকুমার বন্ধুদের নিয়ে ট্রাম রাস্তা পার হয়ে বৈঠকখানার বাজারে ঢুকে পড়েছে।

অন্য দিন আরো সকালে তারা বাজারে চলে আসে। দোকানপাট না খুলতে, ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে রাস্তার জঞ্জাল বাজারের ভিতরের গলিঘুঁজির আবর্জনা তুলে ময়লা ফেলার গাড়ির কাছে এনে জড়ো না করতে। কপির ডাঁটা কপির পাতা, পচা পান, আধ পচা থ্যাঁতলানো টমেটো, আলুকাবলি কি ঘেটুলি চচ্চড়ির শুকনো ঝালমশলার দাগ লাগা শূন্য শালপাতার ঠোঙা, পোড়া বিড়ি, ছেঁড়া কাগজ, রসুন-পেঁয়াজের খোসা, ডিমের খোসা ইত্যাদি ছাড়াও ওরা এখানে ওখানে একটা নলতে আলু বা বেগুন বা শশা কুড়িয়ে পায়। নিমাই সেদিন এক পাতা সেফটিপিন কুড়িয়ে পেল। কানু একদিন মাংসের দোকানের নর্দমার কাছে একটা লাল দু-আনি পেয়েছে। আনাজ তরকারীর বাজার, মাংসের দোকানের সামনেটা, মাছের বাজার, কাপড়ের পট্টির অন্ধকার গলিগুলি ওরা রোজ ভোর না হতে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে, যদি কিছু পেয়ে যায়। কিন্তু আজ একটু দেরিই হয়ে গেছে। বাস ট্রামের সামনে দাঁড়িয়ে অতটা সময় নষ্ট করা তাদের উচিত হয়নি বুঝতে পেরে তারা এখন অনুতাপ করছিল। বাজারের সব কটা গলিঘুঁজি ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে। এক টুকরো কাগজ আর এখন কোথাও পড়ে নেই। সুতরাং আজ আর কিছুর জন্য খোঁজাখুঁজি করা বৃথা। অগত্যা হাত ধরাধরি করে ওরা মাংসের দোকানের উল্টোদিকে ময়রার দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। জিলিপি ভাজা হচ্ছে। কানু নিমাইয়ের পিঠে ছোট্ট একটা চিমটি কাটল। নিমাই সুকুমারের হাতে আস্তে চাপ দিল। হ্যাঁ, কাল বিকালে ওরা ঠিক করে রেখেছে আজ সকালে এসে ওরা ময়রার দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে কাল ওদের সঙ্গী পলাশের ওপর সে কেন এমন অবিচার করল। দুপুরবেলা পলাশ একলা বাজারে ঢুকে ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছানাবড়া ভাজা দেখছিল। 'তুই কি বাস্তুহারা, শেয়ালদা স্টেশনে থাকিস?' ময়রা প্রশ্ন করতে পলাশ ঘাড় নেড়েছে। 'একটা কাজ করে দিবি আমার?' ময়রা বলছিল, 'আমার হাত এখন জোড়া। কর্মচারীটার অসুখ। কলে জল এসে গেছে। এই বালতিটা নিয়ে কল থেকে আমার জন্য দু বালতি জল ধরে নিয়ে আয়—দুটো ছানাবড়া খেতে দেব তোকে।' বোধ করি ছানাবড়ার লোভে পলাশ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। দোকানের বালতি তুলে নিয়ে সে রাস্তার কলে চলে যায়। এক বালতি দু বালতি জল পলাশ টেনে টেনে দোকানে নিয়ে গেছে। একটা বড় ড্রামে সেই

জল ঢালতে হয়েছে। আর বালতি কি একটুখানি। এত বড় বালতি! চার বালতি জল টেনে নেওয়ার পর পলাশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ময়রা বলছিল, আর দু বালতি জল ধরে নিয়ে আয়—ড্রামের আধখানাও ভরল না যে। অগত্যা পলাশ আরও দু-বালতি জল টেনে নিয়ে গেছে। তারপর—

তারপর ছোটলোক ময়রাটা একটা ডবল পয়সা পলাশের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছে, 'যা চীনাবাদাম কিনে খা গে।' কিন্তু পলাশ তাতে আপত্তি করেছে এবং চটে গিয়ে বেশ একটু কড়া সুরে বলেছিল, 'আমায় ছানাবড়া দিলেন না—এখন ডবল পইসা দিয়া বিদায় করবার চাইছেন কেন? আট বালতি জলের লাইগা আমার চারখানা ছানাবড়া পাওনা হইছে।' যেই বলা অমনি পলাশের গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছে ময়রা। 'ছানাবড়া দেবে—একটা ছানাবড়ার দাম চারটে পয়সা—আট বালতি জল এনে দিয়েছেন কর্তা তার জন্যে চার গণ্ডা পয়সা দাও—লাট সাহেব আমার।' ভেংচি কেটে ময়রা বলছিল, 'শেয়ালদা পড়ে থাকিস—রাস্তার খুদকণা কুড়িয়ে খেয়ে দিন চলছে—এই ভিড়ে আর ছানাবড়া ওঠে না—যাঃ যাঃ।' কাঁদতে কাঁদতে পলাশ স্টেশনে ফিরে গেছে। সব শুনে পলাশের সঙ্গীরা তো বটেই বড়রা পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পলাশের বাবা চিৎকার করে বলেছিল, 'তুই শালাকে জল তুইলে দিতে গেইলি ক্যানে—হুঁ, তুই কি ভিক্ষুক? তুই কি রাস্তার লোক? তুই শালাকে বলবার পারলি না ক্যান আমাগো ঘরবাড়ি গোয়াল পুকুর আছিল—আইজ দেশ-বিভাগের জন্য আমাগো এই দুরবেস্থা। আমরাও দ্যাশের মানুষ। আমাগো এই দুর্দিনে—' মদন ঢুলি কথা শেষ না করতে নগেনের দল বলেছিল, 'ছাইলা-পাইলাদের আপনারা সাবধানে রাখেন—ছাইলাপাইলারা ভিক্ষুকগো মত এইখানে সেইখানে হাত পাতছে বইলা যত শালা দোকানদার মহাজনের দল এমন অত্যাচার করবার সাহস পাইছে। কি দরকার আছিল ছানাবড়া খাইবার। কপালে থাকলে আবার আমরা ছানা খামু দুধ ঘি খামু—কপালে না থাকলে এই ইস্টিশানের ডেরায় পইচা পইচা মরমু।' বুড়ো বিশ্বম্ভর বলেছিল, 'থাক, থাক—এখন এইটা নিয়া আর গণ্ডগোল পাকাইয়া লাভ নাই। আমাগো সময় খারাপ। এখন গণ্ডগোল পাকাইতে গেলে বৈঠকখানা বাজার থাইকা সাহটাহ্য আর কিছু পামু না। ওহানে ভালো লোকও আছে।' বিশ্বম্ভরের কথায় অনন্ত সায় দিয়ে বলছে: 'না, এখন গণ্ডগোল পাকাইতে গেলে আমাগো যাও ডোল-ফোল পাইবার সম্ভাবনা আছে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এখন তো পাবলিকের কথা গভর্নমিণ্ট কিছু কিছু শুনবার আরম্ভ করছে। ময়রার সাথে গোলমাল করতে গেলে বাজারের ওরা বাস্তুহারাদের বিপক্ষে যাইতে পারে।'

কাজেই পলাশের ব্যাপারটা সেখানে চাপা পড়ে যায় কাল। কিন্তু পলাশ

আর তার সঙ্গীরা ময়রার দুর্ব্যবহারের কথা ভোলে নি। আজ সাহস করে পাঁচজন দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কি চাস তোরা, কি চাইছিস!' পলাশকে দেখে চিনতে পেরে যেন ময়রা হাসল, হেসে পলাশের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোরাও কি রিফুজি?'

কানু ও নিমাই মাথা নাড়ল। বস্তুতঃ কানু নিমাই আর সুকুমার আশা করছিল পলাশকে তাদের সঙ্গে দেখতে পেয়ে ময়রা সকলের ওপর চটে গিয়ে হয়তো যা-তা একটা বলবে নয়তো ভেংচি কাটবে—কিন্তু সেসব কিছু না করে দোকানী হেসে ফেলতে সব কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল, গরম হয়ে লোকটাকে দু-কথা শোনাতে পারল না। 'কথা কইছিস না কেন, জিলিপি চাই—একটা দু-পয়সা, সঙ্গে পয়সা আছে?' ময়রা আবার প্রশ্ন করে।

প্যাণ্টের পকেটে একটা ডবল পয়সা থাকা সত্ত্বেও কানু মাথা নাড়ল। সুকুমার ঢোঁক গিলে ময়রাকে বলল, 'আমরা বাস্তুহারা, আমরা পয়সা পামু কুথায়।'

শুনে ময়রা চুপ করে থাকে। চুপ করে জিলিপি ভাজে। মোটা মানুষ। উনুনের তাপে সকাল থেকে ঘামতে আরম্ভ করেছে। সারা দিনে চর্বি-জমা চামড়া বেয়ে কত ঘাম ঝরবে সুকুমার আর তার সঙ্গীরা যেন তাই ভাবছিল। একটা মাছি নাকের ডগায় বসতে ওটাকে তাড়াতে গিয়ে ময়রা মুখ তুলল।

'তা এক কাজ কর্ না তোরা—আমার কর্মচারীটার অসুখ করেছে। দোকানের ড্রামে এক ফোঁটা জল নেই। তোরা পাঁচজন, রাস্তার কল থেকে আমায় পাঁচ বালতি জল এনে দে না।'

কানু নিমাইয়ের মুখ দেখে, নিমাই সুকুমারের মুখ দেখে। পলাশ কারো দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে থাকে। 'পারবি, বালতি বার করে দিই, দুটো বালতি আছে। ভাগাভাগি করে পাঁচজন পাঁচ বালতি জল ধরে নিয়ে আয়।'

'হুঁ, জল এনে দেব।' সুকুমার বলল, 'তা বালতি পিছে কত কইরে পাব আমরা?'

যেন উত্তর তৈরি ছিল ময়রার মুখে। 'একটা করে গরম জিলিপি। পাঁচ বালতি জল পাঁচটা জিলিপি—মানে দশ পয়সা রোজগার হয়ে গেল তোদের, মন্দ কি।'

মন্দ না। প্রস্তাব শুনে এরা আবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর চারজন এক সঙ্গে পলাশকে দেখে।

'পলাশ রাজী আছিস? বালতি পিছে একটা গরম জিলাপি?' নিমাই প্রশ্ন করে। হলদে দাঁত বার করে পলাশ হাসে। 'তর তোরা যদি রাজী হছ আমিও

রাজী—আমিও এক বালতি আনমু। কেন আনমু না ?'

পলাশের কথা শুনে সঙ্গীরা খুশি হয়।

'দিন, বালতি বার কইরে দিন।' ওরা ময়রার দিকে তাকায়।

ময়রা এক সঙ্গে দুটো শূন্য বালতি এনে দোকানের দরজায় রাখে। বালতি তুলে নিয়ে ওরা রাস্তার কলে ছুটে যায়।

পাঁচ বালতি জল ড্রামে তোলা হয়ে যেতে ওরা বালতি নামিয়ে রেখে হাত পাতে। 'দিন আমাগো জিলাপি দিয়া দিন।'

কথা না কয়ে ময়রা একটা ঠোঙায় পাঁচটা জিলিপি তুলে ওদের হাতে দেয়। কথা না কয়ে পাঁচজন দোকানের রক ছেড়ে রাস্তায় নামে। পাঁচটা জিলিপি পাঁচজন এক সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খায়। শূন্য ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর রাস্তার কল থেকে পেট ভরে জল খেয়ে নিয়ে ওরা হাত ধরাধরি করে হৃষ্টমনে বৈঠকখানার বাজার ছেড়ে বউবাজার স্ট্রীটে এসে দাঁড়ায়। একটা ট্রাম আসছে দেখে সবাই কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাঁচজন তৎক্ষণাৎ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

॥ এক ॥

গায়ের রং বুঝবার উপায় আছে কিছু! এত ময়লা জমে আছে হাতে-পায়ে, গলায়-ঘাড়ে, কানের পিছনে, নাকের দুপাশে। এমন কি, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ফোলা ফোলা গাল দুটোও যেন কতকালের ময়লা ধুলোবালির পলেস্তারায় ঢাকা পড়েছে।

আর চুল! যেন কতকাল তেলজলের মুখ দেখে নি। লাল হয়ে মেস্তাপাটের রং ধরেছে।

পরনের ওটা কি শাড়ি! এককালে তাই ছিল। শাদা ডোরাকাটা নীল শাড়ি। এখন আর রং বোঝা যায় না। যেমন বোঝা যায় না ওর গায়ের আসল রং! সব রং সব জেল্লা হারিয়ে আর সতেরোটা সেলাই আঠারোটা গেরো নিয়ে ওটা একটা ন্যাকড়ার সামিল হয়ে হাঁটুর কাছে এসে থেমে গেছে।

হ্যাঁ, গোল ছোট্ট নরম হাঁটু দুটো দেখেই তো বলাই ওর বয়সটা আন্দাজ করে ফেলেছে। চৌদ্দ-পনেরো। তার বেশি না। আর, তবু যা হোক, অধিকাংশ সময় ওই ছেঁড়া ময়লা শাড়ির পাড়টা টেনে টেনে নামিয়ে হাঁটু দুটো ঢাকতে চেষ্টা করে বলে রোদ জল আর রাস্তার ময়লা ওর ঘাড় গলা গাল কপাল যেমন বিবর্ণ বিদ্‌ঘুটে করে তুলেছে, হাঁটু দুটোকে এখনও তা করতে পারে নি।

হাঁটুর রং দেখে বলাই ওর গায়ের আসল রং কিছুটা বুঝে নিয়েছে। আর একটু বুঝতে পারত। আর এক জায়গায় বলাই চোখ মেলে ধরে।

কিন্তু টের পায় ও। বেশ টের পায় ফেরিওয়ালা কী দেখতে এমন চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। আঁচলটা টান টান করে বুকের ওপর চেপে ধরে ও বলাইয়ের হাতের ডালমুটের ঠোঙ্গাগুলো দেখে। সেলাই আর গেরো মারা আঁচলের ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে বলাই একটা চোরা ঢোক গিলতে চেষ্টা করে।

বোকা-বোকা চাউনি। বুদ্ধিটাও মোটা হবে বলাই টের পায়। না হলে বলাই চুরি করে ঢোক গিলছে মেয়েটার চোখে পড়ে না কেন। বরং দাঁত বার করে হাসে।

'ক প'সা এক পাকিট?'

'দু পয়সা চার প'সা।'

'হু প'সা পামু কুথা। আমরা বাস্তুহারা, টাকাপ'সার মুখ দেখছি নাহিঁ। এট্টা প'সার মুখ দেখি না।'

বলাই অল্প অল্প হাসে।

'তবে চলি।' ঠোঙ্গাগুলো থলের ভিতর গুঁজে রেখে বলাই পা বদল করে দাঁড়ায়। অথবা যেন পা বাড়িয়ে হাঁটতে তৈরী হয়। কলের মুখ থেকে জল-ভরতি মাটির ঘড়াটা সরিয়ে এনে ও কাঁখে তোলে। কাঁখে তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে। ট্রাম বাস ট্যাক্সি রিক্সা সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে রাস্তা বন্ধ।

'পথ পরিষ্কার অউক, পথ না খুললে পা বাড়াইবা না।' বলাইকে সতর্ক করে দিয়ে মেয়েটা আবার দাঁত বার করে হাসে।

'না এখন পা বাড়াতে গেলে গাড়ি চাপা পড়ব।' বলাই না হেসে কথা বলে। কথা বলা শেষ করে আবার ওর গলা দেখে, থুতনি দেখে। তারপর একটা চোরা ঢোক গিলতে ঘাড়টা রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে ধরে।

অথবা বলা যায় বলাই ওর ঠাণ্ডা গলার স্বরটার কথা সেই সঙ্গে চিন্তা করে। 'এখন পা বাড়াইবা না রাস্তা পরিষ্কার অউক।' মমতা আছে, দরদ আছে কথায়।

'নাম যেন কী বলছিলে?' বলাই ঘাড় ফিরিয়ে এবার একটু হাসে।

'মুক্তা।' বলাইর চোখে চোখ রাখল ও। 'নামখানা ভাল?'

'মন্দ না।' খুব একটা উৎসাহ দেখাতে পারল না বলাই। 'হুঁ, মেয়েদের হীরা মুক্তা চুনি পান্না নাম অনেক আছে।'

'আমার মা মুক্তা ডাকছে চিরকাল। বাবারে দেখি নাই। আমার অবুঝ অবস্থায় বাবা মইরা গেল কিনা।' বলে কি যেন ভাবল ও। রাস্তা দেখল। ডান কাঁখ থেকে ঘড়াটা বাঁ কাঁখে নেয়। তার পর: 'এমন চমৎকার নাম আমার —আর খুড়ি কেবল ডাকে মুকি মুকি। বিষের মতন লাগে ডাকটা।'

বলাই কথা বলল না। কাল যখন রাস্তার এই জলের কলের ধারে মেয়েটার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তখনই সে জেনে নিয়েছে এখানে শেয়ালদা স্টেশনে খুড়ির সঙ্গে আছে ও। মা নেই। দেশে থাকতে মা মরেছে। কাল বলাই ইচ্ছা করেই নামটাম কিছু জানতে চায় নি। আজ জেনে রাখল।

'চলি, রাস্তা খুলেছে।' বলাই বলল, 'ডালমুট তো আর কিনতে পারলে না, খামকা ডাকলে—'

'না, প'সা কই, এক প'সা প্যাকিট অইলে একখানা রাখতাম।' বলে মেয়েটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাটির ঘড়াটা বুকের কাছে সোজা করে ধরে দাঁড়ায়। রাস্তা পার হতে সে-ও তৈরী হয়েছে বলাই বুঝল।

'নাও এক প্যাকেট সস্তায় দিলাম তোমায়'—বলাই একটা ঠোঙ্গা থলে থেকে টেনে বার করল।

'দিবা, এক প'সা পাকিট দিবা!' ফিক্ করে হাসল ও।

'নাও, দিচ্ছি তো।' যেন খুব প্রসন্ন না, চোখমুখের এমন চেহারা করল বলাই।

'তয় সাথে তো প'সা আনি নাই—যাইবা আমার সাথে ইস্টিশানে?'

'চল।' অনিচ্ছার সুরে বলাই বলল, 'কালও বলছিলে পয়সা পয়সা প্যাকেট—দিই নাই। এক পয়সা এক প্যাকেট বেচে পোষায় না।'

'বুঝি। কথাখান কি বুঝি না গো ফেরিওলা।' মুক্তা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অখন চাউলের মণ বাইশ টাকা, কাপড়ের বাজার, মাছ তরকারী বাজার আগুন। প'সা প'সা ঠোঙ্গা বেইচা পুষে কেমনে।'

কথা না বলে বলাই ওর সঙ্গে রাস্তা পার হয়, তার পর স্টেশনে ঢোকে। নতুন কিছু না। দিনের পর দিন ছেঁড়া চট, হোগলার চাটাই, ছেঁড়া মাদুর, কাঠের বাকল আর বাঁশের চটার তৈরী সারি সারি ডেরা দেখে তার চোখে কড়া পড়ে গেছে। একরকম চেহারা, একরকম গন্ধ, এক আওয়াজ। 'ভগবান আমাগো দিকে মুখ তুইল্যা চাও, আমাগো আবার সুদিন দাও।'

'এইহানে দাঁড়াও।' একটা ছাউনির সামনে মুক্তা থমকে দাঁড়ায়। বলাই দাঁড়ায়। কাঁখের ঘড়া নামিয়ে ওটা দুহাতে ধরে নুয়ে মেয়েটা ভিতরে ঢোকে, আর সেই ফাঁকে ঘাড়টা বেঁকিয়ে সন্ধানী চোখ মেলে বলাই চট করে ভিতরটা দেখে নেয়। আধাবয়সী একটি স্ত্রীলোক কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কিছু হাঁড়িকুড়ি, কলাই-ওঠা লোহার থালা গ্লাস দুটো একটা, কিছু ছেঁড়া ময়লা কাপড়। একটা কেরাসিন কাঠের বাক্স। বাক্সের ওপর একটা লতাপাতা আঁকা টিনের সুটকেস। ওটা ওর—মুক্তার। সুটকেসের ডালা তুলে মেয়েটা পয়সা বার করছে বলাই পরিষ্কার দেখতে পেল। ডালা খোলা আর ডালা বন্ধ করার কাজটা এত নিঃশব্দে চুপিচুপি সেরে নিল যে দেখে বলাই নিজের মনে হাসল। বুড়ি টের না পায় সেজন্য কি এত সতর্কতা!

মুক্তা ডেরা থেকে বেরিয়ে এল। এখন ও ঘামছে। নাকের ডগায় কপালে

একলাথ ঘামের শাদা ফুটকি দেখা দিয়েছে। যেন এই ঘাম দেখে মুখখানাকে এখন একটু বেশি ভাল, অন্যরকম ভাল লাগল বলাইর।

'নাও প'সা।' ফিসফিসিয়ে বলছে ও।

'থাক—থাক না।' বলাই নিচু গলায় বলল, 'এলাম ডেরাখানা দেখতে। খুড়ি ঘুমিয়ে আছে?'

'মনে তো হয়।' চোখ ট্যারা করে ভিতরটা আর একবার দেখে নিয়ে ও মাথা নাড়ল। 'এমনি দিলা, মাগ্না? তয় তোমার পুষবে কেমনে বাস্তুহারারে মাগ্না ডালমুট বিলাইয়া দিলে।' নরম গলায় হাসল ও।

'পুষবে, পুষিয়ে নেব।' একটু গম্ভীর হয়ে গেল বলাই। 'সব বাস্তুহারাকে মাগ্না দেব নাকি। উঁহু।'

'কেবল আমারে দিলা?'

কথার উত্তর না দিয়ে বলাই শুধু ঘাড় কাত করল। তার পর ঘুরে দাঁড়াল। পিছনে একটা লম্বা নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনল সে। কিন্তু দাঁড়াল না। হাঁটতে লাগল। আবার দু পায়ের বেশি হাঁটতেও পারল না। থমকে দাঁড়ায়। বড় বেশি গণ্ডগোল বেঁধে গেছে ওই ডেরায়। এক পা পিছনে হটে বলাই কান খাড়া করে ধরে।

'শত্রু, গলার কাডা, আমার গলায় পা দিয়া আমার সোয়ামীর ভাত আমার ভাত খাইয়া আশ মিটে না হারামজাদীর। জলের লাইগা বাইরে গিয়া দুই ঘণ্টা কাডাইয়া আইছে। আইয়া অখন কুড়ুর কুড়ুর কইরা বুটভাজা খাইতাছে। মর মর হারামজাদী।'

'আমি বিথ্যা কইরা বুটভাজা আনছি। আমার খিদা পাইছে খামু না। কলের মাইজে রাইজ্যের মানুষ গেছে জল ধরবার লাইগা, দেরি অইব না।'

মেয়েটার গলা। বলাই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এরকম ঝগড়াঝাঁটি গোলমাল এখানে সব ডেরায় লেগে আছে। বাদাম আর ডালমুট বেচতে এসে রোজ দু বেলা বলাই শোনে। কিন্তু এখন যেন একটু বেশি করে ভাল করে শুনতে চাইছে সে কথাগুলো। বলাই পা বদল করে দাঁড়ায়।

'আমার ভাত খাইয়া আমার সোয়ামীর ভাত খাইয়া হারামজাদী আমার লগে চোপা করে। তুই কি নিমতলার রাস্তা দেখবি না মুখপুড়ি। আমার গলায় পা দিয়া আর কত খাইবার সাধ আছে হুনি?'

'অত ভাতের খুডা দিও না খুড়ি। আমিও বিথ্যা কইয়া প'সা আনি।

আমার আড আনা প'সা দিয়া কাইল চাউল কিন্যা খাওয়া অইছে।' যেন কাঁদবে মেয়েটা।

'থামু না, লেংড়া আইছিলি পাকিস্তান থাইক্যা। আমার ভাই আমারে কাপড় দিল, হেই কাপড়খান পইরা তুই ছিঁড়লি—আমার লগে তুই চোপা করছিস হারামজাদী, আমারে দিলি তুই ভাতের খোডা, আয় মুখপুড়ি, এই কাভারি দিয়া তর নাক কাড়ুম।'

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হুড়াহুড়ি। যেন সত্যি মেয়েটার নাক কাটতে খুড়ি কাটারি বাগিয়ে ধরেছে। ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে রক্ষা করবে কিনা বলাই ভাবছে। কিন্তু ভাবলে কি হবে, কোন্ সূত্রে সে ডেরায় ঢুকে মেয়েটাকে বাঁচাবে—তার সঙ্গে সম্পর্ক কি! সুতরাং সে নিবৃত্ত হল। কেবল ঘাড়টা ঘোরাতে দেখতে পেল ডেরার বাইরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। বলাই আর একটু সময় অপেক্ষা করে। এক সময় চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে মেয়েটা এদিকে তাকায়! বলাইর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। বুকের ভিতর কেমন একটু যন্ত্রণাবোধ করে বলাই। কিন্তু তা আর কি করা—রাস্তার ফেরিওয়ালা হয়ে ওদের পারিবারিক ঝগড়ার মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়াবে কোন্ মুখে! যেন জোর করে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলাই হাঁটতে আরম্ভ করে।

পরদিন। বিকেলে। আকাশ মেঘলা করে আছে। তার ওপর ইঞ্জিনের ধোঁয়া আর রিফিউজিদের তিন ইটের উনুন থেকে কাঁচা কাঠ আর বাঁশের ধোঁয়া উঠে ছড়িয়ে পড়ে স্টেশনটাকে কালো করে রেখেছে। তার ওপর কেমন একটা দুর্গন্ধ আসছে ওদিক থেকে। আর শোনা যায় কলরব। তার ওপর প্যাসেঞ্জারের ঠেলা। কাতারে কাতারে লোক ট্রেন ধরতে ছুটেছে আবার কাতারে কাতারে লোক ট্রেন থেকে নেমে শহরের রাস্তায় নামছে। একটা নরক! আজ আর স্টেশনে ঢোকা হবে না চিন্তা করে যেন বলাই বাদাম আর ডালমুটের ঠোঙ্গা ভরতি থলেটা কাঁধে ঝুলিয়ে স্টেশন বাঁয়ে রেখে হাসপাতালের সামনের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগল। এদিকে ভিড় নেই, লোকজন গাড়িঘোড়া চলে কম। ফাঁকা পেয়ে বলাই হেলেদুলে পা ফেলে, শিস দেয়, মাঝে মাঝে 'ডালমুট' বলে হাঁক দেয়। কালের মত আজও তার পরনে একটা ময়লা পায়জামা। একটা খাকি রং খদ্দরের শার্ট গায়ে। হয়তো এই শেয়ালদার ফুটপাথ থেকে কেনা—বারো আনা দামের টায়ারের চটি পায়ে।

মাথায় বাব্‌রি আছে। খারাপ দেখায় না। মোটা এবং কালো চুল, তার ওপর বয়স কম বলে (চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ) বাবরিটা মাথার একটা সৌন্দর্যের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়নায় যখন মুখ দেখে বলাই নিজেও এটা বোঝে। তখন সে মনে মনে হাসে। চুল কাটবার পয়সা থাকে না তাই এই বাব্‌রি—তা মন্দ কি। মন্দ না—কেননা রাস্তা দিয়ে যখন সে হাঁটে লক্ষ্য করে অনেক মেয়ে অনেক বৌ আড়চোখে তাকে দেখে। বাবরি আছে বলে চেহারাটা ভাল দেখায় যেদিন থেকে বুঝতে পারল সে, সেদিন থেকে চুলের মনে চুল বাড়তে দিতে তার একটুও আপত্তি রইল না। কেবল একটু বেশি বেড়ে গেছে মনে হলে কাঁচি চালিয়ে মাঝে মাঝে আগাগুলো ছেঁটে দেওয়া। বলাই নিজের হাতেই সেটা সেরে নেয়, নাপিতের কাছে যায় না।

বাবরি দুলিয়ে সে যখন হাঁটছিল তখন চিন্তা করছিল কাল আবার কাঁচি চালাতে হবে কিনা। চিন্তা করছে আর হঠাৎ তার মনে হয় যেন পিছন থেকে তাকে কে ডাকছে—'ফেরিওলা!' মেয়েমানুষের গলা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে বলাই চিনতে পারল—স্টেশনের সেই মেয়ে। কাঁখের ঘড়ায় জল নেই বলাই বুঝতে পারে। জল নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারত কি। বলাই দাঁড়ায়।

কাছে এসে মেয়েটা হাঁপায়। 'আমারে তুমি দেখলা না?'

'কোথায় ছিলে?' বলাই ভুরু কুঁচকোয়।

'হেই জলের কলের ধারে। ভাবলাম আজকাও দেখা অইব।' বোকা বোকা চোখ দুটো বলাইয়ের মুখের ওপর মেলে ধরে ও হাসে। 'কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রইলাম।'

দুজন পথচারী তাদের লক্ষ্য করছে অনুমান করে বলাই কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করে এক-পা এক-পা করে হাঁটে। ভিড় ভাল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বললে কেউ লক্ষ্য করে না, কথাবার্তাও লোকে শুনতে পায় কম। মনে মনে বলল সে। অবশ্য হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল সে মেয়েটাও হাঁটছে কিনা। ঠিক হাঁটছে। ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করছে। দেখে বলাই খুশি হয় এবং বিরক্তও হয়। আজও মাগ্‌না ডালমুট খাওয়ার মতলব। ওর দোষ কি। কাল একটা ঠোঙা দিয়ে বলাই লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু লোভ দেখানোর জন্য কি দেওয়া, না ওর দুরবস্থার কথা চিন্তা করে বলাই একটা প্যাকেট এমনি ছেড়ে দিয়েছিল? যেন নিজের মনকে বুঝতে না পেরে

বলাই অস্বস্তি বোধ করে।

হাসপাতালের পিছনে আরো নিরিবিলি রাস্তা পেয়ে গেল দেখে বলাই হাঁটা বন্ধ করল। মেয়েটাও দাঁড়াল। হাসপাতালের দেয়াল ডিঙিয়ে একটা মাধবীলতা নতুন পাতা ও ফুলে ভরতি হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আলতো বাতাসে একটু একটু কাঁপছে।

'কি বলছিলে, কি চাইছ?' বলাই ওর চোখ দেখে।

'না চাই না কিছু।' যেন এই প্রথম ওর সরল ফ্যাকাশে চোখে লজ্জার কালো মেঘ দেখা দেয়। চোখ নামিয়ে চুপ করে যায়।

'জল ধরতে এসে দেরি করছ, খুড়ি বকবে।'

লজ্জার মেঘ সরে গিয়ে চোখ দুটো আবার ফ্যাকাশে করুণ হয়ে ওঠে মুক্তার। 'কালকা শুনছিলা তুমি? আমারে কেমন যন্ত্রণা দেয়? আমার বাপ-মা নাই। ছাশ থাইকা ওয়াগো সাথে চইলা আইয়া অখন আমি ঠেকছি।'

কি একটা চিন্তা করে বলাই প্রশ্ন করল, 'দেশে আর আছে কে তোমার? ভাই বোন—আর কোনো আত্মীয়স্বজন?'

মুক্তা মাথা নাড়ল।

'ভাই নাই। দিদি আছিল। বিয়ার পর বাচ্চা অইবার সময় মারা গেছে। হেই তিন বছর আগে।' একটু থেমে পরে মুক্তা বলল, 'আত্মীয় কুটুম যার যার সুবিধামতন ছাশ ছাইড়া চইলা আইছে।'

'তোমার আপন খুড়ি? মানে তোমার বাবার আপন ভায়ের বৌ এটি?'

মুক্তা ঘাড় কাত করল।

'তবে তো'—অর্থাৎ এমন আপনজন হয়ে এতটা নির্দয় নিষ্ঠুর হওয়া ঠিক না, যেন বলতে গিয়ে বলাই বলল না। অভাবের সংসারে, বিশেষ এই অনিশ্চিত অবস্থায় যাদের দিন কাটছে, তাদের কার কি করা ঠিক আর ঠিক না বলতে যাওয়ার কি অর্থ হয় চিন্তা করে বলাই চুপ করে রইল। কিন্তু মুক্তা চুপ থাকে না। কাকা অনন্ত দাস দেশে গাঁজার দোকানে চাকরি করত। মুক্তার বাপ চাষ-বাস নিয়ে থাকত। মুক্তার বাবার ছ-সাত বিঘা জমি ছিল। বাবা মরে যেতে অনন্ত দাস সেই জমি ভোগ করেছে। মুক্তার মা আর তার মেয়ে দুটোকে খেতে দিয়েছে যেমন, খাটিয়েছে তার বেশি। যা হোক করে দিদির বিয়ে হয়। বিয়ের পরের বছর সন্তান হবার সময় দিদি মারা যায়। মুক্তার মা মারা যান তার [illegible]। তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। কাকা সব ছেড়েছুড়ে চলে আসবে

আসবে করে আর একটা বছর পার করল। তারপর আর থাকতে পারল না।

'জমিজমা কিছু বেচতে টেচতে পেরেছিল?'

'সব বেইচা ত্যাশে বইয়া খাইয়া শেষ করছে কাকা। গাঁজার দোকান উইঠ্যা গেল, চাকরি গেল চইলা, তখন সব বেইচা বেইচা খাওয়া অইছে। অখন আমরা রাস্তার বিক্কুখ।'

'তোমার কাকার ছেলেপুলে নেই?'

'অয়নি। খুড়ি বাঁজা মাইয়ামানুষ।'

'তাই তো দয়ামায়া কম।' যেন নিজের মনে বলল বলাই।

'কাকা লুক খারাপ না। খুড়ি—আমার খুড়ি না, ডাইনী।'

মুক্তার চোখ ছলছল করছে। বুঝি তার মায়ের কথা মনে পড়ল। আলতো বাতাসে মাধবীলতাটা কাঁপছে। একটা বড় নিশ্বাস ফেলল বলাই। কি একটু ভাবল। তার পর—

'তা তোমার বিয়েটিয়ের চেষ্টা করে নি কাকা খুড়ি? যখন দেশে ছিলে?'

মাটির দিকে চেয়ে মুক্তা মাথা নাড়ল।

'আমার বিয়া অইব না।'

কথাটা বুঝতে পারল না বলাই।

'চেষ্টা-চরিত্র করা হয়েছিল? চেষ্টা না করলে বিয়ে হবে কি করে?'

ঘাড় কাত করল ও। মানে চেষ্টা হয়েছিল। বলাইয়ের চোখের দিকে তাকাল একবার, তারপর আবার মুখ নিচু করল মুক্তা।

বলাই এদিক ওদিক তাকায়। তার খুব ইচ্ছা করছিল মেয়েটার হাত ধরে। ময়লা অপরিচ্ছন্ন হাত। আঙুলগুলো হলুদবর্ণ। বাটনা বেটে এসেছে বোঝা যায়। কিন্তু তা হলেও একটা কচি সুষমা লেগে আছে নখে, আঙুলে, হাতের তেলোয়। সরু ছোট্ট কব্জির ওপরে একটা করে প্ল্যাস্টিকের চুড়ি। রং উঠে গেছে। সবুজ রং ছিল চুড়ি দুটোর।

গলা পরিষ্কার করল বলাই।

'ও, এখন বুঝেছি। টাকাপয়সার জন্য বিয়ে দিতে পারে নি।'

'না।' মাথা নাড়তে গিয়ে এবার স্থির চোখে ও বলাইয়ের মুখ দেখে।

'আমার বিয়া অইব না। আমার মার শ্বেতী বেরাম আছিল।'

চমকে উঠল বলাই।

'শ্বেতী! মানে ধবল?'

মুক্তা মাথা নাড়ল।

'মা বাঁইচা থাকতে দুইবার চেষ্টা কইরা গেছে—দুইবার বিয়া বাইঙ্গা গেছে।'

চমকটা কেটে গেল বলাইয়ের। একটা লোক এদিকে আসছে। বলাই হাঁটে। মেয়েটাও হাঁটে।

'তুমি এখন যাও। দেরি হচ্ছে। খুড়ি রাগারাগি করবে।' বলাই আস্তে বলল। মেয়েটা যায় না।

'অউক দেরি। আমার আর ডাইনীর কাছে ফিরা যাইতে মনে লয় না ফেরিওলা। মনে লয় যেদিকে দুই চক্ষু যায় চইলা যাই।'

তা কি আর হয়। এই বয়সে যেখানে খুশি চলে যাওয়ার বিপদ আছে।' মনে মনে বলল বলাই। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। লোকটা ওদের পাশ কাটিয়ে সরে যেতে বলাই দাঁড়ায়। মেয়েটাও দাঁড়ায়।

'আমার আরো বিপদ আছে ফেরিওলা তোমারে কইয়া রাখছি! খুড়ি আমারে সব্বনাশের মাইঝে ঠেইলা দিতে চাইতাছে।'

'কি রকম?' বলাই হঠাৎ চোখ দুটো ছোট করে ফেলল। 'কি বলছে, কি করতে চাইছে তোমার কাকী?

'শয়তান রোজ আইতাছে ইস্টিশানে। বইনের লাইগা ইডা আনে হিডা আনে। তেল চুড়ি বেলাউজ। বইনের কাছে তো আইয়ে না শয়তান। শয়তানের চোখ দুইডা আমার ওপর পইড়া আছে।'

'কে?' প্রশ্ন করতে গিয়ে বলাই বলে, 'তোমার খুড়ির কোনো ভাই আছে বুঝি? কোথায় থাকে? কি করে? কত বয়স?'

'বড়বাজারে থাকে। কোন্ মাউরার কাপড়ের গদিতে চাকরি করে। তোমার চাইয়া বয়সে বড়। বিয়া করছে। দুইডা বাচ্চা আছে। একদিন আইছিল বৌ আর বাচ্চা দুইডারে লইয়া, তখন দেখলাম।'

একটা ঢোক গিলল বলাই।

'লোকটা খারাপ কি করে বুঝলে, তোমায় কিছু বলেছে টলেছে?'

মুক্তা চুপ করে থেকে পায়ের নখ রাস্তার সিমেন্টের ওপর ঘষে।

'কি বলছিল? খুড়ির ভাইয়ের স্বভাবটভাব ভাল না বুঝি?' বলাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষা করে। বিকেলের শেষ আলোটুকু মুছে যেতে রাস্তার বাতিগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল।

'শয়তান দুইমাস ধইরা আমার পিছনে লাইগা আছে। কয় সিনেমা দেখামু,

রেস্টুরাণ্ডে খাওয়ামু, আমার সাথে চল। পয়লা যখন আইল, বুঝি নাই খারাপ স্বভাব মানুষটার। বইসা আছে ডেরায়। কথাবার্তা কইছে আমার লগে। খুড়ি উইঠা পায়খানায় যামু কইয়া বাইরে চইলা গেল। হ—ঠিক এমুন সময়,' সন্ধ্যাবাতি লাগে লাগে। যেই না খুড়ি ডেরার বাইরে গেল শয়তান আমার হাতখান ধইরা কাছে টানল। আমি ছুইটা ডেরার বাইরে চইলা আইলাম।'

'খুড়ি জানে এসব কথা?' বলাই প্রশ্ন করল, 'খুড়িকে বলেছিলে?'

'বিশ্বাস করে না। উল্টা আমারে চাপ দিয়া কয় তোর চউখ খারাপ, তোর নজর বেঁকা। তোর কাকার বয়সের মানুষটা—আর কত বড় চাকরি করে—ঘরে বউ আছে, বাচ্চা আছে। হারামজাদী, আমার বাইয়ের নামে উল্টা কথা কইলে কাটারি দিয়া তোর নাক কাইডা দিমু।'

'তার পর?' বলাই একটা গরম নিশ্বাস ফেলল।

'অখন বুঝি, খুড়ি যোগে আছে বাইয়ের। আমারে কয়, আমি ভাত দিতে পারি না, তোর কাকা বিখ্যা কইরা আনে। তুই আমার বাইয়ের কাছে গিয়া থাক। রানবি, ঘরের কাজকর্ম করবি।'

একবার থেমে মুক্তা পরে বলে, 'আমি রাজী অই না, শয়তানের কথায় ওয়ার সাথে যাই না, তাইতে খুড়ির রাগ। কথায় কথায় আমার নাক কাডে, আমারে নিমতলায় পাডায়।'

'কাকা—কাকা জানে এ-কথা?'

'মনে কয় জানে। আগে কাকা চুপ কইরা থাকত। মদন রায় আইলে কথাবার্তা কইত না। অখন মদন রায় ইডা হিডা আনছে। মাইঝে মাইঝে বইনের সংসারের বাজার লইয়া আইয়ে—মাছ তরকারী। অখন মদন রায়ের সাথে কাকার খুব ভাব। এক কথায় ওডে বয়। আর কাকা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমারে হুনায় কইলকাতার শ'রে মাইয়া ছাইলারা কত কাম কাইজ পাইতাছে, রুজি রোজগার করতাছে। মদন রায় কইছিল কিনা যদি তার বাড়িতে কাজ করতে না চাই, আমারে কোন কারখানায় ঢুকাইয়া দিতে পারে। মাইয়া ছাইলা হেইখানে সুতা বাছে, সুতায় রং লাগায়।'

'সেটা ভাল, সেটা মন্দ কি। বলেছে কারখানায় ঢোকাতে পারবে?' বলাই কেমন উৎসুক হয়ে ওঠে। আর সেই সঙ্গে মুক্তা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল: 'আমি এক ফুডা বিশ্বাস করি না শয়তানরে—আমারে ফুসলাইয়া ইস্টিশানের বাইরে লইয়া গিয়া—আমি মাইয়ামানুষ, কুচরিত্তির পুরুষের চউখ

দেইখা সব বুঝি ফেরিওলা।'

শুনে বলাই চুপ করে রইল। কি বলতে পারে সে—অথবা মেয়েটার জন্য কি করার আছে বুঝতে না পেরে আকাশের দিকে চোখ তুলল। আর্তনাদের মত তীব্র স্বরে সিটি বাজিয়ে একটা ট্রেন এসে ওদিকে স্টেশনে ঢুকল অথবা স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল যেন।

'ফেরিওলা!'

'কি?' বলাই চোখ নামায়।

মেয়েটার চোখের কোণায় জল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

'তোমার বাসা কুথায়?'

'আমার বাসা নেই।' বলাই একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। 'বৈঠকখানা বাজারে একটা ঘরে থাকি। একজনের দোকানঘর।'

'তোমার বাপ-মা কুথায়? বৌ ছেলেপুলে কার কাছে?'

বলাই অনেকক্ষণ পর তার বাবরিতে ঝাঁকুনি দেয়।

'মা-বাপ অনেকদিন গত হয়েছে। ভাই বোনও কেউ নেই—আর—' মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলাই মৃদু হাসল।

বুঝল মুক্তা। যেন লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে তাকায়। তার পর অনেকটা নিজের মনে বলল, 'একবার ভাবছিলাম। তার পর মনে অইল কি জানি হয়তো সংসার আছে। অখন দেখতাছি আমার মত সব দিক শূন্যি—'

'তাই', বলাই শার্টের পকেট থেকে একটা দু'আনি তুলল। 'নাও—আমার কাছে আজ আর বেশি নেই। এটা রাখো।'

'কি, প'সা?' চমকে ওঠার মত গলায় [illegible]বার করল মুক্তা। 'ছি, আইজ তিনদিন তোমার সঙ্গে দেখা আর তোমারে আমার সব কথা কইয়া ফেললাম—না না প'সা চাইবার অইলে আমি অত কথা কইতাম নি ফেরিওলা, তুমার কাছে আমি প'সা চাই না।'

পয়সাসুদ্ধ বলাইয়ের হাতটা একবার কচি মুঠোর মধ্যে নিয়ে মুক্তা তারপর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। 'প'সা রাখ। তুমার সাথে আমার প'সার সম্পর্ক না—'

কিসের সম্পর্ক আর কি সম্পর্ক। চমকে উঠল বলাই। কচি নরম স্বরটা তার কানের ভিতর ঢুকল না, যেন তার বুকের মধ্যে কোথায় একটুখানি ছুঁয়ে আবার সুরে মিলিয়ে গেল। কেননা মেয়েটা আর কিছু বলে নি, থেমে আছে।

পয়সাটা বলাই পকেটে রাখল।

'ফেরিওলা!'

'কি?'

'তুমি তো কত জায়গা ঘুরা ফিরা কর, কত লোকেরে জান—ভাল ভদ্দর-লোকের বাসায় আমি থাকতে চাই। ঘরের কাজ করমু, বাচ্চা ধরমু—যা মনে ধরে দেয় দেউক, না দেয় না দেউক—দুইবেলা দুইডা ভাত পাইলে আমার চইলা যাইবে দিন—আমি চাই ভাল লোকের সঙ্গ। কলকারখানার কাজ পারমু না।'

চুপ করে রইল বলাই।

'আছে জানাশুনা তোমার?'

বাঁ কাঁধের থলে ডান কাঁধে চালান দেয় বলাই।

'দেখি, খোঁজে থাকব—এখন তো মনে পড়ছে না।'

'তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমার ভাই—আমারে বাঁচাও। শয়তানের পাল্লায় পড়লে আমি শ্যাষ হইয়া যামু, তুমি বুঝতে পারছ না!' আবার সেই কচি হাত বলাইয়ের শক্ত মজবুত কব্জিতে ঠেকল। ঝড়ের মুখে পড়ে ছোট্ট অসহায় পাখি আশ্রয় খুঁজছে। হাতটা মুঠোর মধ্যে ধরে বলাই তার চওড়া বুকের সঙ্গে ঠেকাতে পারত—কিন্তু পারল না। বরং হাতটা সরিয়ে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। 'চলো রাত হয়েছে, তোমায় ইস্টিশনে পৌছে দিই।'

কথা না বলে মুক্তা ফেরিওয়ালার সঙ্গে হাঁটে।

॥ দুই ॥

ঠিক বাজার না, বাজারের লাগোয়া ঘিঞ্জি রাস্তার যেখানে দেশী মদের দোকান, মদের দোকান পার হয়ে আলুর দোকান এবং তারপর টিনের বালতি মগ হাতা খুন্তি ঝোলানো একটা ছোট্ট দোকান দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার পাশের দোকান রাধাচরণের। কাপড়-কাচা সাবান দেশলাই আর ধূপকাঠি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না সে দোকানে। রাস্তার ওপর দোকান তাই বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চি পেতে তার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে রাধাচরণ দোকানদারী করে। দোকানের দিকে তার যত না নজর তার চেয়ে মনোযোগ বেশি রাস্তার দিকে—রাস্তা ধরে যে মানুষগুলো আসছে যাচ্ছে তাদের দিকে। দেখে তাই মনে হয়। মানুষগুলোর

দিকে তাকিয়ে থেকে রাধাচরণ কি ভাবে, তা না বললে এমনি অবশ্য বোঝা শক্ত। ছোট এক জোড়া ধারালো চোখ মানুষটার। পাতলা রোগা গড়ন। মুখে বসন্তের দাগ, তবে এমনি খুব ফিটফাট, শাদা ধবধবে একটা পায়জামা পরনে। গায়ে একটা ডোরাকাটা হাওয়াই শার্ট। মাথার চুল বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে বোঝা যায় চমৎকার একটা গন্ধ তেল সে মাথায় মেখেছে।

হ্যাঁ, বলাইয়ের বন্ধু।

যেন রাস্তার প্রত্যেকটা মানুষের মুখ দেখার সময় রাধাচরণ লক্ষ্য করছিল মাথায় বাবরি আছে কিনা, অর্থাৎ বলাই এল কিনা।

রাত নটা বেজে চল্লিশ হয়েছে।

উল্টোদিকের কাটাকাপড়ের দোকানের টাইমপিস ঘড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে রাধা সময় দেখে রাখল আর বিরক্ত হয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল।

আরও পাঁচ মিনিট পার হয়। তারপর বাবরি দেখা যায়। ক্লান্ত বিমর্ষ চেহারা নিয়ে বলাই দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতে রাধাচরণ দাঁত খিচিয়ে উঠল: 'আটটা বাজল?'

'একটু দেরি হয়ে গেল। বাজার মন্দা, বেচাবিক্রী কোথায়—'

'ভারি তোমার সওদা তার আবার বিক্রী—এদিকে ক'টা খদ্দের ফিরে গেছে—কত ক্ষতি হয়ে গেল খেয়াল রাখ?'

'আমি যাই—আমি এখনি যাচ্ছি।' লজ্জিত হয়ে বলাই হাত বাড়ায়। 'চাবি?'

পকেট থেকে চাবির ছড়া তুলে রাধাচরণ বলাইর হাতে দেয়।

বলাই রাধাচরণের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি বলতে রাধাচরণ মাথা নাড়ল, 'না রে বাবা না—রাত নটার পর আর কেউ আসবে না বৈঠকখানায় ঢুঁ মারতে। যদি আসে আমি খবর পাঠাব। ডরো মৎ।' অর্থাৎ বলাই পুলিসের ভয় করছে। বন্ধুর কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে বলাই চাবির ছড়া পকেটে ফেলে হাঁটে। আরও দু-তিনটা দোকান পার হয়ে বলাই বাঁ হাতি একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকল। যেমন অন্ধকার তেমনি দুর্গন্ধ এখানটায়। শুকনা মাছের গন্ধ। বোঝা যায় ধারে কাছে শুকনা-মাছের আড়ৎ আছে। বলাই ডান হাতি একটা দেউড়ি পার হয়ে ভিতরে ঢুকল। রাস্তার টিমটিমে গ্যাসের বাতির একটা সরু রেখা বাড়িটার একদিকের দেয়ালে এসে একটুখানি

ছিটকে পড়েছে। তাতে বোঝা যায় বাড়িটা কত পুরনো। পলেস্তারার ছিটেফোঁটা আর কোথাও লেগে নেই। অনেককাল আগে খসে পড়ে ইটগুলো অতিরিক্ত জর্দাপান খাওয়া মানুষের দাঁতের মত কদর্য চেহারা ধরেছে। দেউড়ি পার হয়ে উঠোনের মত জায়গাটা শূন্য ঝুড়ি আর ভাঙাচোরা প্যাকিং বাক্সে বোঝাই হয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। বলাই দু পা অগ্রসর হয় আর পিছনের দিকে তাকায়। কেউ এল কিনা, কেউ তাকে দেখছে কিনা। কেউ তাকে দেখছে না। নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাঁ দিকে ঘুরে একটা ছোট কুঠরীর দরজার তালায় চাবি ঢুকিয়ে সন্তর্পণে মোচড় দিতে কটাস্ করে একটা আওয়াজ হয়, তারপর দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে যায়। বলাই ভিতরে ঢোকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পকেট থেকে দেশলাই বার করে সে একটা কাঠি ধরায়, তার পর সেই জ্বলন্ত কাঠিটা মেঝের ওপর রাখা একটা মোমবাতির সলতের গায়ে ঠেকায়। এবং আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে সে সরে এসে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরের শিকল তুলে দেয়। এখন সে আরো নিশ্চিন্ত। কাঁধের থলেটা নামিয়ে সেটা দেওয়ালের একটা পেরেকের মাথায় রাখে। দু পয়সা দামের সরু মোমবাতি, কত আর আলো দেয়! তাহলেও সেই স্বল্প আলোয় ভিতরের চেহারাটা মোটামুটি চোখে পড়ে। মেঝের একদিকে একটা চট বিছানো। তার ওপর একটা তেলচিটে লম্বাটে চেহারার বালিশ। হ্যাঁ, এটা বলাইয় বিছানা। মেঝের আর একদিকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। বাক্সের ওপর একটা ছোট আরশি ও বেশ চওড়া মজবুত মোটা-দাঁতের হাড়ের চিরুনি। এটা স্বাভাবিক—বলাই যখনই সুযোগ পায় হাত বাড়িয়ে আয়না চিরুনি টেনে এনে মুখ দেখে, বাবরি দেখে, তারপর অখণ্ড মনোযোগ সহকারে চুল আঁচড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে আঁচড়ায়। কিন্তু এখন বলাই আর তা করল না। কেবল মোমবাতির সামনে আয়নাটা ধরে এক সেকেণ্ড মুখটা দেখে নিয়ে আবার আয়নার জায়গায় আয়না রেখে দিল। বলাই একটা বিষয় খুব চিন্তা করছে চেহারা দেখলে বোঝা যায়। কাঠের বাক্সের ওধারে একটা কুঁজো, একটা কাঁচের গ্লাস ছাড়াও আর একটা জিনিস চোখে পড়ে। একটা একটা রবারের বেলুন। মুখটা সুতো দিয়ে বাঁধা। কিন্তু বেলুন ঠিক নয়। আর একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওটা ফুটবলের ব্লাডার। আরো দুটো কাঁচের গ্লাস মেঝের ওপর উপুড় করে রাখা। গ্লাস দুটো এক মাপের। গ্লাস দুটোর পাশে মাটির ভাঁড়ে আদা ও নুন রাখা হয়েছে।

বলাই হাঁটু ভেঙে মেঝের ওপর বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। বলাইয়ের পিছনে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকানো আরো তিন চারটা ভাঙ্গা কাঁচের গ্লাস ও একটা বড় বোতল। তিন হাত সাড়ে চার হাত এই কামরার ভিতর আর বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। কেবল আর একদিকের দেওয়ালের পেরেকের মাথায় একটা ভাঙ্গা মতন ছাতি ও ছেঁড়া ময়লা দু-একখানা কাপড় ঝুলছে। আর কিছু নেই। দেওয়ালগুলোর নিচের দিকে প্রায় সর্বত্র নতুন ও পুরনো পানের পিক ছিটানো রয়েছে।

হ্যাঁ, বলাই যখন চিন্তামগ্ন তখন বাইরে খুট করে কড়া নড়ে উঠল। শব্দ শুনে বলাই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনি সে দরজা খোলে না। পাল্লার গায়ে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। যেন ভ্রমর ঘুরিয়ে বেশ যত্ন করে এই ছিদ্র তৈরী করা হয়েছে। ছিদ্রপথে চোখ রেখে বাইরেটা দেখে নিয়ে তারপর সে শিকল নামিয়ে দেয়। পাল্লা ঠেলে একজন ভিতরে ঢোকে। ফিসফিসিয়ে কি প্রশ্ন করতে বলাই মাথা নাড়ে এবং শিকলটা আবার তুলে দেয়। লোকটা পায়ের চটি ছেড়ে বলাইয়ের বিছানার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে। রোগা প্যাকাটির মত চেহারা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা হাতকাটা গেঞ্জি। দেখলে মনে হয় ধারে কাছে কোথাও থাকে এবং বলাইয়ের অত্যন্ত পরিচিত।

'কারবার চলছে কেমন?' অল্প হেসে বলাই প্রশ্ন করে।

লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে।

'না রে দাদা—কারবারের বারোটা বেজে গেছে। পাকিস্তানের মাল বন্ধ হয়ে গিয়ে ডিমের কারবার লাটে উঠেছে।'

বলাই আর কথা না বলে ব্লাডারের মুখের সুতোর বাঁধনটা খুলে একটা কাঁচের গ্লাসে কানায় কানায় জলের মত রং-হীন তরল জিনিসটা ঢেলে নিয়ে গ্লাসটা আগন্তুকের সামনে বাড়িয়ে দেয়। গ্লাস উপুড় করে একবারে সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে লোকটা মুখ বিকৃত করল, থুথু ফেলল এবং হাতের ইশারায় কিছু একটা চাইতে বলাই তাড়াতাড়ি আদা-নুনের ভাঁড়টা এগিয়ে দিল।

আদা-নুন তুলে জিভের ডগায় ঠেকিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াতে বলাই হাত বাড়ায়। 'দশ আনা—জিনিসটা কেমন?'

মাথা নাড়ল রোগা লোকটা। 'ভাল, ভাল চোলাই।'

'আমাদের কাছে ভেজাল কিছু নেই—খাঁটি চন্দননগরের মাল। তুমি তো আর নতুন খাচ্ছ না নীলাম্বরদা।'

'না নতুন না, চিরকাল রাধাচরণের ঘরের চোলাই খাব। শালার নিমতলায় যাওয়ার দিনও খেয়ে যাব'—বলে হেসে পকেট থেকে পয়সা বার করে বলাইয়ের হাতে দিয়ে নীলাম্বর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোয়। নীলাম্বরকে বার করে দিয়ে বলাই আবার দরজা বন্ধ করে দেয়। 'এক গ্লাস টেনেই শালা মাতলামি শুরু করে'—নিজের মনে কথাটা বলে বলাই তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে যাবে এমন সময় আবার কড়া খুট করে শব্দ করে। বলাই উঠে দাঁড়ায় এবং ছিদ্রের ওপর চোখ রেখে ভাল করে বাইরেটা দেখে নিয়ে দরজা খুলে দেয়। বিপিন জেলে। উঁচু লম্বা দৈত্যের মত চেহারা। বৈঠকখানায় মাছের দোকান আছে। এরা হল আসল খাইয়ে লোক—কাঁচা পয়সা আছে। বলাই কথা না বলে এক সঙ্গে দুটো গ্লাস ভর্তি করে বিপিনের সামনে রাখল। দু গ্লাস সাবাড় করে বিপিন আদামুন মুখে নিয়ে আবার গ্লাসের জন্য হাত বাড়াল। বলাই গ্লাস তৈরি করে রেখেছিল।

বিপিন জেলে খেয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শশী এল, রাম সিং এল। শশী রাম সিং বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর হরিসাধন, যুধিষ্ঠির, পঞ্চা (এরা সব আনাজ তরকারির বেপারী) এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল।

তার পর আর অনেকক্ষণ কেউ এল না।

পরিশ্রান্ত হয়ে বলাই তার চটের বিছানায় গা এলিয়ে দিল। হাত দুটো মাথার নিচে। চোখ কড়িকাঠের দিকে। একটা ইঁদুর খুট খুট করে কোথায় যেন কি কাটছে। কিন্তু সেই শব্দ শুনতে বলাই কান পেতে নেই। অপেক্ষা করছে সে দরজার কড়াটা আবার কখন খুট করে নড়ে উঠবে। কেননা পঞ্চার হাতঘড়িতে বলাই দেখে রেখেছে এগারোটা বাজতে আর মিনিট সাত আট বাকি। এর মধ্যে বলাইয়ের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রিয় খদ্দের এসে যায়। ব্যারাকপুরের কুমারেশ দত্ত। একবার কিছুদিন ব্যারাকপুরে থেকে একটা চায়ের দোকানে বলাইকে চাকরি করতে হয়। তখন থেকে কুমারেশ দত্তর সঙ্গে পরিচয়; এবং এখানে কলকাতায় বন্ধু রাধাচরণের চোলাই মদের কারবারে ভিড়ে যাওয়ার পর প্রায় বছর তিন বাদে হঠাৎ একদিন কুমারেশ দত্তকে হ্যারিসন রোডের ওপর একটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফল কিনছে দেখতে পেয়ে বলাই তাকে টেনে এনেছিল চন্দননগরের একটু 'ভাল জিনিস' খাইয়ে দিতে। দিশী বিলাতী অনেক রকম চেখেছে জীবনে, কিন্তু 'এর তুলনা হয় না' বলে হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে কুমারেশ খুশি চোখে বলাইর মুখ

দেখেছিল। তারপর থেকে কুমারেশ দত্ত যখনই কলকাতায় আসে, বলাইয়ের এখানে একটু 'গিলে' যাওয়া চাই। আজ শনিবার। শনিবার কুমারেশ দত্ত কলকাতা আসবেই। শনিবার রাত, রবিবার সারাদিন এবং রাতটা শহরে কাটিয়ে সোমবার ভোরে কুমারেশ নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আজ সন্ধ্যায় শেয়ালদা স্টেশন থেকে ফিরে এই পর্যন্ত যত মুখ বলাইয়ের মনে পড়েছে তার মধ্যে চূড়ান্তভাবে, বলা যায় স্থায়ীভাবে, আসন গেড়ে আছে কুমারেশ দত্তর চেহারা। লোকটার পয়সা আছে, পাঁচটা শখ আছে। কতরকম শখের গল্প করে সে এখানে বসে বলাইর সঙ্গে। একটা শখ মেটাতে গিয়ে কাল কত মাশুল দিয়ে এসেছে, আজ আর একটা শখ হয়েছে এবং তার জন্য সে কত দিতে রাজী—মদের গ্লাস হাতে নিয়ে চোখ নেড়ে বলাইকে বোঝায়। বলাই হাসে, মাথা নাড়ে, দরকার মত কথা বলে। পাকা চুল ট্যারা চোখ শুকনো চামড়া পঁয়তাল্লিশ বছরের কুমারেশ দত্তর সঙ্গে চব্বিশ বছরের তাগড়া জোয়ান বলাইর বন্ধুত্বের শিকড়টা ক্রমশঃ কেমন গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে সময় সময় চিন্তা করে বলাই অবাক হয়, খুশি হয়। হ্যাঁ, আজ এখন পর্যন্ত কুমারেশ দর্শন দিচ্ছে না কেন ভেবে বলাই উদ্বিগ্ন হল। শোয়া ছেড়ে উঠে বসল। মশা যন্ত্রণা করছে। উরুতে কপালে চাপড় দিয়ে দিয়ে মশা মারতে ব্যস্ত হয়েও সে চোখ দুটো দরজার ওপর স্থির করে ধরে রাখল, কান খাড়া করে রাখল। কড়াটা খুট করে শব্দ করে উঠবে। অবশ্য আর খুব বেশি সময় তার এভাবে বসে থাকা চলবে না। এগারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দোকান বন্ধ করে রাধাচরণ আসবে এখানকার বেচাবিক্রীর হিসাব নিতে। এই মাল ছিল, এই পড়ে আছে। চোলাইয়ের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত হিসাব করে টাকাকড়ি মিলিয়ে তার পর সব রুমালে বেঁধে রাধাচরণ যখন উঠে যাবে বলাইকেও ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে, না হলে হোটেলে ভাত পাবে না। হোটেলে খাওয়া সেরে আবার এই খুপরীতেই তাকে ফিরতে হয়। রাত্রে সে এখানে ঘুমোয়, কেবল এই সর্তে রাধাচরণ তাকে চোরাই চোলাই বেচার কারবারে নিয়েছে। টাকাকড়ির দিক থেকে কিছু না। তা মন্দ কি। বলাই চিন্তা করে দেখেছে। থাকা-শোয়ার জন্য একটা ঘর ভাড়া করতে গেলে দশ বিশ টাকা মাস মাস বেরিয়ে যেত। দশ টাকায় এ অঞ্চলে ঘর পাওয়া যায় না। এর বেশি দেবার ক্ষমতাও তার নেই। কাজেই যেতে হত তাকে বেলেঘাটা উল্টাডাঙ্গা। এখানে বৈঠকখানা বাজারের ওপর মাগনা ঘরে থাকতে পারা

অনেকখানি। তা ছাড়া সারাদিন তো সে ফেরি নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে পারে। রাত আটটা বাজতে এখানে চলে আসতে হয়। চন্দননগর থেকে অন্ত লোক দিয়ে টিউব ব্লাডার ইত্যাদিতে কলকাতায় মাল পাচার করাতে, রাস্তার দোকানে বসে খদ্দের জোটাতে, বেগতিক দেখলে কিছু হাতে গুঁজে দিয়ে পুলিস কনেস্টবলকে বশ করতে রাধাচরণ আছে। কেননা এটাই তার বড় কারবার। রাস্তায় দোকান খুলে সাবান ধূপ বিক্রি করাটা লোক দেখানো—একটা মুখোশ মাত্র। অবশ্য এই যে এখানে ঘরটায় রাত্রে ঘুমোতে পারছে বলে বলাইকে সন্ধ্যার পর দুতিন ঘণ্টা বসে থেকে চোলাই বেচতে হয় তাতে যে বিপদের সম্ভাবনাও কম নেই—এটা বোঝে না এমন নয়; বেশ বোঝে সে, ধরা পড়লে তার হাতেই হাতকড়া পড়বে। পুলিস এ-বাড়ি ঘেরাও করলে পালাবার উপায় থাকবে না। বামাল ধরা পড়ে বলাইকে জেলে যেতে হবে। রাধাচরণের কাছে ধূপকাঠি আর কাপড় কাচা সাবান ছাড়া কিছু পাবে না। কথাটা যখন চিন্তা করে, বলাইয়ের বুকের ভিতর একটা গোপন আক্রোশ ফুঁসিয়ে ওঠে। এই কারবারে কড়ির দিক থেকে শূন্য অথচ জেলখানায় যেতে বলাই পা বাড়িয়ে আছে। তাই এখন রুমালে সব টাকা পয়সা বেঁধে নিয়ে যেতে রাধাচরণ আসছে মনে পড়তে বলাই রাগে দুঃখে ক্ষোভে আক্রোশে চোখ দুটোকে ছোট করে ফেলে দরজার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর উঠে কুঁজো থেকে কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে গ্লাসটা আবার তখনি হাত থেকে নামিয়ে রাখল। না না—আর যাকেই জল মেশানো চোলাই খাওয়াই না কেন, কুমারেশ দত্তকে এ জিনিস দেওয়া চলবে না। বলাই অন্তত কুমারেশ দত্তর সঙ্গে 'অধর্মের কাজ' করতে চায় না। রাধাচরণের ওপর রাগ করে মাঝে মাঝে চোলাইয়ের সঙ্গে জল মিশিয়ে দু'চার আনা লাভ করে সে অন্যের বেলায় করুক, এখানে না, এখন না। এখন এক কুমারেশ দত্ত ছাড়া নিয়মের খদ্দেরদের মধ্যে আর কে আসতে বাকি রইল বলাই অবশ্য মনে করতে পারছিল না।

'কে!'

বলতে বলতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলাই দরজার কাছে ছুটে গেল।

'কে গো?' ফিসফিসিয়ে উঠল সে।

'আমি বন্ধু আমি।'

গলার স্বর পরিচিত। তা হলেও অভ্যাস মতন ফুটোর গায়ে একবার চোখ রেখে পরে হাসতে হাসতে বলাই দরজার শিকল নামিয়ে দিল। হাসতে হাসতে

কুমারেশ দত্ত ভিতরে ঢুকল।

'এত রাত হল?' বলাই শিকল তুলে দিয়ে ঘরে দাঁড়ায়।

'আমি যে রাত জাগা পাখীরে ভাই, আমি যে মধ্যরাতের তারা।' কুমারেশের পা টলছিল, মুখ থেকে গন্ধ বেরোচ্ছিল। বাইরে কোথাও খেয়ে এসেছে বুঝতে পারল বলাই। কিছু প্রশ্ন করল না।

'এসো এসো বন্ধু।' আদর করে সে কুমারেশকে তার বিছানায় বসাল।

'তারপর খবর কি, বৌদি ভাল আছেন?'

'তোমার বৌদিমণি চিরকাল ভাল থাকেন। এত ভাল আছেন বলেই তো আমি এমন আলগা হয়ে ঘুরতে পারি, হি-হি।' গলায় একটা ক্ষীণ অথচ বিদ্‌ঘুটে ধরনের হাসির ঢেউ তুলে কুমারেশ দত্ত যখন কথা বলছিল, তার ওপরের পাটির বাঁধানো দাঁতের সেট কাঁপছিল। কথা না কয়ে বলাই গ্লাসে মদ ঢেলে কুমারেশ দত্তর সামনে এগিয়ে দিল। এক চুমুকে সবটা সাবাড় করে কুমারেশ ট্যারা চোখটা আরো ট্যারা করে বলাইয়ের মুখের ওপর বাগিয়ে ধরে প্রশ্ন করল, 'তার পর, ইদিকের খবর কি?"

'খুব ভাল।' বাব্‌রিতে বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলাই আবার গ্লাস তৈরী করে। 'খবর ভাল বলে না আজ তিনদিন রাজাবাহাদুরের পথের দিকে চেয়ে আছি।'

'বটে!' খুশিতে ডগমগ হয়ে কুমারেশ বিছানা ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বলাইর কাছে এসে তার গা ঘেঁষে বসে। 'বিষ্যুতবার একবার কলকাতায় ঢুঁ মারার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু শালার লিভারের বেদনাটা এমন চাড়া দিয়ে উঠল আর সাহস করলাম না।'

'একটা বাচ্চা ছেলের মত কথা বলা হল।' বলাই কুমারেশের হাতে গ্লাস তুলে দেয়। 'ঐ মদের বেদনা মদ দিয়ে সাবাড় করতে হয় এটা কি কুমারেশ দত্তকে আমায় আজ নতুন করে শেখাতে হবে!'

গলায় সবটা একসঙ্গে ঢেলে দিয়ে কুমারেশ দত্ত চোখ ছোট করল। একটু নুন মুখে দিল। তার পর—

'না গো বন্ধু, না। মেঘে মেঘে কত বেলা হল খেয়াল রাখ? বয়েস হয়েছে, এখন আর রক্তের সেই জোর আছে?'

'আরে ধ্যেৎ! বয়েস! কুমারেশ দত্ত যেদিন পঞ্চাশে পা দেবে সেদিনও নবীন যুবা থাকবে। মিছা বলছি?'

'হি-হি হি-হি হা-হা-হা-হা-হা।' ট্যারা চোখ নাচিয়ে পাথরের দাঁত কাঁপিয়ে কুমারেশ হাসে। 'নবীন যুবা—নবীন যুবা। বন্ধু আমায় এমন করে চিনেছে বলে না শালা সব একদিকে আর এই দোকানের গেলাস আর একদিকে, কথাটা প্রাণে গেঁথে রেখেছি আর ছুটে ছুটে আসছি, মাইরি।'

গম্ভীর হয়ে বলাই বলল, 'শোন।'

গম্ভীর হয়ে কুমারেশ বলাইয়ের মুখের কাছে কান পেতে দিল।

পুরো তিন মিনিট ধরে বলাই ফিসফিস করে কুমারেশকে কি বোঝায়। কুমারেশের ট্যারা চোখটা কখনও চঞ্চল, কখনও স্থির, কখনও ঘোলাটে, কখনও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একবার মনে হল অতিরিক্ত খুশিতে চোখে জল এসে গেল। কুমারেশ মাথা নাড়ে। কুমারেশ ঘাড় নাড়ে। কুমারেশ উবু হয়ে বসে। একবার মনে হয় উত্তেজিত হয়ে কুমারেশ বুঝি বলাইর গলা জড়িয়ে ধরে। তারপর এক সময় কুমারেশ দত্তর জিভ থেকে যেন আহ্লাদের লালা গড়িয়ে পড়ে।

'আর বলতে হবে না, আর বলতে হবে না, আমি সামলে নেব, ঠিক নেব। বারো বছর বয়স থেকে এই বিদ্যায় হাত পাকিয়েছি—হি হি।'

'তবে রয়ে সয়ে। বুঝলে তো? এখানে রাতারাতি কিছু করতে গেলে সব ভণ্ডুল।' চোখ পাকিয়ে বলাই কুমারেশকে সাবধান করে দেয়।

'হ্যাঁ গো বন্ধু, হ্যাঁ।' কুমারেশ দত্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। 'ঐ যে বলে দরগা বুঝে সেলাম জানাতে হয়—সে আমি খুব বুঝে ফেলেছি, হি-হি—কত বয়েস বললে?'

'চৌদ্দর বেশি না।'

'একেবারে বাচ্চা, একেবারে—'

কুমারেশকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলাই বলল, 'এখনও অবুঝ, এখনও কাঁচা। তাই তো বলছি গড়ে পিটে নিতে যদি পার ত্যাখো—'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমায় আর বলতে হবে না'—হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কুমারেশকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখা যায়। মনিব্যাগ তুলে আনে। একটা লাল নোট বার করে। 'নাও দামটা রাখো—' আর একটা পাঁচ টাকার নোট কুমারেশ হাতে রেখে ব্যাগটা ফের পকেটে ঢোকায়। দু টাকার নোট নিয়ে মদের দাম রেখে বলাই বাকি পয়সা ঘুরিয়ে দেয়।

'নাও ধর এটা।' বড় নোটটা কুমারেশ বলাইয়ের হাতে তুলে দেয়।

বলাই আপত্তি করে না, আবার খুশিও হয় না। এক সেকেণ্ড টাকাটা রেখে,

তার পর : 'এখন কি দরকার ছিল, এখন না হয়—'

'এটা হল আমার পাকা কথার দাম। আসল দাম—ন্যায্য পুরস্কার পরে।' কুমারেশ দত্ত উঠে দাঁড়ায়। 'সোদ্দা কথা হল, আমায় তুমি দেখবে বন্ধু, আমি তোমায় দেখব। উঁহু, কথার নড়চড় কুমারেশ দত্তর কাছে পাবে না।'

'তা তো জানি, তা কি আমি জানিনে!' বলাই হাতের নোট ট্যাঁকে গোঁজে। কুমারেশ দত্ত এখন শুধু টলছিল না, যেন পড়ে যাবে এমন অবস্থা। বলাই ধরে ধরে তাকে দরজার কাছে নিয়ে যায়। 'কাল কলকাতায় থাকা হচ্ছে তো রাজাবাহাদুরের?'

'আলবৎ।' যেন ধমক দিয়ে উঠল কুমারেশ। 'কাল পাকা দেখার কাজটি সেরে তবে ব্যারাকপুর ফিরতে হবে। না কি কালই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব?'

'দেখি, দেখছি—' বলাই পরিষ্কার করে কিছু বলে না। 'কাল কি একবার দুপুরের দিকে—' বলে বলাই হঠাৎ থামল। তার পর : 'না, দুপুরে তো আমি ঘরে থাকিনে, তোমার সঙ্গে কোথায় তাহলে—'

'আমার সঙ্গে কোথায় তাহলে—' কুমারেশ ভেংচি কাটল। 'কেন, নেবুতলায় গণেশ সাধুর মহামায়া হোটেল ছাড়া কলকাতায় এলে আমি আর কোথাও উঠিনে কথাটা কি রোজ মনে করিয়ে দিতে হবে, আচ্ছা জ্বালা—'

'ঠিক আছে ঠিক আছে।' এখন আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই চিন্তা করে বলাই কুমারেশের হাত ধরে তাকে বাইরে নামিয়ে দিল। 'একটা ট্যাক্সি কি রিক্সা ডেকে চলে যাও।' বলে বলাই দরজায় শিকল তুলে দিল। এক মিনিট পর রাধাচরণ এসে কড়া নাড়তে বলাই আবার দরজা খুলে দেয়।

॥ তিন ॥

রেল লাইনের উঁচু পাড় ছেড়ে দুজন নিচের ঘাসের জমিতে এসে দাঁড়ায়। ওধার থেকে কেবিনের লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মুক্তাকে দেখছে। বলাই বুঝল। বস্তুত বলাইর চোখেও মেয়েটাকে আজ কেমন একটু সুন্দর সুন্দর লাগছে। মুখখানা ধোয়া মোছা করা হয়েছে যেন, তেল না পড়ুক চুলটা ভাল করে বাঁধা হয়েছে, পরনের কাপড়খানা তত ময়লা না, এবং ছেঁড়া-টেড়াও চোখে পড়ছিল না। হয়তো এই একখানা ভাল শাড়ি আছে ওর। টিনের

স্যুটকেস থেকে খুলে বার করে পরা হয়েছে।

'কাইল ডেরায় গিয়া মনে অইল ফেরিওলার নাম জিগান অয় নাই, অত কথা তো কইলাম।'

'বলাই—বলাই দাশ।' বলাই আড়চোখে কেবিনের দিকে তাকায়। লোকটা এখনও হাঁ করে চেয়ে আছে। 'চল ওধারে যাওয়া যাক—গাছের ছায়া আছে।'

বলাইয়ের সঙ্গে মুক্তা হাঁটে।

'কাইল রাত খাওয়া অয় নাই।'

'তাই তো মুখখানা শুকনো লাগছে।' মুখের দিকে তাকায় না বলাই, চারদিকে দেখে। 'চাল ছিল না বুঝি?'

মেয়েটা কথা বলে না। শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে।

'নাকি জল নিয়ে ডেরায় ফিরতে দেরি হয়েছিল তাই খুড়ী ভাত দেয় নি রাগ করে?' বলাই ঘাড় ফিরিয়ে ওর চোখ দেখে।

মুক্তা মাথা নাড়ে। 'জল নিয়া যদি রাইত দুইডায় ফিরি খুড়ী রাগ করত না—খুড়ী ক্যান্ রাগ করে তুমারে কি কই নাই?'

বলাই কথা বলে না।

'কাইল ডেরায় গিয়া দেখি শয়তান ঠাইট বইসা আছে। ঠোঙ্গায় কইরা এই এত জিলাপি সিঙ্গারা লইয়া আইছে। যেন বইনের সাথে কি কথাবার্তা চালাইছে। আমি ডেরায় ঢুকতে চুপ মাইরা গেল।'

'তার পর?'

বাদাম গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায় বলাই। মেয়েটা দাঁড়ায়। কেবিন এখন গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

'তার পর? কাল আবার কিছু বলছিল?' বলাই ফের প্রশ্ন করে।

'খুড়ী পষ্টাপষ্টি কাইল কয় আমারে, তুই রাগ কইরা আছিস আমার ভাইয়ের লগে। ছোট মানুষ নি আমার ভাই! কত বড় চাকুইরা লোক। কথা কইতে চায় তর সাথে, আর তুই মুখ বুইজা মুখ ঘুরাইয়া নেছ—ঠোঙ্গা ভইরা জিলাপি সিঙ্গাড়া লইয়া আইছে তর লাইগ্যা।'

'খুড়ী বলল?' বলাই সামান্য হাসতে চেষ্টা করে।

ছোট থুতনি নাচিয়ে মুক্তা হাসে।

'এখন হাসি, কাইল খুড়ীর কথা শুইনা রাগে আমার শরীল ফাইট্টা যায়। মুখ বুইজা মুখ ঘুরাইয়া থাহি। জিলাপি সিঙ্গাড়ার লুভ দেখাইয়া আমার সাথে

ভাব করনের মতলব। ইচ্ছা করছিল লাথি মাইরা শয়তানরে ইস্টিশান থাইকা বিদায় করি।'

বোকা চাউনি মিষ্টি হাসি, কিন্তু তেজ আছে, ধার আছে রক্তে। চিন্তা করে বলাই চোখ তুলে মাথার ওপর লালচে কচি বাদাম পাতা দেখে। মেয়েটা বলাইয়ের মাথার ফাঁপানো ছড়ানো সুন্দর বাবরি দেখে।

'এইডা তো ভালবাসা না, আমারে নষ্ট করবার মতলব—কি বল ?'

বলাই বলে না কিছু। মেয়েটা আবার শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে।

'চাঁপারে এই ইস্টিশান থন লইয়া গেল—টাকাপয়সার লুভ দেখাইয়া লইয়া গেছে শয়তানেরা বার কইরা—আর ছুইটা আইতে পারল না। আর ফিরা আইতে পারল না।'

চমকে উঠে বলাই ওর মুখ দেখে।

'কে, চাঁপা কে ?'

'নলিনী ভদ্রের মাইয়া—আমার বয়সের। বাস্তুহারা হইয়া ইস্টিশানে ডেরা বাঁইধ্যা আছিল।'

বলাই কথা বলে না।

'আর এক শয়তান তালে আছে আমারে চাঁপার দশা করবার লাইগা, আমারে বার কইরা লইয়া যাইবার মতলব। শাড়ির লুভ দেখায়, বেলাউজের লুভ দেখায়। আমি খুড়ীরে কইয়া দিছি, আমরা ভাল মাইনষের সন্তান, এই সকল ছলিবলি নষ্টামি আমার সাথে যেন তুমার ভাই না করে। বদমাইসের সাথে পীরিত করবার আগে রেলগাড়ির তলায় গলা দিয়া মরমু।'

আর হাসছে না, যেন চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে মেয়েটার। অথচ কাল পর্যন্ত কেমন বোকা বোকা চাউনি ছিল। বলাই আর এখন চট করে ওর চোখে চোখ রাখতে পারল না। মুখ নিচু করে ঘাস দেখে। মেয়েটা কথা বন্ধ করতে বলাই মিনমিন গলায় বলল, 'না, এখানে খুড়ীর সাথে তোমার থাকা চলে না—খুড়ী যখন শয়তানটার সঙ্গে যোগে আছে তখন—'

'আমার আর একদিন থাকবার ইচ্ছা করে না। কাইল রাগ কইরা এক কোঁটা জল মুখে লই নাই। কাকা বিথ্যা কইরা ডেরায় ফিরা আইতে খুড়ী বানাইয়া বানাইয়া কত গণ্ডা মিছা কথা কইয়া ফেলল আমার নামে। শুইন্যা কাকার মাথার রক্ত গরম অইয়া গেল, আর আমারে কইল তুই যেইখানে খুশি চইলা যা, তুই মইরা যা, আমার এই সগল অশান্তি ভাল লাগে না।'

আর আগুন নেই, টপ টপ করে জল ঝরছে চোখ থেকে। নরম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে চোখের তারা দুটো, ঠোঁট কাঁপছে। বলাই কিছু বলবার আগে মেয়েটা তার হাত ধরল।

বলাই হাত ছাড়াল না। এদিক ওদিক দেখে নিল একবার। তার পর—

'কাল রাত্রে আমার বড় মামার বন্ধু কলকাতায় এসেছে। হঠাৎ দেখা। ট্যাক্সি করে কোথায় যেন যাচ্ছিল। বলল, জানাশোনা কোনো মেয়েছেলে আছে কিনা। ঘরের কাজকর্ম করবে। খাওয়া-পরা ছাড়াও কিছু কিছু হাত-খরচ দেবে।'

'কোনখানে বাসা ভদ্দলোকটির?'

'কলকাতার ধারে কাছে।' বলাই ব্যারাকপুর নামটা চেপে রাখল। 'খুব ভদ্রলোক। বড় ঘরের সন্তান। ছেলেপুলে নেই। নিজের ঘরবাড়ি জমি-জমা আছে। বৌ বাতের রুগী। বিছানায় শোয়া। কাজেই একটি মেয়ে-টেয়ে ঘরে না থাকলে—'

যেন নিশ্বাস বন্ধ করে মুক্তা ফেরিওয়ালার কথা শুনছিল।

'কেমন বয়সটা সেই ভদ্দলোকের?'

বলাই এবার অল্প শব্দ করে হাসল।

'চুল পেকে গেছে দাঁত পড়ে গেছে। বুড়ো মানুষ না বলে করব কি!'

হাল্কা একটা নিশ্বাস ফেলল মুক্তা। বলাইয়ের হাত ছেড়ে দিল।

বলাই বলল, 'মামার বন্ধু দু'চারদিন শহরে আছে। হুট করে আমি তখন আর কিছু বললাম না। বললাম, দেখি খোঁজটোজ করে। বলল, স্বভাবচরিত্র ভাল গরীবের ঘরের মেয়ে হয় তবেই ভাল।'

যেন কি বলতে গিয়ে মুক্তা বলতে পারে না। থুতনি তুলে গাছের কচি পাতা দেখে। বলাই একটা চোরা ঢোক গিলল।

'এখন তুমি যদি বল—'

'আমার বলার কিছু নাই—আমি তো তোমারে সব বইলা দিছি। তুমার বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস। তুমি বিশ্বাস কইরা আমারে যেইখানে দেও সেইখানে আমি থাকমু—ইষ্টিশনে আর একদিন থাকলে আমি মইরা যামু।'

কি ভাবতে বলাই ঘাড় বেঁকিয়ে গাছের পাতা দেখে। যেন কি বলতে মেয়েটাও একটু সময় নেয়। এদিক ওদিক তাকায়। দূরে মাঠের পুকুরে একটা ধোপা কাপড় কাচছে। আর কোন মানুষ দেখা যায় না। পাঁচ সাত হাত

দূরে দুটো ছাগলের বাচ্চা চুপ করে মায়ের কাছে শুয়ে আছে। ওধারে সাইডিং-এ ফেলে রাখা দুটো শূন্য ওয়াগনের ছাদে এক সারি কাক বসে আছে। ডাকছে না, যেন চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে তারা কিসের অপেক্ষা করছে। সব দেখা শেষ করে মুক্তা বলাইয়ের মুখ দেখে। ঘাড় নামিয়ে বলাই ওর চোখ দেখে। মেয়েটার ঠোঁট দুটো এবার ঘন ঘন কাঁপে।

'আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই-বইন নাই— তুমার মুখের পানে চাইয়া আছি, তুমি যদি বাঁচাও বাঁচমু।'

আবার ও বলাইয়ের হাত ধরতে চায়, বলাই হঠাৎ ঘাম মোছার ভান করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিজের কপালে ঠেকায়।

'না, ভাবনার কিছু নেই, ভালমানুষের কাছে তোমাকে দিতে চাই, সুখে থাকবে।'

যেন আবার কি ভাবে মুক্তা। শূন্য উদাস দৃষ্টি। কাঁধের থলেটা হাতে নিয়ে বলাই মাথা গুঁজে ঠোঙাগুলোর তলা থেকে কি যেন একটা টেনে টেনে বার করে। বার করে জিনিসটা হাতে নিয়ে মুক্তার চোখের সামনে ধরে। লাল টুকটুকে একটা ব্লাউজ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মুক্তা জিনিসটা দেখে। ধরে না।

'নাও, তোমার।' বলাই সুন্দর করে হাসে।

মুক্তা মাথা নাড়ে। সুন্দর করে হাসে।

'অখন না, অখন ইডা নিয়া গেলে খুড়ী সন্দ করব। ইস্টিশন থাইক্যা আমি তুমার সাথে এক কাপড়ে বাইর অইয়া যামু। তার পর তুমি যেইখানে লইয়া যাইবার যাইবা, যেইখানে রাখবার রাখবা—'

বলতে বলতে ওর চোখে জল দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে বলাই ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। মুক্তা চোখ মুছে বলে: 'দুইদিনের মাইজে তুমি আমারে —আমার মতন পুড়াকপালীরে বালবাইস্যা ফেললা ক্যান গো।'

এবার ও হাত ধরতে বলাই অবশ্য হাতটা ছাড়ায় না।

চোখ মোছা শেষ করে গলা পরিষ্কার করে মুক্তা বলল, 'যেই বাড়িতে থাকমু সেই বাড়িতে তুমি যাও না? আমারে দেখতে মাইজে মাইজে সেইখানে যাইবা না?'

সংক্ষেপে উত্তর সারতে বলাইকেও গলা পরিষ্কার করতে হয়। 'যাব।'

'তখন তুমার যিডা খুশি আমারে দিও, তখন আমি গায়ে পরমু। অখন

ব্লাউজটা তুমার কাছে রাখো।'

কথা না কয়ে বলাই জামাটা ভাঁজ করে থলের মধ্যে ঢোকাল।

কুমারেশ হাসে। বলাই হাসে।

'আর রাজাবাহাদুর না—মামা. হা-হা।'

'ভাল ভাল।' ট্যারা চোখ নাচিয়ে কুমারেশ দত্ত বলল। 'মামার বন্ধুকে মামা ছাড়া আর কী ডাকা হবে। হ্যাঁ, ব্রেনখানা খেলিয়েছ বেশ। তা কবে পর্যন্ত যাওয়া হবে?'

'বুধ বিষ্যুতবারের আগে না। বলাই একটু গম্ভীর হয়ে গেল। 'আমিই তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব। সেই ঝুঁকি নিচ্ছি। তার আগে আবো বুঝিয়ে শুনিয়ে—আমার কথাটা ধরতে পারছ, তাড়াহুড়া করাটা কিছু না।'

'না না না।' কুমারেশ মাথা নাড়ল। 'আমি তো বলি নি আজই চাই, এখনি দাও।'

'মেয়েছেলের ব্যাপার—কথায় বলে আগুন নিয়ে কারবার।' বলাই হাসবার ভান করে গলার ক্ষীণ শব্দ করল। 'তা দেখলে কেমন?'

'চমৎকার! চমৎকার!' কুমারেশ একটা সিগারেট ধরায়। বলাই চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহামায়া হোটেলের খুপরীর চেহারাটা দেখে। একটা তক্তপোশ কোনোরকমে ধরে। একটি মাত্র দরজা, জানালা নেই। দম বন্ধ হয়ে আসে। বলাই ঘামছে। কুমারেশ ঘামছে। এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছে দুজন। বলাই যখন মুক্তাকে পিছনে রেখে স্টেশনে ঢুকছিল তখন কুমারেশ দত্ত রাস্তার একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান সিগারেট কিনতে ব্যস্ত। পান সিগারেট কিনতে কিনতে সে রিফিউজি মেয়েটাকে দেখে নিয়েছে। এটাও বলাইয়ের বুদ্ধিতে হয়েছে। দেখে খুশি হয়ে কুমারেশ হোটেলে ফিরেছে। বলাই এসেছে পাঁচ সাত মিনিট পর। কেমন দেখল কুমারেশকে জিজ্ঞেস করতে।

'সেজেগুজে থাকলে তো আর কথাই নেই'— কুমারেশ গোল করে মুখ থেকে ধোঁয়া বার করে বলল, 'নাক চোখ ভাল, গড়নটি বেড়ে।'

'সাজিয়ে গুজিয়ে রাখবে।' বলাই পকেট থেকে বিড়ি বার করল। 'ঘরের কাজকর্ম করে যে তার কি সাজগোজ করতে নেই। তুমি বড় মানুষ। বড় মানুষের বাড়ির ঝি-চাকরানীরাও সেজেগুজে বিবি হয়ে থাকে।'

কুমারেশ বাঁ হাতে মাথা চুলকায়। হাসে।

'ঝি-চাকরানী করে রাখবার তো ইচ্ছে নেই—'

'সে তুমি দেখবে—তোমারটা তুমি বুঝে নিবে—আমি কিছু জানি নে—আমি জুটিয়ে দিয়ে খালাস।'

কুমারেশ পকেট থেকে মনিব্যাগ তুলল। দেখছে না ভান করে বলাই অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

'এই নাও।' একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয় কুমারেশ। দেখে কেমন যেন বিরক্ত হয়ে বলাই মাথা নাড়ে।

'এখন না, এখন থাক। পরে। তোমার জিনিস তো আগে তোমার হাতে তুলে দিই—তখন আমার পাওনা মেটাবে।'

তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে কুমারেশ দত্ত মুখ দিয়ে আক্ষেপসূচক শব্দ বার করল। 'আহা, আমি কি তোমার পাওনা মেটাচ্ছি—রাস্তা-খরচ লাগবে না? ট্রেনে বা বাসে যে ভাবেই যাওয়া হোক পয়সা লাগবে। নাও, ধর।'

'ট্রেন বাস কোনোটাই সুবিধে হবে না।' বলাই হাত বাড়িয়ে টাকাটা তুলল বটে কিন্তু মুখ প্রসন্ন করল না। 'একটু লুকিয়ে-টুকিয়ে এখান থেকে ওর সরে পড়ার ইচ্ছা—কাজেই ট্যাক্সিফ্যাক্সি ছাড়া সুবিধে হবে না।'

'তাই বলো!' কুমারেশের ট্যারা চোখ স্থির হয়ে গেল। কথাটা শুনে বেশ খুশি হয়েছে বোঝা যায়। 'কেন, বাপ-মা যন্ত্রণা করে বুঝি। না কি ঘরে সৎমা?'

'খুড়ী।' হাতের পাঁচটা আঙুল একত্র ঠেকিয়ে বলাই বোঝায়, 'এই বয়সে খুড়ার সংসারে বাসন মাজা বাটনা বাটা জল তোলা আর কদিন ভাল লাগে, হা-হা।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কুমারেশ ঘাড় কাত করল এবং তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ হাতড়ে আর একটা পাঁচ টাকার নোট বার করল। 'হ্যাঁ, সেই ভাল, ট্যাক্সি করে সোজা চলে যাবে—সোজা রাস্তা। তারপর স্টেশন বাঁয়ে রেখে বাজার ডাইনে রেখে শহর পিছনে রেখে বড় জোর আর দেড় মাইল পথ তো এগোনো। তারপর একেবারে গঙ্গার ওপর আমার বাংলো প্যাটার্নে তৈরি লাল রং বাড়ি তুমি তো দেখেছ ক'বার।'

'সে সব বলতে হবে না। ব্যারাকপুরের পথঘাট আমার মুখস্ত। তোমার বাড়ি আমাকে চেনাতে হবে না।' প্রসন্ন হয়ে বলাই টাকাটা পকেটে গুঁজল।

লেবুতলার গনেশ সাধুর মহামায়া হোটেলে বসে দুজনের যখন কথাবার্তা

শলাপরামর্শ চলছে, তখন শেয়ালদা স্টেশনে তুমুল ঝড় উঠেছে। সেই কোন্ সকালে ডেরা থেকে বেরিয়ে বেলা দুটোর সময় মুক্তা খালি হাতে ফিরে এল। না একটা পয়সা, না একটা চালের খুদ।

এদিকে কাল রাত থেকে শূলের বেদনায় কাতর হয়ে অনন্ত তার বিচালির বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। যদি মুক্তা দু'চার আনাও আনতে পারে তাই দিয়ে বৈঠকখানার দোকান থেকে সে বেদনার ওষুধটা কিনে আনবে ভাবছিল। আর পেটে ক্ষুধার একটা বাঘ নিয়ে চোখ দুটো জল জল করে টি-বি রুগী ননীবালা দরজার দিকে চেয়ে আছে। ভিক্ষা করে মুক্তা পয়সা আনবে, কি চাল আনবে, কি পাকা বেলটা, বীচে কলাটা কি শশাটা আনবে তার প্রতীক্ষা। ঠিক তখন কিনা মুক্তা ফিরল শূন্য হাতে। যেন এসে বারুদের মুখে পা দিল ও। পাগলা কুকুরের মতো ননীবালা দাঁত খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল। 'বিখ্যা করবার লাইগা বাইর অইছিলি তুই কোন্ হকালে, সূর্য ডোবাইয়া ঘর লইলি—কোন্ পীরিতের লাগরের সাথে আছিলি! একটা কানা পইসা না লইয়া বেড়াইয়া খেলাইয়া আইলি!'

'ঘরে দুই দুইডা রুগী। চাউল নাই, তেল নাই, জল ধরা অয় নাই, তুই কোনখান থন বিকাল কইর‍্যা ডেরায় ফিরা আইছস—মানুষের আপদে বিপদে তর পরাণ কান্দে না, জীবনভরা ভাত খাওয়াইয়া মানুষ করলাম।' বলে অনন্ত খেদ করছিল আর যন্ত্রণাকাতর চোখে ভাইঝির ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখখানা দেখছিল। কাকার কথা শুনে মুক্তার অনুশোচনা হচ্ছিল বা হবার উপক্রম করছে, এমন সময় ননীবালা পাশ থেকে কাটারিটা তুলে মুক্তার দিকে ছুঁড়ে মারল। গায়ে লাগল না। কাটারিটা চটের বেড়ার ওপর ছিটকে পড়ে চটটাকে আরো খানিকটা ছিঁড়ে দিল। 'তুই মইরা যা, অখন তরে নিমতলায় লইয়া যাউক মাইনষে।'

'আমি পারমু না। আমার ঠেকা নাই তুমারে ভিখ্যা কইরা রুজ রুজ ভাত খাওয়ানের।' মুক্তা আজ আর কাঁদছে না। বরং চোখ দুটো জল জল করছে তার। ছুটে ডেরার বাইরে যায় নি। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, স্থির হয়ে কথা বলে। 'আমি তুমাগো সংসারের কেউ না।'

'কি, কি বললি মুখপুড়ী!' যেন মেয়েটার মাথার চুল ছিঁড়তে রাগে কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে ননীবালা ছুটে আসে। মুক্তাও তৈরী হয়ে আছে। কাছে আসতে দু হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে ননীবালাকে সরিয়ে দেয়।

টাল সামলাতে না পেরে ননীবালা পড়বি তো পড় বিচালির বিছানায় শোয়া স্বামীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পেটে আঘাত পেয়ে অনন্ত চিৎকার করে ওঠে। ননীবালা পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে ওঠে, 'মাইরা ফেলাইছে গো, কালসাপিনী দুই দুইডা রুগীরে মাইরা ফালাইতাছে।'

চিৎকার শুনে চার-পাঁচটা পরিবার নিজেদের ডেরা ছেড়ে অনন্তর ডেরার সামনে এসে ভিড় করে।

কি, কি ব্যাপার? ননীবালা উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত নেড়ে সবিস্তারে সকলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়। অনন্ত শুয়ে থেকে কপালে করাঘাত করে তার মন্দ অদৃষ্টের কথা সকলকে শুনিয়ে দেয়। 'জীবনভরা ভাত দিয়া কালসাপ পুইষ্যা রাখছি হেই কথা আইজ তোমরা হুইনা যাও—ঘরে দুই দুইডা রুগীরে ফালাইয়া রাইখ্যা সারাদিন বেড়াইয়া আইছে—আইয়া মারামারি লাগাইছে। গুরু বেক্তি খুড়ীর গায়ে হাত তুলছে—'

শুনে আর পাঁচটা বাস্তুহারা পরিবার ছি ছি করে উঠল। 'দেশ বাড়ি ছাইড়্যা আমরা অখন রাস্তায় দাঁড়াইছি—সময় খারাপ। আমাগো মাথার উপরে চাল নাই পেটে দানা নাই। চউক্ষের ব্যারাম পেটের ব্যারাম বুকের ব্যারামের রুগী বাস্তুহারাগো মাইজে দিন দিন বাইড়া চলছে—এই অবস্থায় অখন যদি ছাইলা বাপেরে না দেখে ভাইয়েরে না দেখে, ভাইয়ের ছাইলা ভাইয়ের মাইয়া কাকারে খুড়ীরে না দেখে তবে আর আমাগো থাইকা ছাগল গরুর বেশকমডা কোন্‌হানে রইল। আমাগো এই ইস্টিশানে পইড়া থাইক্যা মইর্যা যাওয়া ভাল।'

'আমরা ছাগলগরুর অধম অইয়া গেছি।' আর একজন কে গলা বড় করে বলছিল, 'কথায় কয় অভাবে স্ববাব নষ্ট—অভাবে থাইক্যা থ্যাইক্যা অখন আমরা এমুন অইছি কেবল যার যার সুখ যার যার স্বার্থ দেখছি। বাপ ছাইলারে ফাঁকি দেয়, ছাইলা মায়ের মুখের পানে চাইতাছে না—'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুক্তা শুনছিল। সকলের ছি ছি শুনে এখন তার চোখে জল দাঁড়িয়েছে। যেন এতক্ষণ পর তার খেয়াল হয়েছে আজ এত জোর সে কোথায় পেল। কাকার সামনে কোনদিন তার মুখ খোলে নি। আজ কাকার মুখের ওপর সে বলতে পারল, এই সংসারের সে কেউ না। খুড়ীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। যেন হঠাৎ তার এমন বদমেজাজী বেপরোয়া হওয়ার পিছনে কি আছে, এ সম্পর্কে ও নিজে কী বলতে চায় জানতে পাঁচটা চোখ উৎসুক হয়ে

ডেরার বাইরে অপেক্ষা করছে।

মুক্তা ননীবালার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পা দুটা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি আর তোমাগো যন্ত্রণা দিমু না—আমি আর তোমাগো গলার কাডা অইয়া, মাথার বুঝা অইয়া থাকুম না। আমি এই শনিবারের মধ্যে চইলা যামু।'

কোথায় যাবে, কোন্‌খানে যাওয়া হবে, কার কাছে যাবে, কেন যাবে—পাঁচটা গলা সমস্বরে গর্জন করে ওঠে। যেন অনন্ত ও ননীবালার হয়ে পাঁচজন প্রশ্ন করে বসল, 'সমথ মাইয়া ঘর থাইক্যা বাইর অইয়া যাইতেছে মতলবডা কি?'

ভয় পেয়ে মুক্তা চুপ করে থাকে। বলতে পারে না সে চাকরি করতে যাচ্ছে। কেননা চাকরি করতে যাওয়ার সঙ্গে আর একটা মানুষ জড়িয়ে আছে। আর একটা মুখ মুক্তার চোখের সামনে ভাসছে। ফেরিওয়ালা—বলাই। বলাই এখানে প্রধান। আসলে বলাইয়ের সঙ্গে কি ও বেরিয়ে যেতে চাইছে না? যেন চাকরিটা এখানে একটা উপলক্ষ মাত্র।

'কথা কয়না ক্যানে। মুখ বুইজ্যা থাকলে চলবে না তো—এউকগা মাইয়া কোন্ শয়তানডার পাল্লায় পইড়া ইস্টিশান থন পলাইছে। তার পর আমাগো হুঁস অইয়া গেছে। পাজী শহর কইলকাতা—অখন তুমার যদি কামকাইজের স্থবিধা অইয়া থাকে ঠিকানা দিয়া যাইবা, জায়গার নাম বইলা যাইবা। না অইলে আমরা ছাড়মু না। এই হগল কাম ভাল না। আমাগো বাস্তহারাগো বদনাম অয়। কাগজে ছাপা অইয়া বাইর অইব আর এউকগা বাস্তহারা কুমারী মাইয়া শয়তানগো পাল্লায় পইড়্যা ঘর থন পলাইয়া গেছে। বিডামাডি ছাইড়্যা আইছি হেই দুঃখু সয়, এই হকল বদনাম সয় না।'

চাঁপার মুখটা মনে পড়ল মুক্তার। কিন্তু চাঁপার যাওয়া আর তার যাওয়া কি এক? যেন শক্ত করে বুক বাঁধল মুক্তা। খুড়ীর পা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। আঁচলের কোণা দিয়ে চোখের জল মুছল, তারপর সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটুখানি হাসল। আকাশের দিকে আঙল তুলে বলল, 'আমি আমার সগ্গীয় বাপ-মার কাছে চইলা যামু। আমার আর এই সংসারের জ্বালা দুঃখ সয় না।'

এবার বাস্তহারার দল চুপ করে থাকে। আর কোন কৌতূহল নেই, প্রশ্ন নেই, মন্তব্য নেই। যেন সবাই জব্দ হয়ে গেল। মনে মনে খুশি হয়ে মুক্তা তার ঠোঁটের শীর্ণ হাসিটা বিকৃত করে তোলে: 'এই শনিবার পার হতে দিমু না।

রেলগাড়ির তলায় গলা বাড়াইয়া দিয়া আমি শ্যাষ অইয়া যামু।'

লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ডেরার সামনে থেকে লোকগুলো সরে যায়। অনন্ত নির্জীব হয়ে বিচালির মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে পড়ে থাকে। কেবল গলা শোনা যায় ননীবালার: 'অখন গিয়া টেরেইনের চাক্কার নিচে পইড়া মরু—আমাগো গা-গতর ঠাণ্ডা অউক।'

মানে ননীবালা বিশ্বাস করতে পারছিল না মুক্তা তাদের ছেড়ে চলে যাবে। কথা না কয়ে মুক্তা উঠে দাঁড়ায়। তার ঠোঁটের কিনারে একটা চোরা বাঁকা হাসি উঁকি দিয়েছে।

॥ চার ॥

বলাই চালাক লোক। ট্যাক্সি ভাড়া করলে দশ টাকা থেকে আর ক'টাকা তার পকেটে বাঁচবে আগেই হিসাব করে রেখেছে। সুতরাং ট্যাক্সির কথা চিন্তাও করল না। সবচেয়ে সুবিধা ছিল ট্রেন। কিন্তু আর পাঁচটা বাস্তুহারা পরিবারের নাকের সামনে দিয়ে তাদেরই একটা পরিবারের মেয়েকে নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ধরার ঝুঁকি নিতে সে সাহস করল না। তা ছাড়া পুলিসের লোক সারা সময় মাছির মত উড়ছে এদিক ওদিক। তাই বুদ্ধি করে অন্য রাস্তা ধরেছে। সেই অন্ধকার থাকতে মুক্তা ডেরা থেকে বেরিয়ে পড়ে—ট্রাম বাস কিছু না—সার্কুলার রোড ধরে সোজা উত্তর দিকে হেঁটে গেছে। যেন ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে। বলাই আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। সেখানে দুজন একত্র হয়ে ব্যারাকপুরের বাস ধরেছে। কিন্তু একটানা বাস-এ চেপে থাকারই বা অর্থ কি। কেউ না কেউ তো দুজনকে সেই প্রথম থেকে দেখছে—বলাইকে মনে না রাখুক, ডাগর-চোখ কর্সা-ভুরু সমর্থ মেয়ে মুক্তাকে মনে রাখবেই। তাই সোদপুরে বাস ধরতে বলাই মুক্তার হাত ধরে নেমে পড়ল।

'আইসা পড়লাম নাকি?' মুক্তা মুচকি হাসে।

'না, একটু চা খেয়ে নিতে হবে না!' বলাই ঠোঁট টিপে হাসে। 'সেই রাত থাকতে তো বেরিয়েছি।'

'এখানে চায়ের দোকান পাইবা? ঐ যেন একখান দোকান দেখা যায়'।

'উঁহু।' বলাই ঘাড় নাড়ে। 'ভিড় বেশি। আর একটু এগোই।'

'না; ভিড়ের মাইঝে যামু না। আমাগো কথা কওয়ার অসুবিধা আছে।'

কি কথা? মনের কথা, প্রাণের কথা, ভালবাসার কথা! হঠাৎ কোনো কথা না বলে বলাই রাস্তার পাশের বটগাছটা দেখে। একটাও পুরোনো পাতা নেই। লালচে নতুন কচি পাতায় গাছ ছেয়ে গেছে। সকালের রোদ লেগে ঝলমল করছে। যেন মুক্তাও অবাক হয়ে গাছটা দেখছে। শহরের ধোঁয়া কালি আর ময়লা থেকে কতকাল পর বেরিয়ে এসে গাছের মাথায় ঝকঝকে রোদ আর গাছের ডালে পাখি দেখছে। কুউ—উ কুউ—উ। কোকিলটা ডেকে উঠল।

'মনে লয় আর তোমারে ছাইড়্যা থাকতে পারমু না।'

কিন্তু বলাই সাড়া দেয় না। যেন এদিক ওদিক তাকিয়ে চায়ের দোকান খোঁজে। টের পেয়ে মুক্তা কথা বন্ধ রাখে। হাঁটে। একটু হাঁটবার পর মনের মত দোকান পেয়ে যায় তারা। উঁচু সড়ক ছেড়ে দুজন মাঠের মত ঢালু জমিতে নেমে এল। মাটির হাঁড়ি কলসীর দোকানের পাশে ছোট চায়ের দোকান। ঘর না—চালা। তিন দিক খোলা। পিছনে ছেঁচা বাঁশের বেড়ার একটা আব্রু আর মাথার ওপর করোগেট টিন খান দুই। দেখে মুক্তা খুশি হয়।

'লোকজন নাই। দুই দণ্ড বইসা জিরাইতে পারমু'

'বেশি সময় পাওয়া যাবে না।' বলাই বলল, 'ওদিকে রান্নাবান্না করা থাকবে। দত্তমশাই অপেক্ষা করবে।'

যেন হঠাৎ চাকরির কথা মনে পড়তে মুক্তার চোখের ঝকমকে ভাবটা কমে আসে।

'না, তা অইলেও আমাগো কথাবার্তা ঠিক করতে অয়। শুন—'

'শোনা যাবে পরে।' বলাই বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে দোকানীকে চা দিতে বলে। কেরাসিন কাঠের বাক্স। তা হোক। বলাইয়ের গা ঘেঁষে মুক্তা বাক্সটার উপর পা ঝুলিয়ে বসল। ভাঁড়ে করে দোকানী চা এনে দেয়। 'দুখানা বিস্কুট চাই।' বলাই মুক্তার চোখের দিকে তাকায়। মুক্তা কথা না কয়ে মিট মিট হাসে। বিস্কুট দিয়ে দোকানী সরে যেতে মুক্তা বলল, 'তুমি কি আইজই আবার ফিরা্যা আইবা?'

'আমি?' বাবরিতে ছোটখাটো একটা ঝাঁকুনি দেয় বলাই। 'আমার কাজকর্ম আছে না—আমি কি কোথাও গিয়ে দু রাত থাকতে পারি।'

চুপ থেকে মুক্তা বিস্কুট খায়। চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বিস্কুটটা মুখে তোলে। যেন কি একটু ভেবে পরে বলে, 'আবার কবে তুমারে দেখব?'

এবার বলাই বিরক্ত হয়। চাপা গলায় বলে, 'আগে তো তুমি কাজে ভর্তি হও। আমি তো আছিই। আমি তো রইলামই।'

বিস্কুট খাওয়া বন্ধ রেখে মুক্তা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'শুন, আমি তুমার দিকে চাইয়া এই কামডা লইলাম। ভদ্দলোক খাওয়া-পরা দিতাছে আমারে, দিব তুমি বললা—আর কিছু হাতখরচ। এই টাকাডা আমি জমামু।'

বলাই চা খাওয়া শেষ করে বিড়ি ধরায়।

মুক্তা বলল, 'তুমিও কিছু কিছু জমাইবা না?'

'কেন?' প্রশ্ন করত বলাই, কিন্তু করল না, শুধু শুকনো একটু হাসল। 'দেখি, ঘরভাড়া হোটেলের খরচ জুগিয়ে জমাবার মতন টাকা আর হাতে থাকে কই। তা হলেও চেষ্টা করা যাবে।'

'চেষ্টা করতে অইব।' যেন বলাইয়ের ওপর দাবী করার মতন জোর এসে গেছে মুক্তার মনে। 'আমাগো দুইজনার ভবিষ্যৎ চাইয়া আমরা কিছু কিছু জমামু।'

বলাই ব্যস্ত গলায় দোকানীকে ডাকে। 'কত হল?'

'চোদ্দ পয়সা।'

বলাই পকেট থেকে পয়সা বার করে লোকটার হাতে দেয়। তারপর মুক্তার দিকে তাকায়। 'এখনো হয় নি?'

লজ্জা পেয়ে মুক্তা ভাঁড়ের বাকি চা-টুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। আঁচলে মুখ মুছে এদিক ওদিক তাকায়, একটু ইতস্ততঃ করে, তার পর বলাইয়ের কানে কানে বলে, 'এউগ্‌গা পান খাইবার ইচ্ছা করে।'

চায়ের সঙ্গে পান বিড়ি বিক্রী হয় এখানে বলাইও লক্ষ্য করেছে।

'খাও, একটা পানে আর কত খরচ হবে'—বলাই দোকানীকে এক খিলি পান দিতে বলে পয়সা বার করে।

পানের খিলি গালে পুরে মুক্তা বলাইয়ের সঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঢালু জমি ছেড়ে তারা বড় রাস্তায় ওঠে।

'হেই এউগ্‌গা বাস।' আর একটা বাস আসছে দেখে মুক্তা থমকে দাঁড়ায়।

বলাই মাথা নাড়ে। 'এখন আমাদের হাঁটতে হবে। বাস সামনে।'

মুক্তা খুশি হয়। 'এইডা ভাল বুদ্ধি। হাঁইট্টা হাঁইট্টা আমরা মেলা কথা কইতে পারমু। কেমন?'

বলাই ঘাড় নাড়ে। 'কথা কওয়া যাবে আর পয়সাও কম লাগবে। দত্ত-মশাই তো খরচপত্তর কিছু দিয়ে যায় নি। আমার কাছেও তেমন—'

অবাক হয়ে মুক্তা চোখ বড় করল।

'তা হেই কথা তুমি আমারে কও নাই ক্যানে—ইস্, চা পান খাইয়া আবার তুমার ক'ডা বেশি প'সা খরচ করাইয়া দিলাম।'

বলাই কিছু বলে না। গম্ভীর হয়ে হাঁটে।

'সব খরচ আদায় করবা ভদ্দলোকের কাছ থ্যাইক্যা। তেনার কামে তো আমরা যাইত্যাছি।'

'দেখা যাবে, সে আমি দেখব।' যেন প্রসঙ্গটা চাপা দিতে বলাই মুক্তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে। 'চমৎকার লাগছে। বুলবুলির ঠোঁটের মতন লাল টুকটুক করছে।'

ঠোঁটের সঙ্গে মুখখানাও লাল করে ফেলল মুক্তা। 'তাই নাহি?' ফিক্ করে হেসে একটুখানি কটাক্ষের মত করে ও বলাইয়ের দিকে তাকায়। 'তোমার চউখে যদি ভাল লাগে তবেই ভাল। পানডাও ভালোই খাইলাম।'

রোদ চড়ছে। যতটা সম্ভব গাছের ছায়া ধরে ধরে দুজন হাঁটে।

'শুন, আর একখান কথা কই। আমার ইচ্ছা চাইর ছ মাস ভদ্দলোকের বাড়ি থাকবার। তার মাইজে তুমি এউগ্‌গা কাম টাম জুগাড় করনের চেষ্টা করবা।'

'কেন, আবার কোথায় যাবে। ভাল লোকের কাছে তো—'

মাথা নেড়ে মুক্ত হেসে উঠল। চুলগুলো নড়ে উঠল। মেঠো বাতাসে আঁচলটা উড়ে উড়ে যায়। বাঁ হাতে বুকের সঙ্গে কাপড়টা চেপে ধরে ও ডান হাত দিয়ে বলাইয়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরে। হাত ছাড়ায় না বলাই। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বলে, 'যদি দত্তমহাশাইয়ের মন জুগিয়ে, গিন্নীমার মন জুগিয়ে চলতে পার সুখে থাকবে'—একটু থেমে বলাই শেষ করল: 'পয়সার তো অভাব নেই ওদের।'

মুক্তা কথা না কয়ে মুখ নিচু করে হাঁটে। বলাইয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। একটা আলগা নিশ্বাস ফেলে যেন কি ভাবে। ভাবনা

শেষ করে পরে ও মুখ তুলল।

'আমার কথাখান তুমি বুঝতে চাইতাছ না।'

সত্যি বুঝতে পারে নি বলাই—এভাবে উঁচু শব্দ করে হাসে। 'না, কি যেন বলছিলে আমার শুনি?'

'তুমার নিজের এউগ গা চাকরি বাকরি।' অভিমানের সুর বার করল মুক্তা। 'আমারে কি চিরডাকাল পরের বাড়িতে রাখবার ইচ্ছাখান তুমার?'

আর পরিষ্কার করে কিছু বলার দরকার হয় না। এখনও বুঝছি না বললে মেয়েটা তার ছলচাতুরী ধরে ফেলবে চিন্তা করে বলাই গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। 'না না, আমি কি বলছি চিরকাল তুমি ওখানে থাকবে—দেখি চেষ্টাচরিত্র করে, যদি চাকরিবাকরি একটা—'

মুক্তা চোখ মুছছে। কথা বলে না। কেবল হাঁটে। কিছুক্ষণ পর আবার ওর মুখ খুলল। 'খুড়ী আমার শত্রু। খুড়ীর সাথে সাথে কাকা পর অইয়া গেছে। অখন তুমারে ধইর‍্যা আমি পথে বাইর অইছি—আমার তুমি ছাড়া আর কেডা আছে কও।'

বলাই একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। যেন শহর থেকে যত দূরে আসছে, বেশি করে ও বলাইকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। চার মাস ছ'মাস। তারপর আর না। তারপর নিজের ঘর নিজের সংসার। এর মধ্যে বলাই একটা বাঁধা চাকরি যোগাড় করে ফেলবে। আর ওদিকে কুমারেশ দত্তর সংসারে খেটে হাতখরচের টাকাটা জমিয়ে ও মোটা পুঁজি করে ফেলবে। আশা। কত চট্‌ করে একটা মেয়ে সংসার পাতবার, ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে পরিচয় পেয়ে বলাই অবাক হয়। যেন একটু সময়ের জন্য তারও নেশা লেগে যায়।

'একটুখানি জিরিয়ে নাও—পা ধরে গেছে, না?' মেয়েটার কাঁধের ওপর বলাই হাত রাখল। 'রোদ যেন এখনই আগুন ঝরাচ্ছে।'

রাস্তার পাশের ছড়ানো ছাতিম গাছের ঘন ছায়ায় এসে দাঁড়াল দুজন। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে পারল না মুক্তা। বলাই তা হতে দেয় না। চোখের ইশারায় বারণ করে। আর একটা গাছের ছায়ায় দুটো অল্প বয়সের ছেলে বসে আছে। এদিকে তাকিয়ে আছে ওরা। গরু চরায়—চেহারা দেখে বলাই বুঝতে পারল। হাতের পাঁচন দুটো দিয়ে মাটি ঠুকছে আর যেন কি বলাবলি করে ছেলে দুটো একসঙ্গে খিল খিল করে হাসছে। একটু দূরে আর একটা গাছের ছায়ায় চার

পাঁচটা গরু শুয়ে থেকে ল্যাজ নাড়ছে, কান নাড়ছে।

'আমাগো দিকে চাইয়া দেখছে রাখালেরা।' মুক্তা ফিস ফিস করে বলতে বলাই ঠোঁট বেঁকিয়ে বিড়ি ধরায়। 'দেখুক না। ওদের বড় গ্রাহ্য করি কিনা। ভয়টা কিসের?'

'আমি আর কিছু ভয় করমু না। তুমার লগে যখন বাইর অইয়া আইছি আমার আর কোন ডর নাই। কেমন?'

হাঁ না কিছু বলল না বলাই। বিড়ি টানতে লাগল।

হাসি থামিয়ে একটা ছেলে গলা খুলে গান গায়। কি একটা সিনেমার গান। কলকাতার রাস্তায় দোকানে এ-গান এখন খুব চল—বলাই শুনে এসেছে। যেন মুক্তাও শুনেছে। একটু সময় কান পেতে থেকে গানটা এখন অবার শুনল ও, তারপর বলাইয়ের দিকে চোখ ফেরাল।

'যেইখানে যাইতাছি জাগাডা শহর না গাঁও?'

'শহরও বটে গ্রামও বটে—দুটোর মাঝামাঝি হবে আর কি।' বলাই মুক্তার চোখ দেখল। 'কেন?'

মুক্তা ফিক্ করে হাসল।

'হেই জাগায় ছিনেমাঘর আছে?'

'থাকবে হয়তো—' কি ভেবে নিয়ে পরে বলাই বলল, 'তা এক আধদিন সিনেমা দেখতে দিতে দত্তমশাই আপত্তি করবে না। হয়তো নিজে থেকে পয়সা দিয়ে পাঠাবে। বাবুর মন জুগিয়ে চললে সুখে থাকবে—আমি বললাম না?'

মুক্তার চোখের হাসি নিভে গেল।

'আমার এট্টা কথা তুমি বোঝতাছ না। আমি কি একলা ছিনেমা দেখতাম চাইতাছি।'

বলাই হাঁ করে তাকিয়ে মেয়েটার মুখ দেখে। মুক্তা চোখ তুলে গাছের পাতা দেখে। একটু পর চোখ নামায়।

'আমি তুমার সাথে একখান ছিনেমা দেখতাম চাই। মাইজে মাইজে যদি হেইখানে আস, আমারে তুমি ছিনেমায় লইয়্যা যাইবা সাধ করছিলাম।'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে—সুবিধামত একদিন না হয়—' বলাই উঠে দাঁড়ায়। 'চলো, এই বেলা আর একটু হাঁটা যাক। আর বেশিদূর হাঁটতে হবে না। সামনে খড়দার বাজারের কাছে বাস পাব।'

মুক্তা উঠে দাঁড়ায়। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করে। যেন এখনকার মত ওর মন রাখতে বলাই অল্প হাসল। 'পকেটে করে তোমার ব্লাউজটা নিয়ে এসেছি মনে করে। ওখানে গিয়েই কিন্তু ওটা পরে ফেলবে।'

ভার ভার গলায় মুক্তা বলল, 'দিবা—তুমার যখন যিডা মনে ধরে দিবা—এক কাপড়ে বাইর অইয়া আইছি তুমি তো দেখতাছ।'

'তা আমি চেষ্টা করব।' মিনমিনে গলায় বলাই বলল, 'কাপড় জামার জন্য ভাবতে হবে না তোমার। দত্তমশাই সব দেবে। সেরকম কথা আছে। পয়সার তো অভাব নেই মানুষটার।'

॥ পাঁচ ॥

সেদিন বিকেলে কাঠগোলা থেকে ফিরে এসে বাড়ির পিছনে আতাগাছের নরম ছায়ায় বেতের চেয়ার বিছিয়ে বসে কুমারেশ তার দুনলা বন্দুক সাফ করছে। একটা পায়জামা পরনে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। রোগা পাতলা মানুষ। এখন এই পোশাকে দেখলে কুমারেশকে মনে হয় না চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি বয়স হয়েছে। মুস্কিল হয়েছে মাথার চুলটা। এক একটা রাত যায়, আর পরদিন সকালে উঠে দেখা যায় আর এক গোছা সাদা হয়ে গেছে মাথাটা। আজ আর অবশ্য ততটা সাদা দেখা যাচ্ছে না। বেশ করে কলপ মেখেছে চুলে। কিন্তু তা হলেও কি আর বাইশ বছরের যুবক হতে পারছে! না কোনদিন পারবে! কুমারেশ সে রকম আশা করে না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনটাকে নবীন রাখতে আমাকে বাধা দেয় কে—চিন্তা করে কুমারেশ সারাক্ষণ মনে প্রাণে তরুণ সেজে থাকছে। কথাবার্তা চলাফেরা অনেকটা সে রকম।

ঘরে রুগ্ন স্ত্রী প্রভা ছাড়া দ্বিতীয় মানুষটি নেই—তাদের ছেলেপুলে হয় নি। হ্যাঁ, ঝি-চাকর পুষতে পারে না। কথাটা কুমারেশ বলে বটে, কিন্তু প্রভা বিশ্বাস করে না। শনিবার মনিব্যাগ বোঝাই করে কুমারেশ কলকাতায় যায়। তার পর সোমবার সকালে যখন বাড়ি ফেরে কিছু খুচরো ছাড়া ব্যাগটার মধ্যে আর কিছু পাওয়া যায় না। এই টাকা যোগ করলে মাসের শেষে তিনটে ঝি চাকরের বেতন হয়ে যায় না কি? বেশি কথা কাটাকাটি করলে কুমারেশ হাসে।

'তা সারাদিন তো বাবা আমি ঘরে বসা—ইলেকট্রিক কেটলি আছে আমার, উঠোনের উপর টিউবওয়েল—রান্না বল, ধোয়া মোছা বল—কোনটা বাকি থাকছে। অবশ্য এসব কাজে কুমারেশের শখ আছে বলা যায়। এবং কথাটা মিথ্যা না। কুমারেশ চমৎকার রান্না করতে পারে। ঘর ঝাঁট দিতে পারে। বিছানা করতে পারে। দরকার মত তোষক বালিশ রোদে দিয়ে আবার সে সব ঘরে তুলে আনতে পারে। 'দরকার কি চাকরবাকরের—চুরি করে ফাঁক করে দেবে। তবে হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা অল্প বয়সের মেয়েটেয়ে রাখলে সুবিধে হয়—তোমার সেবাযত্নটা চলে।'

শুনে প্রভা কিছু বলে না। কেমন বড় বড় চোখ মেলে কুমারেশকে দেখে। কুমারেশের তুলনায় প্রভা অনেক বুড়িয়ে গেছে, ক্লান্ত বিমর্ষ হয়ে আছে সারাক্ষণ। কিছুটা ব্যারাম, কিছুটা মানসিক অশান্তি এর মূলে। কুমারেশ বোঝে সব, কিন্তু এমন ভান করে যেন প্রভা কেন কেবল মুখ ভার করে থাকে, মন খারাপ করে থাকে ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারে না।

যেন এই জন্যই স্ত্রীকে প্রফুল্ল রাখতে কুমারেশ দরকারে অদরকারে হাসে। সোমবার সকালে কলকাতা থেকে ফিরে আসার সময় প্রভার জন্য মাখন, ফল, সুগন্ধি তেল, দামী সাবান, সিল্ক—কত কী নিয়ে আসে। এনে প্রভার বিছানার ওপর সব ছড়িয়ে দেয়। যদি একটু হাসে। যদি ওর মন খারাপ একটু কমে। কিন্তু কমে কি? এতসব জিনিস আনা হয়েছে দেখা শেষ না করেই প্রভা যখন কড়ি-কাঠের দিকে চোখ তুলে চুপ করে থাকে, তখন কুমারেশ বিব্রত বোধ করে। একটু সময়। আবার তখনি যে-কে-সে। জামা কাপড় ছেড়ে এক লাফে কুমারেশ উঠোনে নেমে যায়। মুর্গি ধরে নিয়ে আসে একটা। ছুরি দিয়ে গলা কেটে বারান্দায় বসে প্রভার চোখের সামনে মুর্গিটাকে ছুলতে আরম্ভ করে দেয়। যদি এক আধটা কথা স্ত্রীর মুখ দিয়ে বেরোয় এবার। কিন্তু দেখা যায় ফল মাখন সিল্ক দেখে প্রভা যেমন নির্বিকার থাকে এখনও তাই। অবশ্য কুমারেশ বক বক করতে থাকে। এক ডজন ভাল জাতের মুর্গির বাচ্চার অর্ডার দিয়ে এসেছে সে। টিটাগড় থেকে কাল পরশু এসে পড়বে। ডাক্তার মুর্গির সুপটার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর দুধ। তা দুধ প্রহ্লাদ গয়লার কাছ থেকে মোটামুটি তারা ভালোই পাচ্ছে। দুটো নতুন নেপালী গরু এনেছে কদিন আগে প্রহ্লাদ। তাছাড়া অন্যের বেলায় যা করুক, কুমারেশের স্ত্রী দুধ খায় জানা আছে বলে প্রহ্লাদ কোনদিন জল মেশাবে না, মেশাতে সাহস পাবে না। 'অবশ্য বাবার আমলে গরুটরু আমাদের

ছিল। এখনও যে আমি ছুটো একটা না রাখতে পারি তা নয়—কিন্তু গরুর হাঙ্গামা বেশি।'

খাটের ওপর বালিশে পিঠ রেখে আধশোয়া হয়ে বসে প্রভা কুমারেশের মুর্গি ছোলা দেখে। কথাগুলো শুনছে কিনা দেখতে কুমারেশ মাঝে মাঝে ঘাড় ফেরায়। শুনুক না শুনুক গ্রাহ্য করে না। বকে যায়। 'কলকাতায় বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেই বাবরিচুল ছোকরা। আমাদের ব্যারাকপুরের গণেশের চায়ের দোকানে কাজ করত। এখন ওখানে চিটাগুড়ের ব্যবসা করছে। তা ব্যবসা মন্দ চলছে না। ছু পয়সা করে ফেলেছে।' কথাটা বলেই কি ভেবে কুমারেশ হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে। কেন হাসল প্রভা প্রশ্ন করে না যদিও। লক্ষ্য করে কুমারেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার মুর্গির পাখা ছাড়ায়। 'ওর জানাশোনা একটা মেয়ে আছে। একেবারে বাচ্চা। তা হলেও ঘরের কাজকর্ম—কাজকর্ম মানে তোমার সেবাযত্নটা চলবে। আমি দেখেছি। গরীব। স্বভাবচরিত্র ভাল। বুধবার বিষ্যুতবার বলাই নিয়ে আসবে। খাওয়া পরা আর হাতখরচ বাবদ মাসে চারটে করে টাকা পাবে আমি বলে দিয়েছি।' বলা শেষ করে প্রভা কি বলে শুনতে কুমারেশ কান পেতে থাকে। কিন্তু কিছুই যখন শুনতে পায় না তখন নিজেই আবার আরম্ভ করে : 'তা অসুবিধা হবে না। ভাঁড়ার ঘরটা খালি পড়ে থাকে। রাত্রে ওখানে শুতে পারবে। রান্না-বান্নার কাজ চলবে কিনা বলতে পারব না। তবে তোমার স্যুপটা শুক্তটা যাতে সময় মতন নামিয়ে দিতে পারে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে নেব—ছু'দিন কাছে থেকে একটু দেখিয়ে দিলে পারবে। কেন পারবে না?' কথা শেষ করে কুমারেশ হাসে। প্রভা গম্ভীর। গম্ভীর থেকে সে লম্বা নিশ্বাস ফেলছে। কুমারেশ বারান্দায় বসে টের পায়। আর কিছুক্ষণ কথা বলে না সে। মুর্গির পেট চিরে টেনে টেনে নাড়ি-ভুঁড়ি বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার পর ঠ্যাং গলা আলগা করে। তার পর টুকরো টুকরো করে কেটে একটা কাসার বাটিতে রাখে। ছু ভাগে রাখে। এক ভাগ প্রভার জন্য আর এক ভাগে নিজের জন্য। একটার স্যুপ আর একটার পেঁয়াজ গরমশলার কারী।

রান্না চাপাবার আগে কুমারেশ এক কাপ চা তৈরী করে নেয়। 'তুমি কি একটু ছুধ খাবে?' কুমারেশ প্রশ্ন করতে ভোলে না। নীরব থেকে প্রভা কড়িকাঠে চোখ তোলে।

'একটু ছুধ গরম করে দিই?' কুমারেশ ছুবার জিজ্ঞেস করে।

প্রভা এবার মাথা নাড়ে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে কুমারেশ তার মাংসের

পেঁয়াজ কাটতে বসে যায়। 'অ, তেমন খিদে পায় নি—আচ্ছা আচ্ছা, একটু পরেই দুধটা খেও।'

'বাচ্চা মেয়েটার বয়স কত?' প্রভা এই প্রথম মুখ খুলল। যেন চমকে উঠল কুমারেশ। শব্দ করে হাসল। স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়ে সে চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়েছে। তার পর: 'জিজ্ঞেস করা হয় নি। আন্দাজে বুঝলাম বারো কি তেরো।' কথা শেষ করে কুমারেশ হাতের ছুরি দিয়ে কচকচ করে পেঁয়াজ কাটায় মন দিয়েছে।

মাংস চাপিয়ে কুমারেশ ঘরের টুকিটাকি কাজগুলো সেরেছে। এক ফাঁকে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ভিতরের অবস্থাটা দেখে এসেছে। ছোট একটা তক্তপোশ না হলে মেয়েটা শোবে কোথায়—চিন্তা করে কুমারেশ দুপুরে খাওয়ার পর তার চিরকালের অভ্যাস দিবানিদ্রাটির লোভ ত্যাগ করে রোদ মাথায় করে নিজেদের কাঠগোলায় চলে গেছে।

কুমারেশের বাংলো থেকে এক শো গজ দূরে কাঠগোলা। আগে এটা তার বাবার একলার সম্পত্তি ছিল। এখন কুমারেশের কাকারা কারবারের প্রায় বারো আনা অংশ গিলে রেখেছে। উপায় কি। কুমারেশকেই কাকাদের হাতে তুলে দিতে হয়েছে সেসব অংশ টাকার জন্য। সময়ে অসময়ে তার চিরকাল থোক থোক টাকার দরকার হয়েছে; এখনও হয়। ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গিয়েছিল কুমারেশের বাবা কুমারেশ তা অনেকদিন আগেই সাবাড় করে দিয়েছে। কেবল কি নগদ টাকা। কুমারেশের বাবার এতবড় তিনতলা দালান এখন বাজারের এক মহাজনের হাতে। অবশ্য এতবড় বাড়ির দরকারও ছিল না কুমারেশের। বাড়ি হাতছাড়া হতে কুমারেশ বরং হাল্কা নিশ্বাস ফেলেছিল। শহর বাজারের ঘিঞ্জি ছেড়ে গঙ্গার ধারে নিরিবিলি জায়গায় পাঁচকাঠা জমি নিয়ে সে মনের মত ঘর তৈরী করেছে। কংক্রিটের দেওয়াল টালির ছাদ। তা হলে হবে কি, দেখতে অবিকল বাংলোর মত হয়েছে। কুমারেশ নিজের হাতে বাড়ির সামনে গোলাপ বাগান করেছে। ভিতরের উঠানে আতা পেয়ারা করমচা কামরাঙ্গা গাছ লাগিয়েছে। তাই কুমারেশের উঠোনটা সারাক্ষণ ঠাণ্ডা ছায়ায় ঢাকা থাকে। না, এখানে ঘর বাঁধার সবচেয়ে বড় সুবিধা কাঠগোলাটা কাছে। কর্মচারী খাটিয়ে কুমারেশ তার কারবারের চার আনা অংশের কাজ দেখাশোনা করার ব্যবস্থা করতে পারছে না বলে দু'বেলা তাকে কাঠগোলায় উঁকি দিতে হয়। কাকারা আসেন না। তাঁদের লোক রয়েছে। নৌকো থেকে ক'শ টন কাঠ নামল, কি পরিমাণ কাঠ চেরা হল

—কল-করাতের কাজে ক'জন হাজির আছে, হাত-করাতীদের কে কে এল না হিসাব রাখতে লোকের দরকার আছে বৈকি।

সেদিন ভর দুপুরে বাবুকে কাঠগোলায় দেখে কর্মচারীরা একটু বিস্মিত হল বৈকি। কিন্তু কাজকর্ম দেখতে তো কুমারেশ আসে নি। এসেছে সে গোলার ছুতোর দুজনকে ডেকে রাতারাতি একটা তক্তপোশ তৈরি করে দিতে বলতে। এবং বলা সেরে কুমারেশ তখনি আবার ঘরে ফিরে গেছে। প্রভার দুখানা ময়লা শাড়ি আলনায় ঝুলছে। একটা একটু ছিঁড়েও গেছে। তা প্রভা তো আর এসব এখন পরছে না। সারাক্ষণ বিছানায় থাকতে হচ্ছে বলে এমনিও ওর শাড়ি সায়া ব্লাউজ কম লাগছে। সুতরাং ময়লা শাড়ি দুটো আর ওই ব্লাউজটা ধোবাবাড়ি দেওয়া হোক। ধুয়ে এলে বরং মেয়েটা পরতে পারবে। হোক না চাকরানী। নোংরা কাপড় জামা পরে ঘরে বারান্দায় ঘোরাফেরা করছে দেখলে কুমারেশ মোটেই বরদাস্ত করবে না। হাজাবটা প্রস্তাবের মত এই প্রস্তাব শুনেও প্রভার মুখ থেকে 'হাঁ' শব্দ বেরোয় নি। কড়িকাঠে চোখ তুলে টালি গুণেছে। এবং এ-সম্পর্কে আর দ্বিতীয় বাক্য প্রয়োগ না করে কুমারেশ আলনার ময়লা কাপড় জামাগুলো টেনে নিয়ে একত্র পুঁটলি করে তৎক্ষণাৎ ধোবাবাড়ি ছুটে গেছে।

সোমবারটা কেটেছে এভাবে। মঙ্গলবার সারাদিন একজন মিস্ত্রী ডাকিয়ে কুমারেশ উঠোনের পাশের রান্নাঘরটা সারিয়েছে। এতকাল আর ওটা ব্যবহার করতে হয় নি। প্রভা ব্যারামে পড়েছে পর কুমারেশ তার শোবার ঘরের বারান্দায় একটা টি-পয়ের ওপর ইলেকট্রিক হিটার রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্নার কাজটা সেরেছে। কিন্তু চাকর চাকরানীর হাতে হিটার তুলে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। খামকা কারেণ্ট খরচ করবে ওরা, নয়তো কি করতে গিয়ে কি করে ফেলে শেষটায় শক্ খেয়ে মরবে। কাজেই মেয়েটাকে দিয়ে যদি রান্নার তালিম দিতে হয় তবে আলাদা পাকঘরেই সেটা ভাল হবে। করমচা গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে ঠেকেছিল, আঁকসি দিয়ে কুমারেশ ঝোপঝাড় কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে দিল।

আজ বুধবার। বলাইয়ের এসে পড়ার কথা। সকাল থেকে কুমারেশ কেমন চঞ্চল অন্যমনস্ক। হাজারবার করে তাকিয়ে দেখছে বাইরেটা।

দুটো দেবদারু আর প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার ছায়া গায়ে মেখে পায়ে হাঁটা সরু পথটা স্টেশনের দিকে চলে গেছে।

এই রাস্তা ধরে বলাই আসবে হীরা মুক্তা চুনি কি পান্না সঙ্গে নিয়ে। কুমারেশ মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করতে বলাই হেসে উত্তর করেছিল : 'হীরা মুক্তা চুনি পান্না —যা খুশি ডাকতে পার রাজা। কেন না কমদামী জিনিস তোমার হাতে তুলে দিচ্ছিনে। নিজের চোখেই তো দেখে এলে।'

কথাটা মিথ্যা না। সেদিন স্টেশনের রাস্তায় মেয়েটাকে দেখে হোটেলে ফিরে কুমারেশ বলাইয়ের কথায় সায় দিয়েছিল। 'তাই বটে—চুনি পান্না হীরা মুক্তা যে-কোনো একটা নাম ধরে ডাকা যায়।'

এখন কুমারেশ নিজের হাতে একটু চা তৈরি করে খেয়ে তাই ভাবছিল। ভাবছিল আর বন্দুক সাফ করছিল। যেন ঘরে হীরা মুক্তা চুনি পান্না কিছুর আমদানি হবে, তাই এতদিন ফেলে রাখা বন্দুকের দিকে মনোযোগ গেছে।

আতা গাছের ছায়া আর একটু লম্বা হল। টুনটুনি আর শালিকদের কিচির-মিচির বাড়ল। বন্দুকটা খাড়া করে গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে কুমারেশ যখন একটা সিগারেট ধরাল তখন বলাই এসে সামনে দাঁড়াল। বলাইয়ের পিছনে মুক্তা। গায়ে টুকটুকে লাল-রং ব্লাউজ। আতাগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ভাঙ্গাচুরা রোদের টুকরো এসে মেয়েটার গালে গলায় কপালে চুলে নাচতে থাকে। যেন দম বন্ধ করে কুমারেশ এক মিনিট সেদিকে তাকিয়ে রইল। চোখা-চোখি হতে মেয়েটা চোখ নামিয়ে নেয়।

বলাইয়ের ঠোঁটের কিনারে হাসি। কুমারেশ তা-ও লক্ষ্য করল।

'বড় দেরি করে ফেললে।'

'হ্যাঁ, হুট্ করে কি আর বেরোনো যায়। এক জায়গার নাম করে রওনা হতে গেলেই এটা ওটা সারতে সারতে'—আড়চোখে মুক্তাকে দেখে বলাই পরে আবার কুমারেশের চোখে চোখ রাখে : 'বুঝলে না মামা ?'

'বুঝেছি বুঝেছি।' কুমারেশ ঘাড় কাত করল। যেন বলাই হাঁ করতেই কুমারেশ সব কিছু বুঝে নেয়। আর বলার দরকার নেই চোখমুখের এমন ভান করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সিগারেটে লম্বা টান দিল। তার পর :

'ভাগ্নে কি এই বেলা কেটে পড়বে ?'

'মামা, আমার তো কাজকর্ম সব ফেলে এসেছি। ফিরে না গেলে ক্ষতি।'

বলাই ঘাড় চুলকায়।

'তাও বটে তাও বটে।' কুমারেশ আড়চোখে মেয়েটাকে দেখে। 'তাহলে এই কথা রইল। এখানে থাকবে কাজকর্ম করবে। কাজ বেশি না। আমরা

স্বামী-স্ত্রী দুটি তো মানুষ। বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলা নেই—কি বলো ভাগ্নে?'

বলাই ঘাড় কাত করে।

কুমারেশ বলে, 'খাওয়া পরা পাবে। আমার আলাদা ঘর আছে। শোবার কষ্ট হবে না।'

এবার মুক্তা কুমারেশের মুখটা একটু বেশি সময় দেখে।

বলাই বলল, 'খাওয়া পরা আর কিছু হাতখরচ বাবদও—'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—সেরকমই তো কথা হয়েছে ভাগ্নের সঙ্গে। আপন লোকের মত থাকবে। কোনো কষ্ট হবে না—আমরা সেরকম লোক নই।' কুমারেশ ট্যারা চোখটা যতটা সম্ভব সোজা করে ধরে রাখার চেষ্টা করে বাঁধানো দাঁত বার করে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। 'যাও ঘরে গিয়ে গিন্নীমার সঙ্গে দেখা কর। তার পর কাপড়চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোও—এই তো উঠোনের উপর আমার টিউবওয়েল। আঙুল দিয়ে কুমারেশ করমচা গাছের তলায় টিউবওয়েল দেখিয়ে দেয়। 'বলাইয়ের সঙ্গে একটু কথা আছে। কথাটা সেরে নিই।'

মুক্তা করুণ চোখে বলাইকে দেখে। বলাইও করুণ চোখে মুক্তাকে দেখে। 'যাও গিন্নীমার সঙ্গে দেখা কর। পেন্নাম করবে। মামার সঙ্গে আমি কথাটা সেরে নিই।'

কি কথা হবে মুক্তা জানে। যেন দাঁড়িয়ে তার শুনতে ইচ্ছা করছিল। পথ খরচের সবটা টাকা যদি বলাই এখন আদায় করতে না পারে তার খুব কষ্ট হবে। তা ছাড়া ফেরার সময় যদি টাকা দুটাকা বেশি না পায় তবে কিছুটা রাস্তা হাঁটতে গেলেও 'কইলকাতা' পৌছতে কত যে রাত হবে তার ঠিক কি! দুশ্চিন্তা করতে করতে মুক্তা বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

'এইবেলা আমায় বিদায় কর রাজাসাহেব।' বলাই নিচু গলায় কথা বলে আর কুমারেশের চোখে চোখ রেখে অল্প অল্প হাসে। 'একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দিলাম—এখন আমার পুরস্কার চাই।'

খুব প্রফুল্ল না কুমারেশ। একটু কেমন চিন্তান্বিত। হাতের পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাছের গায়ে ঠেকানো বন্দুকটা দেখল এক সেকেণ্ড, তারপর বলাইয়ের দিকে চোখ তুলল: 'কাল বিষ্যুতবার। মানে লক্ষ্মীবার। কাল আর হয় না। পরশু শুক্রবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ। শনিবার—শনিবার আমি ভোরের ট্রেনে কলকাতায় যাচ্ছি—সকালে চেক ভাঙ্গিয়ে আমি যা হোক তোমাকে—আজই

পারতাম, কিন্তু পার্টি কিছুতেই নগদ টাকা দিলে না, দিলে এক চেক্।'

ঘামছিল বলাই। হঠাৎ কি বলবে যেন কথা খুঁজে পায় না। কি একটু চিন্তা করল। তার পর: 'শনিবার কত দেবে ঠিক করেছ?'

যেন হঠাৎ কি উত্তর দেবে কুমারেশও ভেবে পায় না। ঘাড় নামিয়ে উঠোনের মাটি দেখে। কি একটু চিন্তা করে পরে চোখ তুলল। 'পনেরো। আচ্ছা ঠিক আছে, দশ টাকার দুখানা নোটই আমি তোমায় দেব। কেমন খুশি তো? পুরস্কার দেব যখন বলেছি কথার নড়চড় হবে না।'

থুথু ফেলল বলাই উঠোনে। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল। বাবরিতে একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দিল। তারপর চোখ দুটো গোল করে ফেলল। 'পনেরো কুড়ি টাকার জিনিস তোমায় এনে দিলাম মনে করেছ নাকি! নাকি পনেরো কুড়ি টাকার জন্য আমি শালা অতবড় ঝুঁকি নিলাম।'

যেন রাগ করে বলাই ঘুরে দাঁড়ায়। মেয়েটাকে এখনি ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে নাকি! ব্যস্ত হয়ে কুমারেশ বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'ঠিক আছে, আরো দশ টাকা—'

কুমারেশকে কথা শেষ করতে দেয় না বলাই। ঘাড় ঘুরিয়ে চাপা গলায় গর্জে ওঠে: 'একশো তন্‌খা—তার পাইটি কম হলে চলবে না। কুড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকায় এ জিনিস হয় না। কাজেই তুমি চিন্তা করে—'

মুস্কিলে পড়ল কুমারেশ। মাটির দিক চোখ নামিয়ে আবার ভাবে। এক মিনিট। যেন এবারও বুদ্ধি ঠিক করতে, মন স্থির করতে, এক মিনিটের ভাবনাই যথেষ্ট। পরক্ষণে হাসে। বলাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমি শনিবার যাচ্ছি—সেদিন সবটা না পারি সামান্য কিছু যদি বাকি থাকে সেটা পরের শনিবার—কেমন?'

হাঁ না কিছু বলল না বলাই। চোখ বড় করে দেখছে কুমারেশের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মুক্তা আবার উঠোনে নেমে এসেছে। কুমারেশও সেদিকে তাকায়।

মুক্তা কাছে এসে দাঁড়াতে বলাইয়ের চেহারা বদলে যায়। অল্প অল্প হাসছে সে। দেখে কুমারেশ নিশ্চিন্ত হয়। মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলাই কথা বলে। 'আমি চলি।'

মুক্তা কথা না বলে মুখ নিচু করে।

বলাই হাঁটে। মুক্তা সঙ্গে সঙ্গে এগোয়। পিছন থেকে কুমারেশ বলে, 'শনিরার সকালে আমি কলকাতা যাচ্ছি ভাগ্নে—হ্যাঁ, ঠিক যাব।'

বলাই ঘাড় ফেরায় না বা ঘাড় কাত করে না। যেন কথাটা শুনেও শুনছে না এমন ভান করে উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে মেয়েটা। বেতের চেয়ারে বসে পড়ে কুমারেশ নতুন সিগারেট ধরায়। বিড়বিড় করে নিজের মনে কি বলে। ট্যারা চোখটায় কেমন একটা দুষ্টু হাসি উঁকি দিয়েছে।

কুমারেশের গোলাপ বাগান পিছনে ফেলে বড় তেঁতুল গাছটার কাছে এসে বলাই ঘুরে দাঁড়ায়। মুক্তাও দাঁড়ায়। কিন্তু চোখ দুটো বলাইয়ের দিকে। মুক্তা আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

'তুমি আবার কবে আইবা আমারে কইয়া যাও।'

'আসব—এই ধরো সামনের হপ্তা—কাজের চাপ কমছে দেখলেই চলে আসব—'

কি একটু ভেবে মুক্তা বলল, 'পথের খরচপত্র যা যা অইছে আদায় করলা?'

'হুঁ কিছু করেছি—সবটা হয় নি।' বলাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকায়।

'ক্যানে, সবটা করলা না ক্যানে—কি বলে তোমার মামার বন্ধু?'

বলাই কথা বলে না। গালের পেশী কেমন শক্ত হয়ে ওঠে। যেন কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরে মুক্তা ফের প্রশ্ন করে:

'কি বলে? আর দিব না?'

'দেবে না মানে?' বলাইয়ের ঘাড়ের পেশী দুটো এবার শক্ত হয়ে ওঠে। 'ওর ঘাড় দেবে। পাঁচটা টাকা গাট থেকে খরচ করেছি, ইয়ার্কি! তাছাড়া লোক যোগাড় করে দিতে পারলে আমার দু টাকা বখশিশ। তা-ও পেলাম না। বলছে শনিবার দেবে।'

'তবে কি লোকটা ভাল না মনে অইতাছে তুমার—তবে তো আমার টাকাপয়সা লইয়া গোলমাল করতে পারে।'

'না, সে হবে না, তার জন্য ভাবনা নেই—দেবে, আমাকেও দেবে—চেক্ ভাঙ্গাতে পারে নি বলছে।'

মুক্তা চুপ করে থাকে। বলাই হাত দিয়ে বাবরি ঠিক করে।

'যাও, তুমি ঘরে যাও—কাজে লেগে যাও।'

'তুমি আইবা, আমার মাথার শত দিব্যি। আমি এইখানে রইলাম, আমার মনডা পইড়্যা থাকব বৈঠকখানা বাজারে।'

আর কথা না কয়ে বলাই হাঁটতে থাকে।

যতক্ষণ দেখা যায় তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে মুক্তা চোখ মোছে, সামনের দিকে

তাকায়। তার পর আর মানুষটাকে দেখা যায় না। তেঁতুল আর বাবলার ছায়া ঢাকা আঁকা বাঁকা শূন্য পথের ছবিটা বুকে নিয়ে আস্তে আস্তে মুক্তা গোলাপ বাগানের দিকে ফিরে আসে।

॥ ছয় ॥

সূর্য ডুবছে। পাখির কিচির মিচির আরো বাড়ছে। কুমারেশের উঠোনের করমচা গাছ আতা গাছ আর পেয়ারা গাছের ডালে পাতায় এখন কত যে শালিক চড়ুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ওড়াউড়ি করছে তার সীমা সংখ্যা নেই। টিউবওয়েল টিপে বড় বড় চার বালতি জল তুলে নিয়ে মুক্তা মুর্গির ঘরের পিছনে স্নান সেরেছে। কুমারেশ জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছে। আগে ওপাশে একটা ছেঁচা বাঁশের বেড়ার আব্রু ছিল, প্রভা ওখানে স্নান করত। এখন প্রভার স্নানের দরকার হয় না বলে কুমারেশ আর ভাঙ্গা বেড়াটা সারাতে বা নতুন বেড়া জুড়তে গা করে নি। কাজেই মুর্গির ঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে মুক্তাকে গায়ে মাথায় জল ঢেলে পরে সেখানে ভিজা কাপড় ছাড়তে হয়েছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে মেয়েটা উঠোনে এসে দাঁড়াতে কুমারেশ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল। প্রভার কালো পাড় শাড়িটা ধোবাবাড়ি থেকে ধুয়ে এসেছে। কুমারেশ সেখানা পরতে দিয়েছে মেয়েটাকে। আর গায়ে উঠেছে বলাইয়ের দেওয়া সেই লাল ব্লাউজটা। চমৎকার লাগছে। যেন আধ ঘণ্টার মধ্যে চেহারা বদলে গেছে। শিয়ালদার রিফুইজি না, ঘরের একটি টুকটুকে রাঙা মেয়ে। কুমারেশ আজ প্রভার চোখের সামনে বারান্দায় না বসে করমচা তলায় বসে মুর্গি ছুলছে।

'হুঁ, ওইখানে ছড়িয়ে দাও—তা ওটার আর আছে কি—ফেলে দিলে হয় না?' মুক্তার ছেঁড়া ময়লা ভিজা শাড়িটার ওপর চোখ রেখে কুমারেশ নাক কুঁচকায় আর হাসে।

কথা না বলে মুক্তা শাড়িটা উঠোনের পাশে কুমারেশের সব্জি বাগানের বেড়ার গায়ে ছড়িয়ে দেয়।

ট্যারা চোখ বেঁকিয়ে কুমারেশ ওর কাপড় ছড়ানো দেখে। পিঠময় ছড়ানো ভিজা চুল। কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। এখনো লালচে ভাবটা রয়ে

গেছে। স্নান করার আগে অবশ্য কুমারেশ তার সুগন্ধি তেলের শিশিটা ওকে এগিয়ে দিয়েছিল। শিশির মুখ কাত করে মেয়েটা যখন হাতের তেলোয় তেল ঢেলে নেয়, অনেকটা তেল ঢালা হয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে ও কুমারেশকে দেখতে কুমারেশ হেসে ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'সবটা মেখে ফেলো, সবটুকু দরকার হবে, চুলের যা চেহারা হয়েছে।'

আর ভয় থাকে না, যেন লজ্জা পেয়ে মুখখানা লাল করে মুক্তা সবটা তেল মাথায় মাখে। এখনও চুলের লাল রং রয়ে গেল দেখে কুমারেশ একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। 'হয়ে যাবে—দিন দুই একটু বেশি বেশি করে মাখলে চুলের কুচকুচে কালো রং ফিরে আসবে--এমন ভাল তেল আমার।' মনে মনে বলে কুমারেশ মুর্গির পাখা ছাড়াতে মুখ নামায়। পরক্ষণেই আবার ঘাড় সোজা করে ধরে। 'হুঁ, ও-ঘরে আরসি চিরুনি পাবে—তোমার ঘরে আলাদা আরসি চিরুনি রাখা হয়েছে।'

কর্তাবাবুর কথা শোনে মুক্তা। কিন্তু সেদিকে তাকাতে সাহস পায় না। ঘাড় নিচু করে আস্তে আস্তে উঠোন পার হয়ে ও তার ঘরে—কুমারেশের ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরে এসে ঢোকে। শেয়ালদার সাড়ে ছ'আনা দামের খেলো আরসি না—বেশ বড়সড় কাঠের ফ্রেম করা সুন্দর দামী আরসি আর কচিপাতা রং মোটা চিরুনি। দেখে মুক্তার চোখ বড় হয়ে যায়। খুশি হয়ে চুল আঁচড়াতে বসে। নতুন তক্তপোশ। তক্তপোশের কিনারে পা ঝুলিয়ে আরসিটা দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজের মুখ দেখতে দেখতে ও চুলে চিরুনি চালায়। কিন্তু চিরুনি আটকে আটকে যায়। মাথায় অসংখ্য জট। এতকালের জট কি আর এত চট্ করে ভাঙতে চায়। তা হলেও চুলের গন্ধটা আজ যেন মুক্তার নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এমন ভাল তেল, অত দামী তেল মাথায় মেখে মুক্তা কেমন যেন একটা অস্বস্তিও বোধ করছিল।

তবে হ্যাঁ, বলাইয়ের সঙ্গে বা মুক্তার সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে কর্তাবাবু কি করবে তা এখনও বোঝা যায় না। কিন্তু মানুষটার 'শরীলে' দয়ামায়া আছে মুক্তা এখানে পা দিয়ে বুঝতে পেরেছে। কেমন ভাল ধোয়া একখানা কাপড় পরতে দিয়েছে আসতে না আসতে। 'কিন্তু কর্তামা আমার মুখের পানে, শরীলের পানে চাইয়া তখন এমন মুচকি একটু হাসল ক্যানে? আমি গিয়া পেন্নাম কইরা দাঁড়াইছি আর আমার দিকে চাইয়া কেবল এক চিল্‌তা হাইসা মুখ ঘুরাইয়া লইছে। একখান কথা কয় নাই।' মুক্তা এখন আবার ভাবল,

'কে জানে—ডাক্তার কবিরাজের নিষেধ থাকতে পারে কথাবার্তা বেশি কওন নাই। বেরামডা কি? বাত? বলাই যেন বাতের রুগী বলছিল এইখানে আইবার কালে।'

'অন্ধকার হয়ে গেল না? মুখ দেখা যায় আয়নায়?' কুমারেশ এসে দরজায় দাঁড়ায়। ত্রস্ত হাতে মুক্তা আঁচল দিয়ে বুক ঢাকে। সত্যি তো ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে আলো ঝাপসা হয়ে গেছে। মুক্তার খেয়াল নেই।

কুমারেশের হাতে একটা হ্যারিকেন ঝুলছে।

'এ-ঘরে বালব নেই—পয়েন্ট আছে। ঘর খালি থাকে বলে বালব লাগানো হয় নি—দেখি, কাল বাজারে গেলে একটা আনা যায় কিনা—এটা রাখো।'

হাত বাড়িয়ে মুক্তা আলোটা ধরে। আলোর ঝলক লেগে চোখের কালো মনি দুটো ঝকমক করে ওঠে।

কুমারেশ আবার হাঁ করে তাকিয়ে দেখে।

মুক্তা মুখ নামায়। কুমারেশ একটা ঢোক গিলল।

'মাংস কাটা হয়ে গেছে—এইবেলা একটু বাটনা বেটে—'

'আমি যামু। আমি মশল্লা করমু।' মুক্তা মাটির দিকে চেয়ে কথা বলে, 'আমার চুল আঁচড়ান অইয়া গেছে।'

'না, অত তাড়াহুড়ো নেই—তুমি এসো—উনন ঠিক করা আছে। কয়লা টয়লা সব ভাঙ্গিয়ে রেখেছি। এখন আগুন দিয়ে—'

'আমি যাচ্ছি।' একটু শুদ্ধ ভাষায় মুক্তা কর্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করল। 'আপনি বিশ্রাম নেন, আমি রান্না লামাতে পারব।'

মিষ্টি গলা। সাধু অসাধু শব্দ মেশানো কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা কাঁচা কচি গন্ধ আছে। জীবনভোর বড় বেশি মাজাঘষা চাঁছাছোলা ভাষা শুনে শুনে কুমারেশের কান খরখরে হয়ে গেছে। আজ কেমন ঠাণ্ডা লাগছে, নরম লাগছে এর কথা। চিন্তা করে কুমারেশ দরজা ছেড়ে উঠোনে নামল।

'না, একেবারে আনাড়ি না। রান্নায় হাত আছে। আর বেশ চটপটে।' কুমারেশ প্রভার মুখ দেখে। পিঠে বালিশ রেখে খাটের ওপর বসে প্রভা মাংসের স্যুপ দিয়ে পাউরুটি খায়।

প্রভা কথা বলছে না দেখে কুমারেশ আবার বলে, 'আমি একবার বলে দিতে বুঝে নিল। কেমন হয়েছে স্যুপ?'

প্রভা মুখ তুলল। তার ঠোঁটে সেই চুল্ল চেরা সূক্ষ্ম হাসি। তখন মেয়েটাকে

দেখে যেভাবে হেসেছিল। 'এই বুঝি তোমার বাচ্চা ঝি?'

কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায় কুমারেশ। এক সেকেণ্ড। তার পর বড় করে হাসে। 'তাই বসে বসে কেবল ভাবছ, হা—হা—আরে বাচ্চা হলে কি দুধের বাচ্চা আমদানি করব এখানে—কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে তো। না হলে খামকা একটা লোক রাখা কেন।'

প্রভাকে নীরব হয়ে যেতে দেখে কুমারেশ খুশি হয়। তা খুশি হয়েও ট্যারা চোখটা সতর্কভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে ধরে রাখে। কেননা যে কোন প্রশ্ন যে কোন আক্রমণ রুখতে কুমারেশ জিভের আগায় উত্তর নিয়ে সর্বদা তৈরী থাকে—উত্তর খুঁজে না পেলে হাসে।

আপাতত আর কোন কথা হবে না অনুমান করে কুমারেশ বলল, 'যাই—আমাদের মাংসটা এবার চাপিয়েছে হয়তো। ঠিক মত কষিয়ে নিচ্ছে কিনা একটু দেখতে হয়।' বলে কুমারেশ প্রভার সামনে থেকে কেটে পড়ল। প্রভা খাওয়া বন্ধ করে দরজার দিকে চেয়ে আছে টের পেয়েও কুমারেশ ঘাড় ফেরায় নি। হন হন করে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে এল।

দুটো হাঁটু একত্র করে বসে তার ওপর থুতনি রেখে মেয়েটা যেন ঘুমুচ্ছে। মাংস টগবগ করছে উনুনে। দরজায় উঁকি দিয়ে কুমারেশ চুপচাপ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। পিঠের বাঁকটা কী সুন্দর। যেন নরম একটা বেতডগা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। খোঁপাটাকে মনে হচ্ছে এক ছড়া বেতফল। দুটো হাত পায়ের পাতার উপর নামানো। একটা হাতের আঙুল আর একটা হাতের আঙুল জড়িয়ে ধরেছে। যেন বেতগাছের শিকড়গুলো। কুমারেশের মনে কোনদিন কবিত্ব আসে না। আজ এল। মেয়ে বলতে মেয়েদের গায়ের মাংস ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে, বুঝতে চায় না। কিন্তু আজ যেন তার মন বদলে গেল। বদলে যাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে তার লতার কথা মনে পড়ছে, গাছের কথা, ফুল ফল পাখির ডাক। এ বড় অদ্ভুত।

অল্প শব্দ করে কাশল কুমারেশ। মুক্তা চমকে উঠে ঘাড় ফেরায়।

কুমারেশ হাসে। 'চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে।'

কথা না বলে মুক্তা সসপেনের ঢাকনা সরিয়ে চামচ দিয়ে মাংস নেড়ে দেয়।

'জল শুকাইছে।' মুক্তা আবার এদিকে ঘাড় ফেরায়। চৌকাঠ ছেড়ে কুমারেশ ভিতরে ঢুকল। মেয়েটার পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াতে কেউ বাধা দিচ্ছে না তাকে। বুকের মধ্যে বিশ্রী দুরদুর শব্দ হচ্ছে তার। কিন্তু তা হলে হবে কি,

কুমারেশ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হয়ে এসেছে। দশ মিনিটের মধ্যে সেদ্ধ হয়ে যাবে। এইবেলা জল গরম করে নাও। হ্যাঁ, সস্‌পেনের মুখে বাটি চাপিয়ে দিলে জল গরম হবে।'

'আমি পারমু, আমি মাংস পাক কইরেছি ছাশে।'

'মুর্গি ?'

মুক্তা মাথা নাড়ল। 'পাঁঠা কাছিম।'

'কাছিমের মাংস চমৎকার।' কুমারেশ একটু নুয়ে দাঁড়ায়।

মুক্তা পিঠ বেঁকিয়ে কেমন একটু আড় হয়ে বসে। আঁচলটা বুক থেকে টেনে নিয়ে কাঁধ গলা ঢেকে দেয়।

'কাল কাছিম আনব। কাছিম রেঁধে খাওয়াবে ?' কুমারেশ হাসে।

'আইচ্ছা।' ঘাড় নিচু করে নখ দিয়ে মুক্তা পায়ের আঙুল খোঁটে। আর কথা না কয়ে কুমারেশ একটা বড় রকমের ঢোক গিলে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

খাওয়ার পর বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম আসবে ভেবে রেখেছিল মুক্তা। কিন্তু তা আর এল কোথায়। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় কুমারেশের উঠোন, ঘরের দাওয়া, গাছের মাথা চকচকে ঝকঝকে হয়ে আছে। কতকাল পর চমৎকার জ্যোৎস্না-ভরা রাত দেখল ও। শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম ফুটপাথ বিজলী-বাতির কড়া আলোয় ভোর রাত পর্যন্ত চোখ ধাঁধিয়ে রাখে। কোন্‌টা জ্যোৎস্নার রাত কোন্‌টা অন্ধকার রাত মানুষ বুঝতে পারে কি ? তার ওপর সারাক্ষণ সেখানে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার গন্ধ পোড়া পেট্রলের গন্ধ পানবিড়ি সিগারেটের গন্ধ মানুষের গায়ের গন্ধ প্রস্রাবখানার গন্ধ ফিনাইলের গন্ধ আর শত শত বাস্তুহারা পরিবারের ময়লা কাপড়চোপড় হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকম্বলের গন্ধ নাক দিয়ে টেনে টেনে মুক্তা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আজ সেসব কিছুই না। ফাল্গুন মাস। আমের বোল এসেছে গাছে গাছে। সজনে ফুল ফুটেছে। রাস্তা দিয়ে আসতে মুক্তার চোখে পড়েছে। এখানে কুমারেশের উঠোনের পাশে আতা গাছে আতাফুল ফুটেছে। এখন সেসব ফুলের গন্ধ কুঁড়ির গন্ধ নতুন পাতার গন্ধ গায়ে মেখে রাতের বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। তার ওপর মুক্তার মাথার চুল সেই বিকেল থেকে মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। এত সব ভাল ভাল গন্ধ মুক্তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একবার চোখটা জড়িয়ে এসেছিল রান্নাঘরে। এখন সেটা কেটে

গেছে। তার ওপর গরম গরম মাংস-ভাত খেয়ে শরীরটা কেমন তাজা লাগছে, নতুন লাগছে। তক্তপোশের ওপর নতুন বিছানায় শুয়েছে সে। কর্তাবাবু একটা মশারী দিয়েছে। অনেকদিন পর মশারীর ভিতর শুয়ে তার হাঁপ ধরছিল। তাই এক সময় উঠে মশারী গুটিয়ে শিয়রের দিকের জানালার একটা পাল্লা খুলে দিয়েছে। বুকের নিচে বালিশ রেখে মুক্তা ঘাড় তুলে জানালার বাইরের জ্যোৎস্না গাছের পাতার দোলানি দেখছিল আর বুক ভরে বসন্ত রাত্রির গন্ধ নিচ্ছিল। হঠাৎ এত সুখের মধ্যে এসে পড়বে সে জানত কি। কে তাকে নিয়ে এল এখানে। চিন্তা করতে মুক্তার বুকের ভিতর খচ্ করে উঠল।

বলাইয়ের মুখটা মনে পড়ছে। বলাই কইলকাতা যাইয়া পৌছব এতক্ষণে! আহা মানুষটা এক কাপ চা না খাইয়া আবার রওনা দিল। যদি রাইতে এইহানে থাকত নিজের হাতের রান্না মাংস একটুখানেক খাওয়াইয়া দিতাম। ভালবাসত আমার হাতের রান্ধা খাইয়া। কর্তাবাবু যখন রান্ধার অত পরশংসা করল।

মুখে আঙুল দিয়ে মুক্তা চুপ করে ভাবে। বলাইয়ের মাথার বাবরি—তার লম্বা চওড়া শরীরটা চোখের সামনে ভাসে। রাস্তার পাশে ছাতিমতলার ছায়ায় ঘাসের ওপর হাঁটু টান করে বসা বলাইয়ের ছবিটা মনে হতে বড় বেশি ছটফট করতে লাগল ও। ছটফট করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। প্রভাও ঘুমিয়ে পড়েছিল তার ঘরে। কেবল ঘুম ছিল না কুমারেশের চোখে। বস্তুত যেদিন বাড়িতে থাকে সন্ধ্যার পর আলমারি থেকে বোতল গ্লাস টেনে নিয়ে 'মাত্রা মতন' একটু গলায় ঢালে সে। বাইরের খাওয়া আর ঘরে বসে খাওয়ার এই তফাৎ। বাইরে মাত্রা থাকে না। সে যাই হোক আজ নিয়মরক্ষা করতেও একটু-খানি খাওয়ার কথা কি করে ভুলে গেল কুমারেশ অবাক হয়ে এখন ভাবছিল। ভেবে তার ঠোঁটের কিনারে হাসি উঁকি দিয়েছে। তাই হয়। একটা নেশা আর একটা নেশাকে ভুলিয়ে দেয়। রিফুইজি মেয়েটা কুমারেশের কুড়ি বছরের নিয়ম ওলটপালট করে দিল তো! সেই বিকেল থেকে মেয়েটার কথা শুনতে, ওর সঙ্গে দুটো বেশি কথা বলতে, একটু বেশি সময় ওর দিকে তাকাতে কুমারেশকে কত বেশি কথা বলতে হয়েছে, কতবার রান্নাঘর টিউবওয়েল আর ভাঁড়ারঘরের দিকে ছুটতে হয়েছে দরকারে অদরকারে। যেমন প্রভাকে ঠাণ্ডা রাখতে, ভুলিয়ে রাখতে দরকারে অদরকারে কুমারেশকে হাসতে হয়, কথা বলতে হয়। খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে মুক্তার শুতে যাওয়া পর্যন্ত কুমারেশ পিছনে পিছনে রয়েছে। 'হুঁ', বেশ ভাল করে দরজায় খিল এঁটে শোবে। না, চোরডাকাতের ভয় এখানে নেই। তাঁ

ছাড়া চোরডাকাত আসবে কি—আমার বন্দুক আছে ওরা জানে।' কুমারেশ হেসেছে। মুখ নামিয়ে মেয়েটাও হেসেছে। হেসেছে আর হাত দিয়ে হ্যারিকেনের সলতে তোলার চাবিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সলতের আগুনের কালো ফুলটা সরাতে চেষ্টা করেছে।

'তেল ফুরিয়েছে। একটু তেল ঢেলে নাও। তোমার ঘরে কেরাসিনের টিন আছে।' কুমারেশ বলেছে।

'আর তেল ঢালবার কাম নাই। এখন তো শুমু।' মুখ না তুলে মুক্তা উত্তর করেছে।

'হ্যাঁ, শুয়ে পড় রাত হয়েছে।'

কুমারেশের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা দরজার খিল এঁটে দিয়েছে। তারপরও কুমারেশ কতক্ষণ দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পর সেখান থেকে সরে এসে এখন বারান্দায় বেতার চেয়ারে বসে উঠোনের জ্যোৎস্না আর ছায়ার খেলা দেখছে। চোখে ঘুম নেই। পুরনো নেশা চিরকাল তাকে ঘুম পাড়িয়েছে, নতুন নেশা চোখের ঘুম কেড়ে নিল।

॥ সাত ॥

কর্তাবাবু যখন বাড়িতে থাকে কর্তামা কথা বলে কম—মুখখানা ভার করে রাখে। হাসি কাকে বলে জানে না। কিন্তু কর্তাবাবু বাড়ির বাইরে গেলে কর্তামা অন্য মানুষ হয়ে যায়। কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে—কেমন মিষ্টি হাসি ঠোঁটে উঁকি দেয় তখন।

সকালে বাজার করতে কুমারেশ বেরিয়ে যেতে মুক্তা এটা লক্ষ্য করেছে। কাল গিন্নীমা তার সঙ্গে কথাই বলে নি, আজ কুমারেশ বাইরে যেতে মুক্তাকে আদর করে ডেকে কাছে বসিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করেছে। সব কথাই মুক্তা খুলেমেলে বলেছে—দেশে তার কে ছিল, কবে দেশ ছেড়ে এসেছে, আজ ক মাস শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে আছে এবং সেখানে এসে অবধি 'ডাইনী খুড়ি' তাকে কোন্ 'সব্বনাশের মুখে' ঠেলে দিতে চাইছিল আর কি করে বলাই তাকে রক্ষে করল এক এক করে মুক্তা বলল। কাকা খুড়ি খোঁজ করবে কিনা, খুঁজছে কিনা প্রভা প্রশ্ন করতে মুক্তা প্রবলবেগে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিয়েছে, না, খোঁজাখুঁজি

করবে না তারা। তাদের গলার কাঁটা ছিল সে। কাঁটা যখন নিজে থেকে সরে গেল আর তাদের 'খুঁজ লইবার দরকার অইব না—রেলগাড়ির তলায় গলা দিয়া মুক্তা জন্মের লাইগা খ্যাব অইয়া গেছে' ধরে নেবে তারা। সুতরাং—

তার পর? শুনে অতি দুঃখেও প্রভা হেসেছে।

'এখানে কি চিরকাল থাকবি—ঝি-চাকরানী হয়ে এভাবে চিরকাল থাকতে ভাল লাগবে তোর? পরের সংসারে?' প্রভা আদর করে ওর মাথায় হাত রেখেছে।

মুক্তা চুপ থেকে নখ খুঁটেছে। তার পর একসময় কর্তামার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হেসেছে। তার পর হঠাৎ আবার মুখ নামিয়ে বলেছে, 'বলাই যদি একখান চাকরিবাকরি পায়—'

'অ, তাই বল্।' বুদ্ধিমতী প্রভা চট্ করে মেয়েটার মনের কথা বুঝে নিয়েছে। তার পর খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করেছে বলাইয়ের সঙ্গে কবে থেকে পরিচয়, সেখানে সে কী করে, আর আছে কে ছেলেটার, আবার কবে আসছে মুক্তাকে দেখতে। খুশি খুশি চোখে মুক্তা প্রভার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে আর গলা পর্যন্ত লাল হয়ে বার বার ঘেমেছে। বলাই তার গায়ের এই লাল 'বেলাউজটা' কিনে দিয়েছে—আদুরে গলায় মুক্তা কর্তামাকে কথাটা জানিয়ে দিতে ভুলল না।

'ভাল ভাল, ঈশ্বর তোর মনের সাধ পূরণ করুক—বলাই একটা চাকরিটাকরি পেয়ে যাক।'

প্রভা শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করেছে, এমন সময় বাইরে শোনা গেছে কুমারেশের গলা। বাজার নিয়ে ফিরছে। 'মুক্তা মুক্তা'—ডাক শুনে মুক্তা এঘর থেকে উত্তর করেছে, 'যাইছি'—

ব্যস্ত হয়ে মেয়েটা বেরিয়ে যেতে প্রভা কড়িকাঠে চোখ তুলে কান খাড়া করে রেখেছে। যেন বাইরে ওরা কি কথা বলছে শোনার ইচ্ছা। হাসি হাসি মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

এদিকে মুক্তার চোখের হাসি ফাল্গুনের রৌদ্রের মত জ্বলছে।

বড় মাছ, টাটকা সব্জি মুক্তার হাতে তুলে দিয়ে কুমারেশ আর একটা জিনিস পকেট থেকে বার করে মুক্তার চোখের সামনে মেলে ধরেছে। অপরাজিতা ফুলের মত গাঢ় নীল রং জামাটার।

'ওর ব্লাউজ তোমার গায়ে কেমন আঁটো আঁটো হয়—মানায় না। এই নাও এটা কিনে আনলাম।' কুমারেশ হাসে।

যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায় মেয়েটা।

প্রভার পুরনো ব্লাউজ মুক্তার যৌবনপুষ্ট শরীরে ধরে না, তাই রাত না পোহাতে ওর জন্য কর্তাবাবু নতুন 'বেলাউজ' কিনে আনল।

লজ্জা, যেন লজ্জার চেয়েও বেশি আহ্লাদে মুক্তা কথা বলতে পারে না। কান গলা লাল হয়ে ওঠে।

'এইবেলা মাছটা কুটতে হয়—আমি দেখিয়ে দেব, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—ওর জন্য শুক্ত হবে কাঁচকলা দিয়ে—আমার আর তোমার তেলঝাল।' যেন তখনি মাছ কাটতে কুমারেশ তৈরী হয়। জামার আস্তিন গুটায়।

'আমি পারমু, আপনি জিরান।' বাঁ হাতের মুঠোয় নতুন ব্লাউজ মুক্তার। ডান হাতে মাছটা তুলে ধরে রান্নাঘরের দিকে ছোটে।

'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি পারবে না আমি বলছি নে তো—ভারি সুন্দর কাজকর্ম তোমার—আমি ওর শুক্তটা শুধু দেখিয়ে দেব—সেভাবে ছোট টুকরো হবে মাছের।' কুমারেশ মেয়েটার পিছনে পিছনে ছোটে।

কর্তামা 'তুই' বলছে—কর্তাবাবু যদি 'তুই' বলে তবে যেন ভাল শোনায়। ভাল কাপড় জামা পরতে দিক ভাল খেতে দিক—আসলে তো ও এ-বাড়ির চাকরানী, ঝি। মুক্তা চিন্তা করে। সুতরাং যতবার বাবু 'তুমি' বলছে, ওর আড়ষ্টতা লজ্জা যেন বেড়ে যায়। মুখ তুলে তাকাতেই পারে না।

'কেন, এতটা লজ্জা পাবার কি আছে—আমার সামনে অত লজ্জা করলে তো চ বে না।'

ঘাড় নিচু করে মুক্তা মাছের আঁষ ছাড়ায়, কুমারেশ পাশে দাঁড়িয়ে দেখে।

'তা ছাড়া আমি তো বুড়িয়ে গেছি। বুড়িয়ে গেছি মানে চল্লিশে পা দিয়েছি—তা হলেও তোমার তুলনায় বুড়ো। কাজেই—'

এবারও মুক্তা ঘাড় তুলছে না দেখে কুমারেশ বিরক্ত হয়। কি বললে লজ্জা ভাঙবে, কি করলে খুশি হবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ বলল, 'নতুন ব্লাউজটা গায়ে দিও আজ—'

ঘাড় না তুলে মুক্তা মাথা কাত করে। কুমারেশ আর এক পা অগ্রসর হয়। এবার মেয়েটার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'আহা-হা—অত বড় না, অত বড় না—শুক্তর জন্য আরো ছোট পিস হবে—মানে ছোট টুকরো।' এমন ব্যস্ত হয়ে কুমারেশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে যে তার গরম নিশ্বাসের ঝলক মুক্তার কাঁধে লাগে। যেন টের পায় মেয়েটা।

দমকা হাওয়া লাগা বেতডগার মত শরীরটা বেঁকিয়ে নিয়ে সরে বসে।

লক্ষ্য করে কুমারেশও তৎক্ষণাৎ স্প্রীং-এর মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা গরম নিশ্বাস ছাড়ে। আর বাঁধানো দাঁতে দাঁতে ঘষে বিড়বিড় করে, 'ভয়ানক শুচিবায়ু দেখছি— হাওয়াটি গায়ে লাগতে দেয় না, এঁ্যা।'

যেন রাগ করে চৌকাঠ ডিঙিয়ে কুমারেশ উঠোনে নেমে আসছিল। মুক্তা পিছন থেকে ডাকে : 'বাবু!'

থমকে দাঁড়ায় কুমারেশ। দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়ার মত গা জুড়ানো ডাক। 'কি?'

'কাইল শনিবার, কাইল কইলকাতা যাইচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, কেন?' একটু অবাক হল কুমারেশ। কিছু ফাইফরমাজ আছে নাকি। তা হলে বরফ গলতে শুরু হবার বাকি নেই। হেসে কুমারেশ বলল, 'কাল আমি কলকাতা যাচ্ছি। কিছু আনব তোমার জন্য? কি আনব বলো?'

হেসে মাথা নাড়ে মুক্তা। কথা বলে না। রক্তমাখা আঙুল দিয়ে মাছের থালায় দাগ কাটে।

'কি আনব বলো। একখানা সায়ার দরকার? ভাল একটাও সায়া নেই তোমার।' ট্যারা চোখ স্থির করে ধরে রেখে কুমারেশ মেয়েটার গালের রেখা, ভুরুর বাঁক পরীক্ষা করে। মুক্তা সরাসরি বাবুর চোখের দিকে তাকায়।

'বলাইয়ের সাথে কর্তাবাবুর দেখা অইব?'

'হ্যাঁ হবে—হতে পারে, কেন কিছু দরকার আছে?'

যেন প্রশ্নটা আচমকা কানে লাগে মুক্তার। সুতরাং উত্তরটাও আর এক জনের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে। টের পায় ও। টের পাবার বয়স হয়েছে। টের পেয়ে কাটা মাছের ওপর চোখ রেখে মুক্তা চুপ করে রইল। কথাটা যদি কর্তামার সঙ্গে হত ভাবনার ছিল না। বাবুর কাছে বলতে ওর ভয় করবে বৈকি।

'কি বলতে হবে বলাইকে বলো—দেখা হলে বলব।' কুমারেশ ঢোক গিলে উত্তরের অপেক্ষা করে।

মুখ না তুলে মুক্তা রক্তমাখা আঙুল দিয়ে থালায় ঘন ঘন দাগ কাটে। কি একটু ভাবে। তার পর : 'যদি সুবিধা পায় একদিন আইয়া বেড়াইয়া যাইতে পারে কিনা জিজ্ঞেস কইরা দেখবেন।'

'তা বলা যাবে, কেন বলব না।' অতিরিক্ত ঠাণ্ডা গলায় কুমারেশ উত্তর করে। তার পর আর সেখানে দাঁড়ায় না, নেমে আসে। যদি মুক্তা এখন

কুমারেশের চেহারা দেখত, দেখতে পেত সাপের জিহ্বার মত চিকণ একটা হাসি কুমারেশের দুই ঠোঁটের মাঝখানে উঁকি দিয়েছে। করমচা গাছের ছোট ছায়ায় মুঠ মুঠ ধান ছড়িয়ে দিয়ে কুমারেশ মুর্গির বাচ্চাগুলোকে আদর করে কাছে ডাকে। 'তাই বলো, বুকের মধ্যে একটুখানি ঘা করে দিয়ে হারামজাদা মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে—তাই না এমন চুপ করে থাকা, মুখ ঘুরিয়ে থাকা—হাত বাড়াবার লোক আছে যখন আমার দিকে আর হাত বাড়াবে কেন।' বুকের ভিতর বিছার কামড় অনুভব করে কুমারেশ। কেন না এখন তার মনে পড়েছে কাল বলাই যখন চলে যায় মেয়েটার চোখ বড় বেশি ছলছল করছিল। কে জানে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে কাঁদাকাটাও হয়েছে কিনা। যেন চোখ মুছতে মুছতে তখন বাড়ি ফিরছিল। ছবিটা মনে পড়তে কুমারেশ খপ্ করে একটা মুর্গির ছানা ধরে ফেলে। যেন রাগে তার হাতের শুকনো চামড়া ঠেলে দড়ির মত শিরাগুলো বেরিয়ে আসে। মুর্গির গলাটা জোরে টিপে ধরল কুমারেশ। ব্যথা পেয়ে পাখি পাখা ঝাপটায় পা নাড়ে কক্ কক্ শব্দ করে। কুমারেশ হাত থেকে ওটাকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। যেন মুর্গির বাচ্চা না বলাইর গলা টিপে ধরতে চাইছিল সে। 'পুরস্কার—বকশিশ! শালা ফাল দাঁতের কামড় বসিয়ে আমার হাতে তুলে দিলি। বটে! আমার সঙ্গে চালাকি। আমার নাম কুমারেশ দত্ত।'

কুমারেশ যখন করমচাতলায় বসে বৃশ্চিকদংশন জ্বালা অনুভব করছিল মুক্তা তখন কর্তামার শুক্ত চাপিয়ে দিয়ে বাবরি চুল মাথায় কাঁধে বাদাম, চানাচুরের থলে ঝোলানো বলাইকে দেখছে। শেয়ালদার রাস্তা ধরে হাঁটছে। শুক্ত চাপানো ঠিক হল কি না দেখিয়ে দিতে বাবুকে ডাকবার কথা ভুলে রইল ও।

সেই দুপুর থেকে কোকিলটা একটানা ডেকে চলছে। কুউ—কুউ। যেন ফাল্গুনের এক-একটা দিন যাচ্ছে আর বসন্ত মাতাল হয়ে উঠছে। এদিকে রৌদ্র গাঢ় হচ্ছে আর ওদিকে এক-একটা গাছ লতা আড়াআড়ি করে নতুন পাতা কুঁড়ি ফুল ও ফল দেখাতে পাগল হয়ে উঠছে।

হাঁ করে তাকিয়ে দেখে মুক্তা। শেয়ালদা স্টেশন থেকে হঠাৎ এখানে এসে বসন্তের অরণ্য দেখে কেমন যেন বোকা হয়ে যায় ও। বোবা হয়ে থাকে এক-এক সময়। পৃথিবী এত সুন্দর, সংসারটা এত রঙীন জানত না ও। এখন জানছে, এখন দেখছে। যত দেখছে যত জানছে, তত তার নিজের ওপর মায়া হচ্ছে।

তত তার সুন্দর হয়ে রঙীন হয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা হচ্ছে, লোভ জাগছে।

দুপুরে কাজকর্ম সেরে চুপটি করে নিজের ঘরে ঢুকে কুমারেশের দেওয়া নতুন ব্লাউজটা পরেছে ও। নীল টুকটুকে অপরাজিতা রঙ জামাটার। আরশি তুলে ও নিজেকে বার বার দেখল। দেখতে দেখতে হঠাৎ তার বুক ঠেলে একটা ছোট্ট নিশ্বাস বেরিয়ে এল। সত্যি তো, কাপড়টা ভাল ব্লাউজটা সুন্দর। কিন্তু সায়াটা ছেঁড়া, ভাল সায়া না হলে এই পোশাকের সঙ্গে মানায় না। মনে হতে মুক্তা আরশিটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রভা চুপ করে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে।

মুক্তা পা টিপে টিপে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে পরে আস্তে প্রশ্ন করে, 'বাবু কাজে চইলে গেছে মা?'

'হ্যাঁ, আয় বোস এখানটায়।' প্রভা আদর করে ডাকে। খাটের পাশ দেখিয়ে দেয় বসতে।

মুক্তা কর্তামার খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে। 'জামাখানা মানিয়েছে আমারে?' অল্প হেসে আঙুল দিয়ে গায়ের ব্লাউজ দেখায় ও কর্তামাকে।

প্রভা ঠোঁট টিপে হাসে। 'এটাও বলাই দিয়েছে?'

মুক্তা মাথা নাড়ে। 'অত প'সা আছে নাকি লোকটার—হেই লালটা তো দিল। আর এউকগা না।'

'তবে এটা কে দিল?' একটু অবাক হয় প্রভা। চুপ করে থাকে।

'বাবু।' চোখে খুশি নিয়ে মেয়েটা কর্তামাকে দেখে। 'আইজ বাজার থন নিয়্যা আইল—আমার এমন সরম লাগল।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা হাসত, কিন্তু পারল না—হঠাৎ যেন কর্তামা মুখ কালো করে ফেলল। মুক্তা মুখ নিচু করল।

একটু সময় কাটে। পরে প্রভা ওর পিঠে হাত রাখল।

'যাক ভালই হয়েছে—সুন্দর হয়েছে।' আস্তে আস্তে প্রভার মুখের রং ফিরে এল। 'ব্লাউজ তো একটাই ছিল তোর, এখন দুটো হল।'

মুক্তা এবার মুখ তুলতে পারল। আবার ওর সাহস ফিরে এসেছে। আবার হাসে। 'কাইল বাবু কইলকাতা যাচ্ছে।'

'বলল তোকে?'

মুক্তা মাথা নাড়ল। তাকাল এদিক-ওদিক। ভাল করে একবার কর্তামার চোখ দুটো পরীক্ষা করল, তার পর নুয়ে প্রভার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস

করে বলল, 'আমি কইয়া দিছি বলাইয়ের সাথে দেখা অইলে সুবিধামতন একবার বেড়াইয়া যাইতে কন যেন বাবু, হি-হি।'

হাসির ধমকে মেয়েটির চোখের পাতা দুটো কাঁপে। 'এমন সরম লাগছিল কইবার কালে তবু না কইয়া পারলাম না।'

'আর কি বললি ?' প্রভা প্রশ্ন করে।

মুক্তা মাথা নাড়ে। চোখ সরিয়ে নেয়। হাসে। যেন বলাইকে আসতে বলতে পারার খুশির ধমক সামলে উঠতে দেরি হয়। তার পর একসময় কর্তামার চোপের দিকে তাকায়। এবার মিটিমিটি হাসি মেয়েটার চোখে।

'বাবু কইল তোর লাইগ্যা একখান সায়া আইনে দেব।'

'বললি তুই এনে দিতে ?' প্রভা চোখ সরায় না। 'কি বললি ?'

নখ দিয়ে মুক্তা বিছানার চাদর খোঁটে। আস্তে আস্তে বলে, 'আমার সরম লাগে—সরম লাগছিল তখন বাবুকে কইতে। চুপ কইরা রইলাম।'

প্রভা কথা বলে না। মুখ কালো হয় না এবার, কিন্তু চোখ দুটো ওপরের দিকে মেলে ধরা।

'কমু মা ?' প্রভার হাতের ওপর নরম হাতখানা রাখে মুক্তা। 'কয়েন খারাপ দেখাইব সায়ার কথা ? আমার এউকগা নাই।'

'বলে দিস। তোর নেই যখন একখানাও, সায়ার দরকার বৈকি।' নিস্পৃহ গলায় প্রভা উত্তর করে। মুক্তা চুপ থেকে আবার কি ভাবে।

'মা!'

'কি ?' প্রভা মেয়েটার মুখ দেখে। 'কেন ?'

'হরির কিরপায় বলাই যদি একখান চাকরি পাইয়া যায় আর হেই মাসেই কামড়া সাইরা ফেলবার রাজী থাকে তো—'

মুক্তা থামল। কান দুটো লাল হয়ে গেছে। কিন্তু চোখে মিটিমিটি হাসি। প্রভা এবার বড় করে হাসে। 'বল্ না, চুপ করে গেলি কেন ?'

'তবে কি বাবু কিছু টেকাপইসা দিয়া কামডা সারাইয়া দিব ?'

'কি, তোদের বিয়ে ?' প্রভা অবাক হয় না। মুগ্ধ চোখে সরল মেয়েটাকে দেখে। বাইরে কোকিলটা আবার জোরে ডাকছে। আমের মুকুলের মিষ্টি গন্ধটা এক-এক ঝলক বাতাসে ভর করে মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর এসে ঢুকছে।

'বলাই একটা কাজকর্ম তো যোগাড় করুক—তখন দেখা যাবে।'

যেন কর্তামার এইটুকু আশ্বাস পেয়েই মুক্তা নিশ্চিন্ত হয়। চোখ দুটো বড়

করে দেওয়ালের একটা ছবি দেখে। প্রভা ডাকল, 'মুক্তা!'

'কি মা?'

কর্তামার মুখ আবার থমথম করছে। 'বাবু তোর সঙ্গে খুব বেশি কথা বলে?'

অতর্কিত প্রশ্ন। কেমন একটু চমকে উঠল মেয়েটা। ঢোক গিলল। চোখ দুটো মাটির দিকে নামিয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঐ রান্নাবান্নার কথা, মুর্গিরে খাওয়ানোর কথা—আর—' যেন আর কি বলে কুমারেশ মনে করতে চেষ্টা করে মেয়েটা। 'আর হেই মুর্গির ঘরে বড় হাঁসিনী ডিম পাড়ছে—ডিমে বইসা তাও দেয়; তখন কর্তা কইলেন দরজাখান বন্ধ রাখতে, কুত্তাডা ঘরের মাইঝে ঢুকবার চায়, হাঁসিনী ভয় পাইয়া তাও ছাইড়া দিলে ডিম পইচা নষ্ট অইব।' কথা শেষ করে মুক্তা ফিক করে হাসল। কিন্তু প্রভা হাসে না। তেমনি থমথমে চেহারা।

'আমি বারণ করে দিচ্ছি—বাবুর সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলবি নে।'

'না কমু না—' যেন এই প্রথম ভয় পায় মেয়েটা। চোখে শঙ্কার মেঘ জাগে—'আমি যখন সমথ মাইয়া, বাবুব সঙ্গে বেশি—' মুক্তার কথা আটকে গেল। প্রভা চমকে ঘাড় ফেরাল। দরজায় দাঁড়িয়ে কুমারেশ। হাসছে।

'চুপ করে থাকলে চাকর-চাকরানীকে দিয়ে কাজ করানো যায়? আমি কথা বলব না, আমি রান্নাঘরে যাব না। তুমি পারবে ওকে দিয়ে সব কাজ করাতে—বিছানায় শুয়ে থেকে? তুমি যদি হাঁটাচলা করতে পারতে তো আর—কথা বলো।'

প্রভা চুপ করে কড়িকাঠ গোনে।

কুমারেশ আড়চোখে মুক্তাকে দেখে। ঘাড় নিচু করে বসে আছে মেয়েটা। কুমারেশ পরে স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'কি বলো, উত্তর দাও কথার?'

প্রভা নীরব। কুমারেশ শব্দ করে শুধু হাসল। পায়চারি করল একটু সময়। এখন এখানে কর্তামার খাটের পাশে এভাবে বসে থাকা ঠিক না। চিন্তা করে মুক্তা উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কান পাশের ঘরে।

'তুমি ব্যারামে ভুগছ, বিছানায় পড়ে আছ—তোমার সুবিধের জন্যে না ঝি রাখা।' কর্তাবাবুর গলা।

কর্তামা চুপ।

'আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা চিরকাল খারাপ—আমি বাইরে থাকলে, কলকাতায় থাকলে তোমার মনে শান্তি নেই। বাড়িতে থাকলেও তোমার মনে অশান্তি—হা-হা—আমি কোন্ পথে চলি বলতে পারো?' হাসিটা ক্রমশঃ উঁচু পর্দায় উঠছে বাবুর। যেন ঠাট্টা করার মত হাসি, কাউকে টিট্‌কারি দেওয়ার মত হাসি। আর সেই হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতে মুক্তা শুনতে পেল কর্তামার কান্নার স্বর। 'আমায় ক্ষমা করো ক্ষমা করো—এমনভাবে আমার সামনে হেসো না, তোমার প্রাণ যা চাইছে করে যাও আমি কিছু বলব না। আমাকে এই বিছানায় শুয়ে চুপ করে মরতে দাও।'

মুক্তার কপাল ঘামছিল। পা দুটো কাঁপছিল। যেন সে কি বুঝতে পারল, কি বুঝল না। অশান্ত মন নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল।

আর সেদিন বিকালে বড় অস্থির হয়ে কুমারেশকে বন্দুক হাতে নদীর ধার ধরে জঙ্গলের দিকে ছুটতে দেখা গেল। পথে একটা শিয়াল মারল, দুটো কাঠ-বিড়াল মারল। এক সময় একটা গাছের নিচে বসে পকেট থেকে শিশি বার করে একসঙ্গে অনেকটা মদ গলায় ঢালল। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গাছে গাছে পাখিরা ডাকছে। বনের গন্ধ, পাখির ডাক, সূর্যাস্তের ঝিকিমিকি, আলো আর মদের নেশা কুমারেশের মনে এক অদ্ভুত রোমান্স সৃষ্টি করেছে। কুমারেশ চিন্তা করছে বাংলোটা ভেঙ্গে দিয়ে এখানে খড়কুটো পাতা বাঁশ দিয়ে একটা ছোট্ট কুঁড়ে তৈরি করলে কেমন হয়। কেউ না। সে আর রিফুইজি মেয়েটা। কিন্তু প্রভাকে কি করা? যদি সে এখানে আসতে চায়? শিয়ালের মতন কাঠবিড়ালের মতন গুলি করে খতম করে দেবে? তা না হয় করা গেল, কিন্তু মেয়েটা যে—

সুখকর রোমান্সটা আস্তে আস্তে একটা যন্ত্রণায় পরিণত হয়। ঘাসের ওপর বন্দুকটা রেখে কুমারেশ সিগারেট ধরায়। চিন্তা করে। বস্তুত এত সব কাণ্ড করার পরও যে সে মেয়েটাকে দিয়ে সুবিধে করতে পারবে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। চিরকাল কুমারেশ এমন সব মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে যারা আগে থাকতে হাত বাড়িয়ে তৈরী থাকে—তাদের চোখে লজ্জা নেই ভয় নেই—কেবল হাসি। হাসির নিমন্ত্রণ নিয়ে ওরা পুরুষের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অপেক্ষা করে। কিন্তু এ আলাদা জাতের মেয়ে। তার ওপর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দুটো কাঁটা। বলাই আর প্রভা। কুমারেশ অস্থির হয়ে জোরে জোরে সিগারেট টানে। সিগারেট টানতে টানতে মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়। না, নিমন্ত্রণ এখানেও পাবে। দুটো কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলে রিফুউজি মেয়েটা

হাত বাড়াবে, তার আগে নয়। চিন্তা করে কুমারেশের চোখমুখ প্রফুল্ল হয়। তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে উঠে দাঁড়ায়। জোরে জোরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা অশথ গাছের তলায় এসে সে থমকে দাঁড়ায়। একটা না এক ঝাঁক হরিয়াল। হরিয়াল শিকার করতে না সে এতটা পথ ছুটে এল। কুমারেশ ত্রস্ত হাতে বন্দুকে টোটা ভরে নেয়।

॥ আট ॥

এত বড় চাঁদ উঠেছে আকাশে। আতাফুল আর আমের বোলের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে গেছে। একটু রাত হতে জোরে হাওয়া বইছিল। কুমারেশের বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে এতক্ষণ একটানা ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছিল। জোরে হাওয়া বইতে সে ডাক বন্ধ হয়েছে। গাছের পাতার সরসর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও এখন। না, শব্দ হচ্ছে কুমারেশের রান্নাঘরে। পাখির মাংস সিদ্ধ হচ্ছে পিতলের ডেকচিতে। টগবগ শব্দ হচ্ছে।

গালে হাত রেখে মুক্তা উনুনের আগুন দেখছে।

চান করে চুলটুল পাট করে মুখে স্নো পাউডার মেখে কুমারেশ রান্নাঘরে ঢুকল। পরনে সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে নেটের গেঞ্জি।

কুমারেশ এখন ভাল করে তাকিয়ে দেখল মেয়েটার গায়ে সেই নীল ব্লাউজটা নেই। লাল ব্লাউজ। দেখে তার মেজাজ আবার খারাপ হয়ে উঠতে লাগল।

মুক্তার পেছনে এসে দাঁড়ায় সে। 'দেখি চামচটা দেখি।' ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে কুমারেশ এমনভাবে হাত বাড়ায় যে হাতটা ওর কানে ঠেকে।

নড়েচড়ে বসে মুক্তা। যেন অস্বস্তি বোধ করে।

'ঢাকনাটা সরাও।' কুমারেশ কঠিন স্বরে আদেশ করে।

ভয় পায় মেয়েটা। আর সরে বসতে চেষ্টা না করে ডেকচির ঢাকনাটা নামিয়ে দেয়। কুমারেশ চামচ ডুবিয়ে মাংসের টুকরো তুলে আনে। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ নেয়: 'আ—ফাইন—দুনিয়ায় এর চেয়ে ভাল মাংস আর আছে কি না আমার জানা নেই। মানুষ কেবল হরিয়াল মেরে মেরে খায় না কেন ভাবি।'

মুক্তা নীরব।

কুমারেশ হাত থেকে চামচটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। 'এই শোন—'

ভয়ে ভয়ে মুক্তা মুখ তুলল। কুমারেশ ঠোঁট টিপে হাসল।

'বেশ তো সাজগোজ করা হয়েছে। বেণী বাঁধা হয়েছে, চোখে কাজল, কপালে টিপ—দেখি দেখি পা-খানা—আলতা পরলে না কেন? এমন সুন্দর পায়ে আলতা না পড়লে মানায়!'

লজ্জা না, ভয়ও না—লজ্জা ও ভয়ের মাঝামাঝি একট অবস্থা। এমন ভাবে মেয়েটা কুমারেশের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। হরিণীর দৃষ্টির মত টলমলে চাউনি।

'আলতা এনে দেব—কাল তো আমি কলকাতা যাচ্ছি। একনম্বর আলতা এনে দেব।' কুমারেশ হাসে।

মুক্তা চোখ নামায়।

'কথা বলছ না কেন একটাও!' আর দ্বিধা না করে কুমারেশ মুক্তার একটা হাত চেপে ধরল।

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে পারত মুক্তা, চেঁচাতে পারত, রাগ করতে পারত, ঠেলা দিয়ে কুমারেশকে সরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সব কিছুই করল না ও। খুড়ির ভাই না, শেয়ালদা স্টেশন না এটা। অন্য পরিবেশ, অন্য মানুষ। মাথা ঠিক রেখে না চললে এখানে বিপদ অনেক বেশি। চিন্তা করে মুক্তা কুমারেশের চোখে চোখ রেখে হাসল: 'কথাবার্তা কম কইতাছি কর্তামার মুখের পানে চাইয়া—বাবুর সঙ্গে বেশি কথা কইলে তেনার মনে কষ্ট হয়।'

হাত ছেড়ে দেয় কুমারেশ। গলার কেমন একটা শব্দ করে হাসল: 'কর্তামাকে কি আমি অসুখে রাখছি?'

দাঁতে জিভ কাটে মুক্তা। 'না-না, ছি, মিছা কথা কমু কেনে। অষুধপথ্যি এইডা হেইডা যখন যা লাগে বাবু আইনা দেন। আমি তো দেখি। সুখে রাখতে বাবুর চেষ্টার কমতি নেই।'

শুনে খুশি হয় কুমারেশ। 'আর এই মানুষটা বিছানায় শুয়ে থেকে আমায় জ্বালাচ্ছে—আজ আট বছর এইভাবে শোয়া।'

মুক্তা এবার উঠে দাঁড়ায়। 'আর একটু সিদ্ধ অইবে মাংস?'

'তা হোক, তা হতে দাও।' কুমারেশ বলল। 'আমি যে কত বড় অসুখী মানুষ বাইরে থেকে লোকে তা বোঝে না!'

যেন কি বুঝল মুক্তা, কি বুঝল না। আস্তে আস্তে চৌকাঠের কাছে সরে আসে।

'আমি বুঝাইয়া দিমু গিন্নীমারে—ঝি-চাকরানীর লগে কথা কওন খারাপ না, সব ঝি-চাকরানী এক না, সব ঝি-চাকরানী খারাপ না।' বলতে বলতে মুক্তা রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়।

'তাই।' মুখ লুকিয়ে দুষ্টু হাসি গোপন করে কুমারেশ মেয়েটার পিছে পিছে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। 'বুদ্ধি করে তুমি কথাটা বুঝিয়ে দিও কর্তামাকে।'

'আমারে আপনি তুই কইয়া কইবেন—আমি যখন চাকরানী, দাসী।'

'দাসীও মানুষ, চাকরানীও মানুষ—তা বেশ তো, যদি তোমার ভাল লাগে তাই না হয় বলা যাবে।'

'কাইল কইলকাতা যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ—আলতা আনব আর কি আনব? হ্যাঁ, সায়া নেই, ভাল একখানা সায়া আনব, কেমন?'

ঘাড় কাত করে মুক্তা। করমচা পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি কাটা জ্যোৎস্না এসে ঘরের পৈঠায় স্বপ্নজাল তৈরী করেছে। মেয়েটার চোখে গালে বুকে পেটে জ্যোৎস্না ও ছায়ার নাচানাচি শুরু হয়েছে। দেখে কুমারেশের বুকের রক্ত আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। যেন আবার হাত বাড়াতে চাইছে সে।

মিষ্টি সুরে হাসল মেয়েটা।

'দুখিনী মাইয়া আমি, শিয়ালদা ইস্টিশানে পইড়া আছলাম। আপনাগো দরজায় আইছি দুইডা অন্নের আশায়। সুখে রাখলেও রাখবেন, দুঃখে রাখলেও রাখবেন—আমার কিছু কওনের নাই। সাধ হয় আলতা দিবেন, সায়া-শাড়ি দিবেন, আমি কি কমু।'

'তাই বলো তাই বলো'—বড় আস্তে আস্তে গলছে, ধীরে ধীরে গলছে, কুমারেশ খুশি হয়। আর হাত বাড়ায় না। আর একটু সময় নেবে। আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। এখনই—

'আর যদি বলাইয়ের সাথে দেখা অয় কইবেন একবার আইতে।' মুক্তা আব্দারের সুরে বলল।

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' এবার একটু বেশি জোর দিয়ে কথা বলে কুমারেশ। 'কলকাতায় পা দিয়ে সকলের আগে ওর সঙ্গেই তো দেখা করতে হবে।'

শুনে মনটা হালকা হয় মুক্তার। যেন অনেকটা সহজ হতে পারে ও। একটু হাসল। 'আর আমাগো আইতে রাস্তায় কিছু বেশি খরচপত্র অইছে— গরীব মানুষ। দুই-চারডা টেকা দিলে লোকটার উপকার অয়।'

'দেব, কেন দেব না।' কুমারেশ বলল আর মনে মনে ভাবল কত বড় শয়তানের পাল্লায় পড়েছে সে। ওদিকে নিজেদের মধ্যে সব ঠিকঠাক। আগাম দশ টাকা, ট্যাক্সি ভাড়ার দশ টাকা, তার ওপর বখশিশ দাও, এখন পথ-খরচের জন্য আর একজনের বাড়তি সুপারিশ। আচ্ছা, কত ধানে কত চাল হয় আমিও দেখে নেব।

'মাংসটা সেদ্ধ হল কিনা এইবেলা গিয়ে দেখ।'

'যাইচ্ছি যাইচ্ছি।' ব্যস্ত হয়ে মুক্তা ফের রান্নাঘরে ঢোকে। কুমারেশ ঢোকে না। দাঁড়িয়ে চিকরি কাটা জ্যোৎস্নার নাচানাচি দেখে।

'কথাখান কওন ভাল অইছে—বলাইরে দুই-চারডা টেকা দিবেন।' রাত্রে দরজার খিল এঁটে বিছানায় বসে মুক্তা ভাবল। 'কথাখানে টের পাউক কর্তা আমি বেওয়ারিশ মাল না—আমার মানুষ আছে, আমি পতিত জমিন না যে হাত বাড়াইলে—' চিন্তা করে মুক্তা দু হাত জোড় করে ওপরের দিকে চোখটা তুলে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বিপদে মধুসূদন আমারে রইক্ষে করবা—তুমি ছাড়া এখন আমার কেডা আছে। তুমারে ডাকতে ডাকতে শিয়ালদার বিপদ কাডাইছি—তুমারে ডাকতে ডাকতে আমার এইহানের বিপদ কাডবে। খবর পাইলে বলাই ছুইটা আইব—আইলে ওরে বেবাক কথা কমু। চুল পাইকা গেছে, পাথরের দাঁত দিয়া ভাত চিবাইয়া খায়—আর সেই লোকের কিনা—'

মধুসূদনকে ডাকতে ডাকতে মুক্তা মাঝে মাঝে কান খাড়া করে রাখল। কোন শব্দ শুনছে না আর। মধুসূদন আছে। খুশি হয়ে মুক্তা ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এল না চোখে। কর্তাবাবুর বুড়া বয়সে এমন মতিগতি হয় কেন তা-ও চিন্তা করতে লাগল মুক্তা। 'না, কেবল হাতে ধরছে আর কিছু তো করে নাই, আর কিছু বলে নাই। কেবল আমারে এইডা হেইডা দিতে চাইছে। এইডা সত্য কথা বেরামী বৌ লইয়া পুরুষটার মনে সুখ নাই। এখন আমারে যদি একটু আদরলগিত করে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তুক যদি—' আবার দুশ্চিন্তা হয় মুক্তার—আবার মধুসূদনকে মনে মনে ডাকে। 'ওয় গিন্নিমার একটু চক্ষু টাভায় আমারে বেলাউজ আইনা দেয়, শাড়ি দেয় দেইখা—

অখন আমি সব লমু—কেন লমু না—যদি দেখি কর্তা একটা কু-পরস্তাব করাছ আমার কাছে, হাতে না ধইরা শরীলে হাত বাড়াইছে, তখন শাড়ি বেলাউজ ছিঁড়্যা কুচি কুচি কইর‍্যা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া হাঁটাপথ ধইরা কইলকাতা রওনা হমু—অখন যত দেউক কর্তা না করমু না—আদায় কইরা যামু।' অন্ধকারে মুক্তার চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে। 'বলাইয়ের সাথে বদি বিয়াডা ঠিক অয়, আমার কাপড়জামার দরকার, টেকাপইসার দরকার, কাজেই গিন্নিমা মুখ ভার কইরা থাকলে আমি শুনুম নাকি। আমার অখন আদায় করবার সময়। তুমার পুরুষ যদি একটা বাচ্চা মাইয়ারে দেইখ্যা এইডা হেইডা দেয় তো আমার দোষ কি।' ঠোঁট টিপে একটু হাসল মুক্তা। 'হায়রে মাইয়া মানুষ দেখলে জোয়ান বুড়া সব একরকম অইয়া যায়। কর্তামা তুমি সকাল সকাল ভাল অইয়া উড—উইঠা বুড়ার মন রাখ, বুড়ারে খুশি কর—খুশি করতে না পারলে চাকরানীরে আদর কইরা বুড়া মনের আইস মিডাইবে।' যেন পাশের ঘরের প্রভাব সঙ্গে মুক্তা কথা বলছিল। 'আমি? আমারে ফাঁদে ফেলাইতে পারব না—আমি ঠিক থাকমু, আমি ঠিক আছি—আমার বলাই আছে, আমার মধুসূদন আছে।' বলতে বলতে টুপ করে মেয়েটা একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে কর্তাবাবুকে কলকাতা রওনা হয়ে যেতে দেখে মুক্তা নিশ্চিন্ত হল। যাবার সময় দুটো টাকা মুক্তার হাতে গুঁজে দিতে মুক্তা সেটা ব্লাউজের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। 'হাত খরচের জন্য তোকে দিলাম।' কর্তাবাবু কথাটা বলতে মুক্তা খুশি হয়ে মাথা কাত করেছে এবং পরক্ষণে মাথা সোজা করে বলেছে: 'বলাইরে পাঁচখান টেকা দিলে উপকার অয়—গরীব মানুষ।'

'হবে হবে—পাঁচটা কেন দশটা টাকা দেব ওকে।' বলে কুমারেশ রিক্সায় চেপেছে।

রিক্সা চলে যেতে মুক্তা গোলাপ বাগান পাশে রেখে বাড়িতে এসে ঢুকেছে, তার পর নিজের ঘরে গেছে। একটা হাঁড়ির মধ্যে লাল নোটটা লুকিয়ে রেখে মনে মনে বলেছে: 'আমার বিয়ার খরচের পেরথম টেকা। এই দুইখান টেকা দিয়া বলাই আমারে আশীব্বাদ করব। গরীব মানুষ এইয়ার বেশি দিয়া আশীব্বাদ করতে পারবে কেনে। এই টেকার একটা প'সা অখন আমি ভাঙ্গুম না। মধুসূদন মধুসূদন, বলাইরে সকাল সকাল একখান কাম কাইজ জুডাইয়া দেও।'

দুপুরে কর্তামার খাটের পাশে বসে মুক্তা অনেক গল্প করল। আদর করে কর্তামার চুলের জট ভেঙে চুল আঁচড়ে দিল। তার পর আস্তে আস্তে বলাইয়ের কথা তুলল। 'কর্তাবাবু খবর দিলে বলাই না আইস্যা পারব না। আমার পরাণডা যেমন হেইখানে পইড়্যা আছে ওর পরাণও কাঁদবে—কাঁদবে না মা ?'

প্রভা চুপ থেকে ঘাড় কাত করেছে।

ফাল্গুনের জলন্ত দুপুরে কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে মুক্তা যখন বলাই চরণের স্বপ্ন দেখছিল, কুমারেশ দত্ত তখন বৌবাজার মুচিপাড়া থানায় বসে বন্ধু পরেশ মুখুয্যের কানে কানে ফিসফিস করে কি বলছিল। পরেশ মুখুয্যে তার নোট বইয়ে বলাই, বলাইয়ের বন্ধুর নাম, তাদের বৈঠকখানা বাজারের চোলাই মদের আড্ডার ঠিকানা টুকে নিয়ে বলল, 'আমি এখনি ভ্যান নিয়ে যাচ্ছি—শালাদের নাকে দড়ি পরিয়ে থানায় টেনে আনব। চোলাইওয়ালাদের যন্ত্রণায় আর পারা গেল না।' খুশি হয়ে কুমারেশ দত্ত থানা থেকে বেরিয়ে এল। চোর গুণ্ডা বদমায়েস নিয়ে কুমারেশের যেমন কারবার তেমনি দরকার মত চোর গুণ্ডা বদমায়েসদের ধরিয়ে দিতে পুলিস দারোগা ইন্‌সপেক্টর স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোকেদের সঙ্গে সে সর্বদা বন্ধুত্ব রেখে চলে।

'নাও শালা, মেয়ে পাচার করে এইবেলা বখশিশ আদায় কর। আমার নাম কুমারেশ দত্ত। ছ মাস ন মাস তো আগে শ্রীঘর খেটে এসো—তার পর দেখা যাবে—' কুমারেশের ট্যারা চোখটা উল্লাসে নাচতে থাকে।

নেবুতলার গণেশ সাধুর হোটেলে ফিরে কুমারেশ নিজের মনে হাসল। দেশী চোলাই না, বিলিতি মদের বোতল নিয়ে বসল আর গেলাসে চুমুক দিয়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল রিফুইজি মেয়েটাকে। তার উঠোনে করমচা তলায় বসে মুর্গি ছুলছে। কুমারেশ রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরবে বলে এসেছে। 'বাড়ি ফিরে তোর হাতের রান্না মাংস খাব—তোর জন্য আলতা সাবান স্নো পাউডার সায়া শাড়ি আনব।'

॥ নয় ॥

মুক্তা চমকে উঠল। ভয় পেল। তার পায়ের নিচে মাটি সরে যায়। কুমারেশ গম্ভীর। মুক্তার তক্তপোশের ওপর স্নো পাউডার আলতার শিশি সায়া ব্লাউজ ছড়ানো। সেগুলোর দিকে আর তাকাচ্ছে না ও।

কুমারেশ বলল, 'ছমাস নমাস জেল হতে পারে।'

এবার মুক্তা কাঁদতে আরম্ভ করল।

কুমারেশ বলল, 'দুর্বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি না হলে কি ব্যাটা চোলাই মদের কারবারে ভিড়ত—আমি তো জানি লোহালক্কড়ের কারবার করছে। দেখা করতে গিয়ে শুনলাম, না অন্যরকম—কাল নাকি পুলিস বেঁধে নিয়ে গেছে।'

'ছুটাইয়া আনা যায় না—বলাইরে পুলিসের হাত থাইক্যা ছুটাইয়া আনবার কেউ নাই গো কর্তাবাবু?'

'দেখি চেষ্টা করব।' কুমারেশ ঘাড় ফিরিয়ে তক্তপোশের ওপর ছড়ানো জিনিসগুলির দিকে তাকায়। 'তোমার পছন্দ হয়েছে সব?'

চোখ মুছতে মুছতে মুক্তা মাথা নাড়ে।

ঘাড় নাড়া দেখে কুমারেশ খুশি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। 'ছাড়িয়ে আনব, ছাড়িয়ে আনতে না এত কারসাজী করা গেল।' মনে মনে হেসে কুমারেশ প্রভার ঘরে ঢুকল। আর চিন্তা করল: 'একটা কাঁটা গেছে, এখন আর একটা কাঁটা বাকি।'

'তুমি ঘুমোচ্ছ?'

'না তো।' প্রভা ঘাড় ফেরায়।

'তুমি কাঁদছ কেন?'

প্রভা দু হাতে মুখ ঢাকে। কুমারেশ খাটের পাশে বসে। হাসে।

'তোমার কান্নার মানে আমি বুঝি।'

প্রভা নিরুত্তর।

কুমারেশ বলল, 'গরীব দুঃখীর মেয়ে—তার ওপর মনের মানুষটা গেছে জেলে—মন খারাপ, তাই দু-চার টাকার জিনিস কিনে আনলাম।'

উত্তর নেই। কুমারেশ আবার বলে, 'তা তোমার জন্যেও তো অনেক কিছু এনেছি—একবার তো তাকিয়েও দেখলে না।'

সত্যি কুমারেশ বাড়ি ফিরে আগে প্রভার ফলমূল মাখন ভিটামিন হরলিকস বিস্কুটের টিনগুলো এঘরে রেখে পরে গেছে মুক্তার ঘরে।

'এই শোন।' কুমারেশ ডাকে।

প্রভা চোখ থেকে হাত সরায়। এবার গম্ভীর চেহারা কুমারেশের।

'এবার কলকাতা গিছলাম আমি তোমার জন্য।'

'আমার জন্য!' অবিশ্বাসের সূক্ষ্ম হাসি প্রভার ঠোঁটের কিনারে উঁকি দেয়।

'কেন, আমি কি তোমার জন্য যেতে পারিনে, আমি কি তোমার জন্য কিছু করছি নে?'

যেন বিয়ের পর তাদের দীর্ঘ দশ বছরের জীবনে এই প্রথম কুমারেশকে সত্যিকারের দুঃখ করতে শোনা গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শোনা গেল। 'আমার ছেলে নেই মেয়ে নেই ভাই নেই বন্ধু নেই—যদি কেউ থাকে তবে তুমি—অথচ তুমি মনে কর তোমাকে আমি ভালবাসি নে। এটা যে কত বড় ভুল ধারণা তোমার—'

প্রভা নীরব থেকে কড়িকাঠ গোনে।

একটু চুপ থেকে কুমারেশ আরম্ভ করে: 'শোন, কলকাতার একজন বড় স্পেশ্যালিস্টের সঙ্গে আমি দেখা করে তোমার অসুখের সব ব্যাপার বলেছি।'

'কি বলল স্পেশ্যালিস্ট?' প্রভা চোখ নামিয়ে কুমারেশের মুখ দেখে।

'ওষুধ পথ্য লিখে দিয়েছে। কিন্তু সেসবই তো সব না—বলল, কটা দিন যদি নদীটদিতে গিয়ে থাকতে পারেন ভাল। জলের হাওয়াটা গায়ে লাগলে শরীরটা সকাল সকাল সেরে উঠবে।'

'আমরা তো গঙ্গার ধারেই আছি—' প্রভা আস্তে আস্তে বলল।

কুমারেশ মাথা নাড়ল। 'গঙ্গার ধারে থাকা আর বোট নিয়ে কিছুদিন গঙ্গার ওপর কাটানো কি এক হল!'

চুপ করে রইল প্রভা। কুমারেশ স্ত্রীর একটা হাত ধরল।

'আমাদের তেমন কোন অসুবিধাও নেই—কারখানার বোট আছে। তুমি তো দেখেছই। কত বড়, কেমন চমৎকার লাল রঙের বোট আমাদের। ভেবেছি কিছুকাল আমরা—এক হপ্তা দু হপ্তা—দরকার হলে একটা মাস নদীতে কাটাব—'

প্রভা খুশি হল কি? একটানা এতকাল একটা ঘরের বিছানায় শুয়ে বসে কেটেছে—এখন প্রকাণ্ড আকাশের নিচে উন্মুক্ত গঙ্গার বুকে—

'বলো? আমি ব্যবস্থা করি?'

স্বামীর হাত থেকে হাত তুলে নিল প্রভা।

'যা ভাল বোঝ করবে।' বলে ও মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবে। আর কিছু বলে না কুমারেশ। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এক দিন কাটে, দু দিন কাটে। বলাই আসে না। পথের দিকে চেয়ে থাকে মুক্তা। এক এক সময় কান্নায় ওর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ মুছে আবার তেঁতুলতলার আঁকাবাঁকা রাস্তাটা দেখে। কুমারেশ সান্ত্বনা দেয়ঃ 'দু-এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। আমি ট্রাঙ্ক টেলিফোন করে দিয়েছি। যে-সে লোক না। মন্ত্রীর ভাই। আমার বন্ধু। বলে দিয়েছি, রিফুইজী মানুষ—অভাবে পড়ে চোলাই টোলাই বেচতে গিয়ে ধরা পড়েছে—ভবিষ্যতে আর এসব বে-আইনী কাজ করবে না, যেন ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করে।' মিথ্যা কথা সাজিয়ে বলার জুড়ি নেই কুমারেশের। কথা শুনে মুক্তা চুপ থাকে। একটু শান্ত হয়। কুমারেশ বলে, 'আমি নিজে যেতে পারছিনে এদিকে আটকে গেছি বলে। তোর কর্তামাকে নিয়ে কিছু দিন নদীতে বেড়াতে হবে। তার ব্যবস্থা করছি।' কথাটা সত্য। দুদিন ধরে কুমারেশ খুব ব্যস্ত। কারখানার বোট এখন পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া অত বড় নৌকা সুবিধা হবে না। চিন্তা করে কুমারেশ অন্য লোকের নৌকা ভাড়া করার চেষ্টা করছে। উঁচু লম্বা মিশমিশে কালো রং লোকটার। কাল থেকে কুমারেশের সঙ্গে পরামর্শ করছে। বাংলোর ওধারে একটা কাঁটাল গাছের ছায়ায় বসে দুজন কথা বলে। শিয়রের জানলা দিয়ে একবার দুবার উঁকি দিয়ে প্রভা লোকটাকে দেখেছে।

'কেমন ডাকাত ডাকাত চেহারা—চোখ দুটো লাল। এর নাম লক্ষ্মণ মাঝি? এর নৌকা?'

প্রভার প্রশ্ন কুমারেশকে বিচলিত করে না। হাসে। 'দেখতেই ডাকাত। ভেতরটা সোনা। লক্ষ্মণের মত লোক হয় নাকি? আমার কপাল ভাল ওকে পেয়ে গেছি। এমন বিশ্বাসী লোক আমি পাব না।'

প্রভা আর কিছু বলে না।

কুমারেশ বলে, 'তাছাড়া কারখানার মাঝিদের গুমর বেশি। কারবারে আমার চার আনা অংশ তুমি জান। সুতরাং অন্য শরিকদের মাঝিরা বা কর্মচারীরা যত খাতির করে, আমাকে করে না। আমি ইচ্ছামত খুশিমত বোট নিয়ে এখানে সেখানে তোমায় নিয়ে বেড়াতে পারব না। কিন্তু লক্ষ্মণ মাঝি

আমার হাতের লোক। তাছাড়া টাকার খাঁই ওর একেবারে নেই।'

ট্রাঙ্ক টেলিফোনের আশ্বাস পাবার পর মুক্তার মন একটু ভাল হয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে কর্তাবাবু আর কর্তামার নৌকায় বেড়ানোর গল্প শুনছিল। বলল, 'বাবুর কথা ঠিক মা—নৌকায় মাইছাইলা থাকবে, বিশ্বাসী মানুষ না অইলে ডরের কথা।'

'আমি তো বুড়িয়ে গেছি, আমায় দিয়ে কি ডর রে মুক্তা?' প্রভা ক্ষীণ হাসল। 'তা তুই কি করবি? দু হপ্তা থাকি তিন হপ্তা থাকি গঙ্গায়, তুই কি একলা বাড়িতে থাকতে সাহস পাবি?'

তা-ও বটে! কথাটা তো ও ভেবে দেখেনি—আর এক ভাবনা তাকে এত বেশি মনমরা করে রেখেছে যে, এ-ভাবনা তার মাথায় আসে নি। চোখ বড় করে মুক্তা কর্তাবাবুকে দেখে। কুমারেশ মিটিমিটি হাসছে।

'আমি কি আর কথাটা চিন্তা করি নি—ও-ও নৌকায় থাকবে। বাড়িঘর পাহারা? লক্ষ্মণের ভাই শত্রুঘ্ন এসে থাকবে। তাই নিয়ে তো এতক্ষণ কথা হচ্ছিল লক্ষ্মণের সঙ্গে। দরজায় তালা দিয়ে যাব। একজন থেকে হাঁস মুর্গিগুলো দেখবে, তাই লক্ষ্মণের ভাইকে বাড়িতে রেখে যাওয়া। ব্যবস্থাটা ভাল হল না?' কুমারেশ প্রভার চোখের দিকে চাইতে প্রভা চোখ সরিয়ে নেয়। নৌকাবাসের কথায় একটু খুশি ছিল। এখন আবার মুখ কালো হয়ে গেল। কুমারেশ লক্ষ্য করে। ঘাড় ফিরিয়ে সে মুক্তাকে দেখে। যেন প্রস্তাব শুনে ও-ও মুখ কালো করে ফেলল। স্বাভাবিক। কর্তামার সঙ্গে নৌকায় থাকতে যাচ্ছে ও। যদি বলাই আসে খালি বাড়ি দেখে ফিরে যাবে। মুক্তার সঙ্গে তো দেখা হবে না। কিন্তু মুখ ফুটে তা ও বলতে পারছে না যে কর্তাবাবুকে। কুমারেশ বড় বেশি মনোযোগ দিয়ে মেয়েটাকে দেখছে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর গাল দেখছে, বুক দেখছে, কোমর দেখছে। একটা চাপা নিশ্বাস ফেলল প্রভা। কুমারেশকে জানিয়ে দেওয়া ভাল, বলে দেওয়া ভাল এ জিনিসের ওপর লোভ করে লাভ নেই। এ তোমার নয়। তাই এবার ও অল্প হাসল।

'বলাইয়ের জন্য ওর মন খারাপ।'

কুমারেশ বিরক্ত হয়। 'আমি তো বলেছি দু-এক দিনের মধ্যে ও ছাড়া পাবে।'

'তাই তো সব নয়—তোমাদের কারখানায় ওকে একটা কাজটাজ জুটিয়ে দিতে বলছে মুক্তা। আর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে একটা দিনটিন দেখে কাজটা সেরে ফেলতে হয়।'

কুমারেশ হাসল।

'হবে, সব হবে—আমাদের কাছে যখন এসেছে সব আমরা ঠিক করে দেব।'

মুক্তা চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। লাল হয়ে গেছে মুখখানা। দেখে কুমারেশ পর পর দুবার ঢোক গিলল।

'না, ওকে নৌকায় থাকতে বলছি, ধারে কাছে যদি নৌকা বাঁধা থাকে, মাঝে মাঝে তোমাদের দুজনকে রেখে কারখানায় এসে আমি কাজকর্ম দেখতে পারি—একলা তোমাকে নৌকায় রেখে কি করে আসি। তা ছাড়া নৌকায় থাকছি বলে রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া তো আর বাদ যাচ্ছে না।' কুমারেশ প্রভার দিকে ঘাড় ফেরায়।

প্রভা আর কিছু বলে না। মুক্তা আস্তে আস্তে দরজা ছেড়ে সরে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ আষাঢ়-শ্রাবণ। মুক্তার বুকের ভিতরটা দুরদুর করে।

আর কুমারেশের কপালের পাশের রগ দুটো টিপ টিপ করছিল টিপ টিপ করছিল। আষাঢ়-শ্রাবণ—এই আষাঢ়-শ্রাবণেই—কুটিল হেসে কুমারেশ বন্দুক হাতে রাস্তায় বেরোয়। লক্ষ্মণের ভাই শত্রুঘ্ন তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কুমারেশ তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগোয়। লাল চোখের জন্য লক্ষ্মণকে যদি ডাকাতের মত দেখায়, ইঁদুরের চোখের মত পিটপিটে ছোট ছোট চোখ দুটোর জন্য শত্রুঘ্নকে চোরের মত দেখায়। চিন্তা করে কুমারেশ নিজের মনে হাসে: 'চোর ডাকাত লম্পট ছাড়া আমার কাজের দোসর হবে কে।'

হলদে শাড়ির সঙ্গে অপরাজিতা রং ব্লাউজ চমৎকার মানিয়েছিল। তা ছাড়া পায়ে আলতা চোখে কাজল। প্রমত্ত বসন্ত কোকিল নদীর ধারের শিরীষ গাছে না, মুক্তার বুকের ভিতর গান গাইছিল। দুপুরে কর্তাবাবুকে সরাসরি কথাটা বলে দেওয়ার পর থেকে তার কী যে ভাল লাগছিল—না, আর একটা ব্যাপার হয়ে গেছে এর মধ্যে। সন্ন্যাসী মতন একটা লোক এসেছিল ভিক্ষা চাইতে বিকেলে বাড়িতে। কর্তাবাবু তখন বাইরে। ঘরের পৈঠায় বসে লোকটা শ্যামা সঙ্গীত গাইছিল। খাটে শুয়ে প্রভা শুনছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে মুক্তা শুনছিল। এক সময় প্রভা ওকে ডেকে ফিসফিসিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, 'এর নাম লোচন বৈরাগী। ভাল হাত দেখতে জানে। তুই তোর হাতটা দেখা না। বিয়ে টিয়ে সব বলতে পারে।' সলজ্জ হেসে মুক্তা ঘাড় কাত করেছে, তারপর লোচন

বৈরাগীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দেখতে অনুনয় করেছে। হাত দেখে লোচন হেসে বলেছে: 'আষাঢ়-শ্রাবণ না, এই বৈশাখেই তো আমি তারিখ দেখতে পাচ্ছি হাতের রেখায়।' তার পর মুক্তা প্রশ্ন করেছে, 'একউগা লোক আইসবার কথা—আমার জানা মানুষ—কবে তক তারে দেখমু।' এবার আর মুক্তার হাত না, মাটিতে কি সব রেখা কেটে গুণে লোচন বলেছে: 'দু চার দিনের মধ্যে মানুষটা এসে যাবে।'

শুনে আহ্লাদে মুক্তার দু-চোখ জড়িয়ে আসছিল। 'মধুসূদন আছে—মধুসূদন আমারে ছাইড়্যা যায় নাই। মধুসূদন মধুসূদন!' নিজের ঘরে ঢুকে চোখ বুজে হাত জোড় করে মুক্তা যখন প্রাণভরে তার ঠাকুরকে ডাকছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। ঠাকুরকে ডাকা শেষ করে মুক্তা আলো জ্বালল। আর সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল কুমারেশ। এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে এত বড় একটা বালি হাঁস। মরা হাঁসটাকে মুক্তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কুমারেশ। তার পা টলছে।

'ছুলে ফেল, ছুলে ফেল—তাড়াতাড়ি রান্না চাপা—ভয়ানক খিদে পেয়েছে।' কুমারেশের গলার স্বরটা অন্য রকম—চাউনিটা অস্বাভাবিক। কথা বলতে সাহস পায় না মুক্তা। নুয়ে হাত বাড়িয়ে হাঁসটাকে তুলতে গেছে, কুমারেশ খপ করে হাত ধরে ফেলল।

হাত ছাড়াতে সাহস পায় না মুক্তা। চুপ করে হাঁসের বুকের রক্তের ছিটা দেখে। কুমারেশ বিকৃত স্বরে চাপা গলায় হাসে।

'উঃ, একেবারে বিয়ের কন্যাটি সেজে আছিস!'

যেন হাসি শুনে মুক্তা এবার চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়।

'ছাইড়্যা দেন হাতখান, ছাইড়্যা দেন—গিয়া রান্নাবান্নার আয়োজন করি।'

'কেন, আমাকে তোর ভয়টা কি—আমি বাঘ?' কুমারেশ মুক্তার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়।

চিৎকার করে লাভ নেই, এখান থেকে ছুটে পালানোর চেষ্টা করা বোকামি। তাই চোখে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে অনুনয়ের স্বরে মুক্তা বলল, 'কর্তামা রাগ করবেন। আমি আপনাগো চাকরানী, আমার শরীলে যদি আপনি হাত লাগান কর্তামা মনে দুঃখু পান।'

'কর্তামাকে আমি এখনই খতম করে দিচ্ছি তুই দাঁড়িয়ে দেখ—বন্দুকে এখনো গুলি ভরা আছে।'

চোখের হাসি নিভে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুক্তার চেহারা। কথা বলতে পারে না। কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিলল শুধু। কুমারেশ আবার হাসল।

'কথা বলছিস না কেন? দেব শেষ করে? কর্তামার জন্যে তো তোর ভাবনা—'

হাতে এত জোরে চাপ দেয় কুমারেশ যে যন্ত্রণায় উঃ করে ওঠে মুক্তা। চোখে জল দাঁড়ায়। 'আমার জন্য আপনার পরিবারেরে গুলি কইর‍্যা মারবেন? আমি কেডা? এউক্‌গা বাস্তুহারা মাইয়া। আপনি ভদ্দরলোক—আমারে দিয়া আপনার কী সুখ অইব?'

'অনেক, অনেক সুখ—লাখটাকায় এই সুখ মেলে না—লাখটা ভদ্দরলোকের মেয়ে এই সুখ—' যেন গলা বাড়িয়ে দিয়ে কুমারেশ মুক্তার গালের কাছে মুখ নিতে চাইছিল। মুক্তা দু হাতে ঠেলে কুমারেশকে সরিয়ে দেয়। ধাক্কা খেয়ে কুমারেশ পড়ে না। তার বাঁ হাতে ধরা গুলিভরা বন্দুক মেঝেয় ছিটকে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর দরজা বারান্দা বিকট শব্দে কেঁপে উঠল। এক সেকেণ্ড। একটুখানি ধোঁয়া। একটু বারুদের গন্ধ। যেন গুলি উঠানের পাশের একটা টিন ঝাঁঝরা করে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস নলটা বাইরের দিকে মুখ করে পড়েছিল।

থমকে আছে কুমারেশ। মুক্তা চোখ বড় করে বন্দুকটা দেখে। এমন সময় পাশের ঘরে শোনা যায় প্রভার ভয়ার্ত গলার চিৎকার: 'মুক্তা মুক্তা, কি হল?'

মুক্তার গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। তখনও ও ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য শান্ত ঠাণ্ডা গলায় কুমারেশ এ-ঘর থেকে বলল, 'কিছু হয় নি, কিছু হয় নি! দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখতে গিয়ে বন্দুকটা পড়ে গেছে—টোটা ভরা ছিল। কারোর গায়ে লাগে নি।'

কথা শেষ করে কুমারেশ মুক্তার চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হাসে। যেন এখন আর তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা উদ্দামতা নেই। স্থির সংযত। মুক্তার হাত ধরল না, বা গলা বাড়িয়ে মুক্তার গালের কাছে মুখ নিতে চেষ্টা করল না।

'নে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' যেন প্রভার কানে যায় এভাবে গলা বড় করে কুমারেশ বলল, 'পাখীটা ছাড়িয়ে কেটেকুটে ঠিক করে নে। রাত হচ্ছে। কখন রান্না হবে—'

আড়ষ্ট হাত বাড়িয়ে মুক্তা বালি হাঁসটাকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'বড় তাড়াতাড়ি করতে গিছলাম। তাড়াতাড়ি কিছু করতে গেলে এমন হয়।' বাড়ির সামনে গোলাপ বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে কুমারেশ চিন্তা করে। 'কী বিচ্ছিরি কাণ্ড হত। শালা আমিই খুন হতাম, শালা যার জন্য এত করা ও-ই হয়তো মরত—'

কুমারেশের চিন্তায় ছেদ পড়ে। যেন কারা ছুটে আসছে। হাতে হ্যারিকেন ঝুলছে। কাছে আসতে কুমারেশ চিনল। কারখানার কর্মচারী গঙ্গাপদ ও হরিপদ।

'কি—কি রে?'

'কর্তা, বন্দুকের আওয়াজ পাইলাম—ভাবলাম বাড়িতে কি চোর ডাকাত পড়ল।'

হাসল কুমারেশ। 'চোর ডাকাত আমার বাড়িতে আসবে কেন রে—আমি তোদের কাঠগোলার চার আনার শরিক। চোর ডাকাত যাবে বড় শরিকদের ঘরে—আমার সিন্দুকে হীরা মুক্তা সোনাদানা নেই, হা-হা।'

শুনে গঙ্গাপদ ও হরিপদ হাসে।

কুমারেশ বলল, 'শেয়াল এসেছিল আমার হাঁস মুর্গি খেতে। তাই গুলি ছুঁড়েছি।'

শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে গঙ্গাপদ ও হরিপদ কর্তাকে পেন্নাম জানিয়ে আবার কাঠ-গোলার দিকে ফিরে যায়।

ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে আকাশে। কুমারেশ আকাশের দিকে চোখ তুলল। 'ত্রয়োদশী চতুর্দশী পূর্ণিমা। আর দুদিন—আরো দুটো দিন সবুর করতে হবে আমাকে—তাড়াহুড়ো করাটা কিছু না।' চিন্তা করে কুমারেশ একটা বাঁকা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বাড়িতে ঢোকে।

মুক্তার উনুন ধরে গেছে। হাঁড়ি চাপানো হয়েছে। থালায় করে তেল মশলা দিয়ে মাংস মাখছে। কুমারেশ এসে পিছনে দাঁড়ায়। তার পকেটে হাত। 'মুক্ত—'

ডাক শুনল কিন্তু মুখ তুলল না মুক্তা।

একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে কুমারেশ মুক্তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়। আড়চোখে টাকাটা দেখে মুক্তা, কিন্তু হাত বাড়িয়ে সেটা তোলে না। কুমারেশ রাগ করতে গিয়েও নিজেকে সংযত করল।

'তোর হাত খরচের জন্য দিলাম—তুলে রাখ।'

এবার মুক্তা মুখ তুলল। চোখে জল। হাত বাড়িয়ে মুক্তা টাকা ধরল না,

কুমারেশের পা ধরল। 'বাবু!'

'কি?' কুমারেশ পা ছাড়াতে চেষ্টা করে না।

'আমার এউকগা কথা রাখবেন?'

'কি কথা?' কুমারেশ হাসে। 'তোর সব কথা আমি রাখব। তুই যদি—'

'বলাই যদি আইয়ে আমারে বলাইয়ের সাথে আবার কইলকাতা পাঠাইয়া দেন।'

চুপ করে থাকে কুমারেশ। পা দিয়ে নরম হাতটা গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবে কিনা চিন্তা করে। না কি উনুনের আগুনের ভিতর গলাটা ঠেসে ধরবে।

'বলাইয়ের সঙ্গে কলকাতা গিয়ে করবি কি? খাবি কি? বলাই তোকে খাওয়াতে পারবে? নাকি খুড়ির লাথি ঝাঁটা খেতে যাবি শিয়ালদা স্টেশনে?'

'আমি এইখানে থাকুম না—আমি এইখানে থাকলে আপনাগো সংসারের অশান্তি বাইড়া যাইব।' পা ছেড়ে দিয়ে মুক্তা চোখ মোছে। 'আমার লাইগা আপনি কর্তামারে গুলি করতে চান, ছি ছি।'

'ও, সেই কথা?' গলার ভাঁজ তুলে কুমারেশ হাসল। 'তখন ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলেছি। আরে গুলি যদি করব তবে কি রোগা মানুষটার জন্য আমি এত করছি। ওষুধে পথ্যে কত টাকা খরচ হচ্ছে। ঐ তো আবার নৌকায় গিয়ে থাকতে হলে—নে, টাকাটা তোল। রাগের মাথায় মানুষ যা বলে তা কি আর করে।'

তবু কাঁদে মেয়েটা।

কুমারেশ ওর মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়, 'আমি মাঝে মাঝে একটু মদ খাই তুই জানিস তো—তখন নেশার ঝোঁকে কি বলেছি কি করেছি এখন আর মনে নেই। টেলিফোন যখন করে দিয়েছি দু-এক দিনের মধ্যে বলাই এসে যাবে। তার পর বলেছিই তো, আষাঢ়-শ্রাবণে একটা দিনটিন দেখে এখানেই তোদের—'

তাই হয়তো হবে। কেমন বিশ্রী গন্ধ পেয়েছে তখন ও বাবুর মুখে। চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে মুক্তা ফ্যাল ফ্যাল করে কুমারেশকে দেখে। তার পর ধরা গলায় বলে, 'আপনাগো কারখানায় ওরে একটা কামটাম জুটাইয়া দিবেন?'

'তাই দেব—তাই দেওয়া যাবে—নে, টাকাটা রাখ।'

মুক্তা হাত বাড়িয়ে নোটটা তুলে আঁচলে বাঁধে।

'তয় ঐ জিনিস আর খাইবেন না, বেসামাল অইয়া কখন কি আপদ ঘটাইবেন

—শেয়ালদায় একদিন মদ খাইয়া একটা লোক রাস্তার মাইঝে নাচতে গিয়া ট্রামের তলে কাডা পড়ল।'

'না রে না, অত বেসামাল আমি হইনে। বেসামাল হবার আগে চিরকাল সামলে উঠি, হা-হা।'

কুমারেশ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে মুক্তা আঁচল থেকে নোটটা খুলে একটু সময় সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আর মনে মনে বলল, 'তুইয়ে আর পাঁচে সাত। সাতখান টেকা দিয়া বলাই আমারে আশীর্ব্বাদ করব—গরীব মানুষ চাকরি-বাকরি নাই—এইয়ার বেশি পারব কেনে।'

'তাই কও, তাই অইব। কর্ত্তাবাবু মাইঝে মাইঝে নেশা ভাং করে আর তখন বেসামাল অইয়া আমার সাথে এরকমডা করে। নেশা করলে কি বয়সের দিশা থাকে নাকি।' দরজার খিল এঁটে মুক্তা হাঁড়ির ভিতর টাকাটা রাখবার আগে আর একবার ভাল করে দেখল। এক সঙ্গে পাঁচ টাকা সে জীবনে দেখে নাই। দেখলেও নিজের হাতে নিয়ে দেখে নাই। টাকাটা ভাঁজ করে দু টাকার লাল নোটটার সঙ্গে হাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখে একটা সরা চাপা দিয়ে মুক্তা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল আর চিন্তা করতে লাগল: 'কর্ত্তাবাবু যখন বেসামাল অইয়া পড়ে তখন আর আমি কাছে থাকুম না। পায়খানায় যাইয়া বইসা থাকুম—গিন্নীমার কাছে বইসা থাকুম—তয় আর কিছু করবার সাহস পাইব না।' চিন্তা করতে করতে মুক্তা কান খাড়া করে ধরল। পাশের ঘরে কর্ত্তার গলা শোনা যায়। 'গলার আওয়াজে বোঝা যায় বাবু অখন পরিবার লইয়া সোহাগ করছে।' মুক্তা মুচকি হাসে। 'আর তখন নেশার ঝোঁকে কয় আমি বউরে গুলি কইর‍্যা শেষ কইর‍্যা দিমু—তোরে লইয়া থাকমু।' আলো নিভিয়ে মুক্তা শুয়ে পড়ল। 'এইডা অয় না। আসলে মানুষটার দয়ার শরীল। মাইঝে মাইঝে মন খারাপ অইলে মদ খায়। মন খারাপ না অইব কেনে। কর্তার শরীল তো একবারে পইড়্যা যায় নাই—তার বউয়ের সারে না বেরাম। এউকগা ছাইলা পাইলা থাকলেও বাবুর মনডা ভাল থাকত। না না, আসলে মানুষটা খারাপ না, খারাপ না।' যেন কর্ত্তাবাবুর জন্য মুক্তার একটু কষ্ট হতে লাগল। 'মধুসূদন, আমার বিপদ যখন বারে বারে কাডাইতাছ এই লোকটারেও একটুক সুখ দেও। গিন্নীমার এউকগা বাচ্চাটাচ্চা অউক। অসুকখান সারাইয়া দাও।' হাত জোড় করে মুক্তা তার ঠাকুরকে ডাকল আর কান খাড়া করে রাখল।

আর কিছু শুনল না সে। 'কর্তাবাবুর ঘুম পাইছে ঘুমাইয়া পড়ছে।' নিশ্চিন্ত হয়ে মুক্তা শিয়রের বালিশটা পেটের তলায় চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে এখন নিজের কথা চিন্তা করতে লাগল। চোখে ঘুম আসে না। জানালার বাইরে চাঁদের আলোর বান ডাকছে নাকি। গাছপালা নিথর। 'আ, অখন যদি বলাই আইত, বলাইরে পাইতাম!' বালিশটা পেটের তলা থেকে টেনে এনে বুকের নিচে চেপে ধরে ও। 'বলাই অখন এই বিছানায় আইয়া শুইলে আমি এমনে আদর করতাম, এমনে আদর করতাম।' বালিশের একটা কোণার ওপর গরম ঠোঁট দুটো চেপে ধরতে গিয়ে মুক্তার কান দুটো গরম হয়ে গেল, শরীর গরম হয়ে গেল। বড় বেশি ছটফট করতে লাগল ও। হয়তো সারা রাত এই ছটফটানি থাকত। কিন্তু এক সময় একটা কথা মনে হতে শরীর আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যেন ভয় করতে লাগল মুক্তার। 'যদি এমনডা অয় আমার আর ছাইলা পাইলা অইল না, তয়? তখন কি বলাই আর আদর করব আমারে? তখন যদি—' মধুসূদনকে হাত জোড় করে বারবার ডাকতে লাগল মুক্তা।

॥ দশ ॥

লক্ষ্মণ মাঝির নৌকা ছোট না। বেশ বড় নৌকা। না হলে তিনটা মানুষ ধরবে কেন। কারখানার লোকজন সাহায্য করল। প্রভাকে স্ট্রেচারে করে নৌকায় তোলা হল। প্রভার ওষুধপত্র জামাকাপড় থেকে আরম্ভ করে হাঁড়িকুড়ি বাসনপত্র উনুন কয়লা কাঠ, কুমারেশের নিজের জামাকাপড় আরসি চিরুনিটা পর্যন্ত নৌকায় এনে তোলা হল। কদিন থাকা হবে তার ঠিক কি। একটা ছোট টিনের সুট্‌কেশ-এ মুক্তার কাপড় জামা তেল সাবান। কুমারেশের বন্দুক। 'ওটা ছাড়া নৌকায় বেড়ানোর কোন মানে হয় না। তাছাড়া খালি বাড়িতে এমন সাংঘাতিক অস্ত্র রেখে আসার বিপদ আছে।' হেসে কুমারেশ বন্দুকটা নৌকার পাটাতনের নিচে যেমন যত্ন করে রেখে দেয় আর একটা জিনিসও সেখানে লুকিয়ে রাখে। বেশ বড় একটা বোতল। একটা কাঁচের গ্লাস। মুক্তা দেখে চিনতে পারল। কথা বলল না। প্রভা ঠোঁট টিপে হাসল। বলল না কিছু। কেবল মুক্তার গায়ে ছোট একটা চিমটি কাটল। বাড়িতে মুখ কালো করে থাকত ও। এখন না। এখানে না। নদীর বুকে ফাল্গুনের রৌদ্রের ঝিকিমিকি, নদীর ধারের গাছপালার ঘন

সবুজ, মাথার ওপর প্রকাণ্ড নীল আকাশ দেখে এমন রোগা মানুষটারও মন উদার হয়ে গেছে। 'এত করছে আমার জন্যে, এখন ও যদি তার অভ্যাসের জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে আসে রাগ করাটা ভাল না।' চিন্তা করে প্রভা মুক্তার গলায় হাত রেখে গঙ্গার ঢেউ দেখতে লাগল।

'আর কিছু বাকি রইল কর্তা নৌকায় আনবার?'

'না সব এসে গেছে। এইবেলা দুর্গা দুর্গা করে নৌকো ছেড়ে দাও লক্ষ্মণ—ওদিকে আবার শনিবার বারবেলা পড়ে যায়।'

কর্তার আদেশ পেয়ে লক্ষ্মণ লগি ঠেলে। তীরের মাটি ছেড়ে নৌকা মাঝ নদীতে এসে দুলতে থাকে। লগি রেখে লক্ষ্মণ জোরে হাল চেপে ধরল।

'এখন গঙ্গা ঠাণ্ডা, এখন কোনো ভয় নেই, কেমন লক্ষ্মণ?'

'ভয়টা কিসের—লক্ষ্মণ মাঝি হাল ধরলে ঝড়ঝাপটা ঘূর্ণিপাক নৌকারে কিছু করতে পারে?' হাল চেপে ধরা দু হাতের পেশী ফুলে উঠেছে লক্ষ্মণের। লাল চোখ দুটো ভাঁটার মত জ্বলছে।

প্রভা মাঝির দিকে একবার চেয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ ফিরিয়ে নেয়। মুক্তাও একবার আড়চোখে ডাকাতের মত চেহারাটা দেখে। তার পর মনে মনে ডাকে, মধুসূদন মধুসূদন!

দুজন পাশাপাশি বসে ছইয়ের ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে নদীর জল দেখে। কুমারেশ বলছিল, 'এখন রোদটা কড়া। বিকেল পড়লে ছইয়ের বাইরে গিয়ে বসবে। তখন দেখবে গঙ্গার শোভা।'

কুমারেশের কথার উত্তর দেয় না তারা। দুটি মেয়ে ফ্যালফ্যাল করে জলের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে কথা বলে, 'পূব বাঙ্গলার মাইয়া, আমি সাঁতার জানুম না কেনে মা!'

প্রভা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে।

'আমার আর এ জন্মে সাঁতার শেখা হল না।'

শুনে মুক্তা চুপ করে থাকে একটু সময়।

নৌকা যেন দক্ষিণ দিকে চলছিল।

লক্ষ্মণের পাশে দাঁড়িয়ে কুমারেশ সিগারেট টানে আর হাত নেড়ে নেড়ে দুধারের তীর দেখিয়ে কি যেন বলে। এতক্ষণ একেবারে হাওয়া ছিল না। এখন একটু একটু হাওয়া ছাড়ছে। ছোট ঢেউগুলো বড় হচ্ছে। নৌকা একটু বেশি দুলছে। উবু হয়ে বসে ছিল প্রভা আর মুক্তা। এবার দুজন চেপে বসল।

'আমাগো ত্যাশের নদীখান ঠাণ্ডা মা।'

'তাই নাকি!'

'মেঘ না উঠলে চুপ কইরা থাকে। মেঘ উঠলে পাগলামি উছলায়।'

মুক্তার কথায় প্রভা হাসে। মুক্তা বলে, 'তাই না নদীখানের নাম অইছে মেঘনা। আর জলের রং কি এমন লাল—এইডার জলে কাদা গুইল্যা রাখছে। আমাগো মেঘনার জল আরসির মতন ফটফট করে মা—মুখ দেখা যায়।'

প্রভা চুপ থাকে। মুক্তা আঙুল দিয়ে এক দিকের তীর দেখায়।

'অই সকল কি গো মা?'

'টালির ঘর।' প্রভা বলছিল। 'অনেক নতুন ঘর উঠেছে রে!'

কুমারেশ ছইয়ের ভিতর ঢুকে কথাটা শুনতে পায়। হাসে।

'মুক্তার দেশের লোকেরা ঘর বেঁধেছে।'

'কলোনী?' প্রভা কুমারেশের দিকে তাকায়।

কুমারেশ ঘাড় নাড়ে। 'জঙ্গল ছিল, ত্যাখো বাস্তুহারারা এসে কেমন সুন্দর ঘরবাড়ি বাগান ক্ষেত খামার করে জায়গাটার চেহারা বদলে দিয়েছে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল মুক্তা। তার বুকের ভিতর মোচড় দেয়। কলোনী! কলোনী! শিয়ালদা স্টেশনে থাকতে লক্ষবার কথাটা তার কানে গেছে; কত মানুষ জায়গা পেল, জমি পেল, ঘর পেল। গরুবাছুর পুকুর বাগান নিয়ে বাড়িগুলি যেন মুক্তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'আমাগো কিছুই অইল না—আমার কাকা কিছু পাইল না অখনও।'

'হবে, আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।' কুমারেশ প্রবোধ দেয়। হাসে। 'এইবেলা তুই একটু চা করার ব্যবস্থা কর তো। তুমি একটু হরলিক্স খাও।'

প্রভা মাথা নাড়ল। 'না আমার যেন চা খেতে ইচ্ছে করছে। আমার জন্যেও চা কর মুক্তা।'

উঠে মুক্তা কেটলিতে জল গড়িয়ে নেয়।

পাটাতনের নিচ থেকে কুমারেশ স্টোভ বার করে সেটা ধরাবার ব্যবস্থা করে।

·

বিকেল পড়তে তারা একটা সুন্দর জায়গায় এসে পড়ল। সুন্দর জায়গা বলেই কুমারেশ এখানে লক্ষ্মণকে নৌকা বাঁধতে বলল। ওপারে কিছু কলকারখানা দেখা যায়। কিন্তু এপার একেবারে নির্জন। একটা বাড়ি নেই। কেবল বড় বড়

গাছ আর কাঁটাজঙ্গল। এতক্ষণ শুধু ঘোলা জলের নাচ দেখে প্রভার মাথা ঘুরছিল। এখন তীরের ঠাণ্ডা সবুজ ছায়া, লতা-পাতার ফাঁকে ফাঁকে নরম রোদের ঝিকিমিকি দেখে আর অগুণতি পাখীর ডাক শুনে প্রভার বুক জুড়িয়ে গেল। কত রকমের পাখী, কত রং বেরং-এর প্রজাপতি ফড়িং।

নৌকা বেঁধে লক্ষ্মণ তীরে উঠে গেছে।

'আমিও একটু বেড়িয়ে আসি ডাঙ্গায়।' কুমারেশ পাটাতনের তলা থেকে বন্দুক তুলে আনে। 'আপাতত আমাদের নৌকা এখানেই থাকবে—তোমার যখন জায়গাটা পছন্দ হয়েছে।'

'আসলে এ জায়গা তোমারই বেশি পছন্দ হয়েছে।' প্রভা ক্ষীণ হাসল। মুক্তা সায় দিল। দুজনে কুমারেশের হাতের বন্দুকটা দেখে।

'তা বলেছ সত্য—শিকারের সন্ধান পেলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়—' কুমারেশ লাফিয়ে ডাঙ্গায় নামে। নৌকাটা দুলে ওঠে। প্রভা মুক্তার হাত চেপে ধরে। দোলানি থামতে হাত ছেড়ে দেয়। কুমারেশ গাছের আড়ালে তখন অদৃশ্য হয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে শুক্লা চতুর্দশীর প্রকাণ্ড চাঁদ দেখে প্রভা স্তব্ধ হয়ে গেল। বনে জলে জ্যোৎস্না এমন অপরূপ হয়ে ওঠে আগে তার জানা ছিল না। মুক্তা ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'দ্যাশের কথা বড় বেশি মনে অইতাছে কর্তামা।'

মুক্তার চোখের কোণা চিকচিক করছে।

'ছি, কাঁদিস নে—মন খারাপ করার কি সময় এটা। তোর মত তো কত শত লোক দেশ ছেড়ে এসেছে—দেখলিনে? আবার তারা ঘর বেঁধেছে, আবার তারা সংসার পেতেছে। তোরও হবে। আসুক না বলাই। আমি সব ঠিক করে দেব।'

যেন পরম নির্ভরতায় মুক্তা কর্তামার কোলের উপর হাত রাখে। ঝিঁঝি ডাকছে দূরে কাছে।

'আমার মনে কয় আর জন্মে আপনি আমার মা আছিলেন।' মুক্তার কথার উত্তর দেয় না প্রভা। কেবল তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোয়।

লক্ষ্মণ ফিরে আসে।

'কোথায় গিছলে?' প্রভা প্রশ্ন করে। লোকটাকে আর ভয় নেই তার। কণ্ঠটা দেখে আর কথাবার্তা শুনে প্রভার মনে হয়েছে, ওই দেখতেই ডাকাত—মনটা নরম। কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকায় না। নীচের দিকে চোখ

রেখে হেসে হেসে কথার উত্তর দেয়।

'আমার তামাক পাতা ভুল করে ফেলে এনু মা—ওই একটু পাতা কিনতে দোকানে গেলাম।'

প্রভা চোখ বড় করে।

'এখানে—এপারে আবার দোকান কোথায় রে! সব তো দেখছি জঙ্গল।'

'আছে মা আছে—জঙ্গলের পিছনে তো বড় সড়ক। কলকাতা যাবার বড় সড়ক। তা এই ঘাট থেকে আধ মাইলটাক দূর হবে।'

মুক্তা শুনছিল। মুক্তা ভাবছিল। যেন সড়কের কথা শুনে তার মনে পড়ে ওই পথেই বাসে চড়ে, কখনো পায়ে হেঁটে বলাইয়ের হাত ধরে সে কলকাতা থেকে চলে এসেছিল। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল ও। রাস্তার পাশের সেই বড় ছাতিম গাছের ছায়ায় বসে জিরানোর ছবিটা তার মনে পড়েছে।

কুমারেশ ফিরে এল মন খারাপ করে।

'না, শিকার জুটল না। ভাবলাম হরিয়াল টরিয়াল মেলাই আছে। কেবল ঘুঘু আর টিয়া—'

'আর একটু উত্তরে নৌকা বাঁধবার মন ছিল আমার কর্তা।' লক্ষ্মণ বলল, 'হেই যে বড় অশত্থ গাছটার তলায়।'

'কাল—আজ আর নৌকা খুলে লাভ নেই।' কুমারেশ বন্দুক রেখে দেয়। 'মুক্তা, উনুন ধরাবার ব্যবস্থা করতে হয়। ডিমের ঝোল আর ভাত চাপিয়ে দে।'

ছইয়ের বাইরে উনুন টেনে নিয়ে মুক্তা কাঠ কয়লা সাজাতে বসে।

বাইরে আবার তখন জোরে হাওয়া বইছিল। কাজেই উনুন ধরিয়ে ওটাকে ছইয়ের ভিতরে টেনে এনে মুক্তা ভাত চাপিয়ে দেয়।

'হাওয়াটা ভাল লাগছে।' প্রভা বলছিল।

কুমারেশ বলছিল, 'ভাল লাগলে এখানে একটু বস। আমিও এখানে বসছি।'

গলুইয়ের বাইরে কর্তামার পাশে কর্তাবাবু বসে গল্প করে। জলের গল্প, জ্যোৎস্নার গল্প। 'কাল পূর্ণিমা। পূর্ণিমার জোয়ারের সময় গঙ্গার কী অপরূপ চেহারা ধরে দেখবে!'

'আমি কোনোদিন পূর্ণিমার জোয়ার দেখি নি।'

'কাল দেখবে, কাল দেখাব।' যেন কর্তাবাবুর সোহাগটা নৌকায় এসে আরো বেড়ে গেছে। মুক্তার ভাল লাগে। কর্তামার ওপর বাবুর মন যত বেশি পড়ে থাকে তত সে নিশ্চিন্ত। বাপ্, পরশু সন্ধ্যেবেলা বাবু নেশার ঝোঁকে কী

সব করতে চেয়েছিল!

'কিরে মুক্তা, তোর ভাতের জলে ফেনা উঠল?' কর্তামা এদিকে গলা বাড়িয়ে হেসে মুক্তার সঙ্গেও কথা বলতে চাইছেন। হাসি হাসি মুখ। জ্যোৎস্না লেগে সুন্দর দেখাচ্ছে। 'এই যে আইসা গেল মা—কতক্ষণ আর লাগবে, অইয়া যাবে।' মুক্তা হেসে উত্তর করে।

'তোমার খুব খিদে পেয়েছে?'

'না।' কর্তাবাবুর দিকে ঘুরে বসে কর্তামা। 'একলা একলা বসে রান্না করছে তাই ওর সঙ্গে কথা বলছি।'

'ও একলা বেশিদিন থাকবে না। বলাইটা যদি এসে যায়—' চাপা গলায় কর্তাবাবু বাকি কথাটা বলেন। কর্তামা হাসেন। দুজনের চাপা হাসি মুক্তার বুকে পুলকের শিহরণ জাগায়। কিন্তু মনের সে ভাব বেশিক্ষণ থাকে না। দুশ্চিন্তাটা ফিরে আসে। যদি ওরা ছেড়ে না দেয় বলাইকে—যদি ছ মাস ন মাস—

মুক্তার এখন আবার কর্তাবাবুকে কথাটা মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু ইচ্ছাটা চেপে রাখল। বার বার বললে বিরক্ত হবেন। নিজে থেকেই তো বললেন, মুক্তাকে আর বেশিদিন একলা থাকতে হবে না। তার মানে—

॥ এগারো ॥

পরদিন লক্ষ্মণ আর একটু উত্তরে সেই বড় অশথ গাছের তলায় এনে নৌকা বাঁধল। এখানেও জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গা পড়ো বাড়ি মাথা জাগিয়ে আছে।

সকালে চা খেয়েই কুমারেশ বন্দুক নিয়ে ডাঙ্গায় উঠে যায়। লক্ষ্মণ ডাঙ্গায় উঠে জঙ্গল থেকে টেনে টেনে শুকনো ডাল পালা এনে নৌকায় জড়ো করতে আরম্ভ করে দেয়।

মুক্তা হাসে। প্রভা হাসে।

'এত কাঠ আনছ কেন লক্ষ্মণ—আমাদের তো কাঠ আছে।'

বড় বড় দাঁতে লক্ষ্মণ হাসে। 'মাগনা পাইছি মা, ছাড়ি কেন?'

শুনে মুক্তা ও প্রভা আরো জোরে হাসে।

কাঠ তোলা শেষ করে লক্ষ্মণ চুপ থাকে না। হেই-হাই করে একটা জেলে ডিঙ্গিকে ডাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'কি ব্যাপার!' প্রভা চোখ বড় করে তাকায়।

'মাছ—' লক্ষ্মণ বলল, 'জ্যান্ত মাছ মা ঠাকরুণরে খাওয়াই। বাজারের বরফ চাপা মাছ না।'

'ভাল ভাল, ডাকো।'

ডিঙ্গি প্রভাদের নৌকার কাছে আসে। মাছ দেখে প্রভার চোখ জুড়িয়ে যায়। এত বড় বড় বাটা মাছ! লাফাচ্ছে? 'কত—কত দাম?'

জেলে অল্প হেসে দাম বলে।

'একটু বেশি চাইছ।' প্রভা বলে, 'তাহলেও সস্তা—আয় তো মুক্তা।' রুদ্ধ-স্বরে প্রভা মুক্তাকে ডাকে। মুক্তা উনুন ধরানো ফেলে রেখে ছইয়ের বাইরে ছুটে আসে। কতকাল পর জ্যান্ত মাছ দেখে ও অবাক হয়। নৌকার খোলের মধ্যে রুপালী মাছেরা লাফাচ্ছে, ছটফট করছে।

এই এত মাছ রাখল প্রভা।

'আমাদের নৌকার খোলে জল দিয়ে মাছ জিইয়ে রাখা যাবে না লক্ষ্মণ? কাল খাওয়া যাবে—আজ কত খাব!'

'যাবে, কেন যাবে না?' লক্ষ্মণ নৌকার পাটাতনের ওপর চোখ রেখে হাসে। তারপর কটা মাছ এখনকার মতন রেখে বাকিগুলো সব খোলের মধ্যে ঢোকায়। জেলেডিঙ্গি চলে গেল আর এদিকে এত বড় দুই হরিয়াল কাঁধে ঝুলিয়ে কুমারেশ এসে নৌকায় উঠল। 'কি ব্যাপার?'

'দেখ দেখ, কেমন সব জ্যান্ত টাটকা মাছ রাখলাম মাছমারা এক ডিঙ্গি থেকে।' প্রভা আঙুল দিয়ে মুক্তার সামনে একটা চুবড়িতে রাখা মাছগুলো দেখায়।

কুমারেশ খুশি হয়। 'বাঃ বাঃ—এদিকে মাংসেরও জোগাড় হল। বাটার ঝোল আর হরিয়ালের রোস্ট—আজ আমাদের ফিস্টি!'

বাবুর গলার স্বরটা অন্যরকম। পা দুটো টলছে। নেশা করে এসেছে। বুঝতে পেরে মুক্তার হঠাৎ আবার কেমন ভয় হয়। কিন্তু ভয়টা থাকে না। নেশার ঝোঁকটা তার দিকে না—কর্তামার দিকে। কেননা মুক্তার চোখের সামনে কর্তাবাবু 'আজ আমাদের ফিস্টি' বলতে বলতে কর্তামার শুকনো থুতনিটা আঙুল দিয়ে নেড়ে দিল। লজ্জা পেয়ে মুক্তা চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি

ঁট নিয়ে মছে কুটতে বসে আর মিটিমিটি হাসে

জেল খাটতে হল না বলাইকে। থানা থেকেই ছাড়া পেল। কেননা কুমারেশের রিপোর্ট পেয়ে সেদিন সকালে পুলিস যখন বৈঠকখানা বাজারের শুঁটকির গুদামের পিছনে বলাইয়ের সেই অন্ধকার মতন ঘরে গিয়ে হানা দেয়, তখন ঘরে এক ফোঁটা মদ ছিল না। ব্লাডার ছিল, কাঁচের গ্লাস ছিল, খালি বোতল ছিল। এবং সেগুলোতে মদের গন্ধও লেগে ছিল। কিন্তু মদ কোথায়? আর চন্দননগর থেকে চোলাই মদ আমদানি করে ওখানে বসে বিক্রি করা হয় তার প্রমাণ ছিল কোথায়? তবে উত্তম-মধ্যম কিছু পড়ল বলাইয়ের পিঠে। কিন্তু তা বলে তার মুখ দিয়ে কিছু বার করা গেল কি? দুদিন হাজত খেটে বলাই থানা থেকে বেরিয়ে যখন বাজারে ফিরে এল তখন বন্ধু তার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল।

'শালা আহাম্মক—অজবুক।'

বলাই কথা বলছিল না।

বন্ধু বলল, 'ছাখ্, তোর সেই ব্যারাকপুরের ট্যারা দোস্তের কারসাজী, বুঝলি? ঐ শালা পুলিসের কানে লাগিয়েছে।'

আকাশ থেকে পড়ল বলাই।

'আমি সব খবর রাখি।' রাধাচরণ বলল, 'তোর কুমারেশ দত্ত যদি চলে ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। সেদিন দেখলাম শেয়ালদার ট্রেন থেকে নেমেই শালা তার হোটেল কি বাজারের দিকে না গিয়ে উত্তর দিকে ধাওয়া করেছে। তখন আমার কেমন যেন সন্দ হল। একটা রিক্সা নিয়ে ছুটলাম পিছু পিছু। ঠিক। চাঁদ গিয়ে থানায় উঠেছে। হুঁ, পঁচিশ মিনিট ছিল শালা সেখানে। তার পরই তো শুনলাম আমার দোকানে পুলিস এসেছে।'

'আহা, যদি তুমি তখনি এসে আমায় বলতে—'

এবার বন্ধু বড় করে ভেংচি কাটল। 'কি হত বলে? তা ছাড়া ঘরে এক ফোঁটা নেই আমি বেশ জানতাম, তাই আর খবর দিই নি।'

'তাহলেও আমায় মারটা খেতে হত না।'

'অজবুকের মার খাওয়া ভাল। নে তোর পোটলাপুঁটলি এখান থেকে নিয়ে যা।'

সাবানের দোকানে বন্ধু বলাইয়ের দুটো ছেঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি আর চিনেবাদামের

থলেটা এনে রেখেছিল। এখন বার করে দিল।

'আমি কি—' বলাই ঢোক গিলছিল।

'আমার এখানে আর তোমার জায়গা নেই—শালা অল্পের জন্য আমার হাতে হাতকড়া পড়ে নি। তখনি সরে গেলাম।'

কি ভাবল বলাই। হাত বাড়িয়ে ছেঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি আর থলেটা নেয়। তার পর: 'আট আনা পয়সা দাও।'

বন্ধু মুখ ঘোরায়। 'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'হোটেলে খাব—একটা পয়সাও তো হাতে নেই।'

'একটি পাই হবে না। যাও।'

আর দাঁড়ায় নি বলাই। আস্তে আস্তে বাজার থেকে বেরিয়ে এসেছে। থলের ভিতর কিছু বাসি বাদাম ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাই চিবোল। তার পর কল থেকে পেট ভরে জল খেয়ে ভাবতে আরম্ভ করল, এখন কি করা। ভাবতে ভাবতে এক সময় সে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। ঐ শালা কুমারেশের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করতে হবে। অনেক টাকা পায় সে। 'হুঁ, টাকাটা দেবেনা বলে শালা এই বদমায়েসী করে গেল। তা জেলে পাঠাতে পারলি? এইবার? যদি আমার সকল টাকা গুণে না দিস তো তোর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব।' ভেবে বলাই হাঁটতে আরম্ভ করে। হাঁটা পথে তাকে ব্যারাকপুর যেতে হবে। বিকেল হয়ে গেছে। সেখানে পৌঁছতে রাত হবে। হোক। বিনা পয়সায় আজই, এখনি সে ট্রেনে চড়ার ইচ্ছাটা ত্যাগ করল। কেননা একবার পুলিসের হাঙ্গামা হয়ে গেছে। ট্রেনে ধরা পড়লে আবার—দরকার নেই। কতক্ষণ আর, ক-মাইলের রাস্তা!

বলাই যখন ব্যারাকপুরের রাস্তা ধরে হাঁটছিল তখন রিফুইজি মেয়েটার মুখ বার বার মনে পড়ছিল তার। 'হুঁ, কদিনেই কুমারেশ মেয়েটাকে পটিয়ে নিয়েছে ঠিক। শালা শয়তানের খপ্পরে পড়েছে—না পটে যায়! নতুন শাড়ি সায়া এর মধ্যেই গায়ে উঠবে—তার ওপর ভাল খাওয়া-দাওয়া। তা বাবা যতই পটাক টাকা না পেলে আমি মেয়ে ফিরিয়ে আনব। তার পর—'

চিন্তা করতে গিয়ে বলাই ভুরু কুঁচকায়।

'হ্যাঁ, ওখান থেকে ছাড়িয়ে এনে আর একজনের হাতে তুলে দেব। কলকাতা শহরে আবার মেয়েমানুষের খদ্দেরের অভাব?'

বলাইয়ের কপালটা ঘামতে আরম্ভ করে। হাতের পুঁটলি দিয়ে ঘাম মোছে। 'আমি তোমার পথের দিকে চাইয়া থাকুম—আমি তোমারে না দেখলে অইখানে বেশিদিন থাকুম না—যেদিকে চক্ষু যায় চইলা যামু।'

কুমারেশের ঘরের ভাল খাওয়া ভাল কাপড়জামা পেয়েও যদি মেয়েটা—না না, তা হয় না। মন থেকে দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে বলাই লম্বা পা ফেলে হাঁটে। স্টেশনের ডেরার বাস্তহারা মেয়ে। দুদিনের আলাপ। বয়স কম। চোখে একটু রং লেগেছিল। তা সেই রং কি আজও আছে? হাভাতে ভাত পেয়েছে, হাঘরে ঘর পেয়েছে—যদি পাকা চুল ট্যারা চোখ বলে কুমারেশকে মনে না ধরে তো মনে ধরার মতন ছেলেছোকরাও ব্যারাকপুরে মেলাই আছে—বাব্‌রি চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে বলাই নিশ্চিন্ত হয়।

॥ বারো ॥

আকাশ, বাতাস, গাছপালা আর গঙ্গাকে পাগল করে দিতে ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদ হাসতে আরম্ভ করল। ভাল করে সন্ধ্যা হয় নি। যেন অন্ধকারকে বেশ ভাল হাতে জব্দ করতে অশথ গাছের পিছন দিয়ে আগেভাগে চাঁদ উঠে এল। একটা কোকিল সেই বিকেল থেকে ডাকছিল। চাঁদ দেখে নতুন করে ডাকতে আরম্ভ করল এখন।

এবেলা আর রান্নাবান্না নেই।

পাখির মাংস আর প্রচুর মাছ ওবেলা রান্না হয়েছে। খেয়ে শেষ করা যায় নি। যা রয়ে গেছে এবেলার পক্ষেও সেসব যথেষ্ট। সুতরাং রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা না করে বসন্তের জ্যোৎস্না দেখ, জল দেখ, গঙ্গার নাচ দেখ। জোয়ার আসবে। জোয়ার আসার উল্লাসে নদী নাচতে শুরু করেছে।

'আমার মনে হয় আর দুদিন থাকলে শরীরটা একেবারে সেরে উঠবে।'

'আমি জানি। অথচ খেয়ালই করি নি এতকাল। সেদিন ডাক্তার বলতে খেয়াল হল। গঙ্গার পাড়ে আছি, গঙ্গার বুকে নেমে আসার সুবিধে আমাদের মতন কার আছে?' কুমারেশ অল্প শব্দ করে হাসল। 'তোমার শরীর সারছে শুনে আমার যে কী ভাল লাগছে!'

প্রভা হাসে। দুজন সুজনি বিছিয়ে সামনে গলুইয়ের ওপর পাশাপাশি হয়ে

বসে গল্প করে। মুক্তা ছইয়ের ভিতর। কর্তামা কর্তাবাবুর সঙ্গে বসাটা ভাল দেখায় না। যদিও প্রভা ডাকছিল। কিন্তু কর্তাবাবুর যেন ইচ্ছা ছিল না। 'ভাল, এইডা ভাল।' মুক্তা নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো হাঁটু তুলে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ছইয়ের অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে। বাইরে জল আর চাঁদের আলোর নাচ ভিতরে বসেও সে বেশ দেখতে পায়। ওদিকে—কর্তাবাবুদের দিকে ঘাড় না ফিরিয়ে পিছনের গলুই—যেখানে লক্ষ্মণ মাঝি হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মুক্তা নদী দেখছে। 'এইডা ভাল।' মুক্তা নদীর দিকে চোখ রেখে মনে মনে বলে। 'আইজ পুন্নিমার রাইতে বাবু যেন ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা সোহাগ গিন্নিমার ওপর ঢাইলা দিতে শুরু করছে। কথায় আছে না—মানুষ যত বুড়া অইতে থাকে, পীরিত করবার, রং-ঢং করবার সাধখান বাইড়া যায়।' মুক্তা টের পায় কর্তাবাবু গেলাসে মদ ঢালছে। গেলাসটা কর্তামা হাতে কইরা বইসা আছে। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে গেলাসের পাতলা জিনিস। কর্তাবাবু একবার কর্তামার কাঁধের ওপর মাথা রাখে তার পর আবার মাথা তোলে। মুখ নামাইয়া গেলাসে চুমুক লাগায়। গা হাত পা শিরশির করছিল মুক্তার। আর যাতে একবারও ওদিকে চোখ না যায় তাই মুক্তা সম্পূর্ণ ঘুরে বসল।

'জোয়ারের সময় অইল মাঝি?'

'হুঁ, টের পাও না? জলের ডাক শুনছ?' লক্ষ্মণ অল্প অল্প হাসে। চাঁদের আলোয় লক্ষ্মণের সাদা দাঁত চকচক করে।

'নৌকা মাইজ গাঙে লৈয়া যাইবা?'

'না না, মাইঝ গাঙে এখন না—জোয়ারের মুখে না।' লক্ষ্মণের ঝাঁকড়া চুলে বাতাস লাগে। চুল নড়ে। হাল শক্ত করে চেপে ধরে। 'পরে—এখন তো মাটি ঘেঁষাইয়া নৌকা রাখছি। জোয়ারের ঠেলা কমলে ভরা গাঙে নৌকা ভাসামু, বেড়ামু—'

যেন হাওয়াটা বেশ জোরে বইছে। নৌকা দুলছে।

'চাইপা বও, চাইপা বইসা থাক।'

লক্ষ্মণের কথামত মুক্তা হাঁটু নামিয়ে পাটাতনের ওপর চেপে শক্ত হয়ে বসে। নৌকাটা বেশি দুলছে। সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেছে। 'জোয়ার আইল, জোয়ার আইতাছে।' মেয়েটার অস্পষ্ট মৃদু কথা জোয়ারের ডাকে ভেসে যায়।

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার—হেই হেই—

ধারেকাছে নৌকা নেই। দূরে দূরে সব নৌকা। যেন হাজার মাইল দূরের হাঁকডাক এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটার মতন একবার এসে মিলিয়ে গেল।

'মা! মা!' মুক্তা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। নৌকা কাইত অইয়া যায়, নৌকা—' যেন কর্তামাকেও সাবধান করে দিতে মুক্তা ঘাড় ফেরায়। ঘাড় ফিরিয়ে আর সে ডাকতে পারল না। গলার কাছে এসে ডাকটা আটকে গেল।

কর্তাবাবুর সঙ্গে মুক্তার চোখাচোখি হয়। ছইয়ের অন্ধকারে মুক্তার চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। বাইরে চাঁদের আলোয় কুমারেশের ট্যারা চোখটা জ্বলছে। এক সেকেণ্ডের এই নীরব দৃষ্টি বিনিময়। তার পর মুক্তা দু হাত তুলে চিৎকার করে উঠল: 'এইডা কি করলেন, এইডা কি করলেন— কর্তামারে ঠেলা মাইরা জলে—'

'এই চুপ চুপ হারামজাদী, চেঁচাস নি।' দ্বিগুণ জোরে কুমারেশ ধমক লাগায়। 'গলা বাড়িয়ে জোয়ারের জল দেখতে গিয়ে পড়ে গেল তো আমি কি করব— এই লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ—'

'লক্ষ্মণ—এই মাঝি, মাঝি—' মুক্তা ঘুরে বসে চিৎকার করতে থাকে—'মা পইড়া গেছে গঙ্গায়—মারে ফেলাইয়া দিছে—'

'এ্যাঁ, ইডা কি কও—কি কইতাছ—কোনদিকে পড়ল?' চমকে ওঠে মাঝি। কিন্তু তার হাত দুটো হালের গায়ে তেমনি স্থির অনড় হয়ে আছে। 'আমার চোখে মালুম আইয়ে না, আমি তো দেখছি না।'

'ঐ—ঐ তো শাদা মতন শাড়িখান ঢেউয়ের মাথায় ভাইসা উঠছে!' মুক্তা হামাগুড়ি দিয়ে ছইয়ের বাইরে লক্ষ্মণের পায়ের কাছে গিয়ে বসে। 'তুমি খাড়া অইয়া চাইয়া রইছ কি, নৌকা ঘুরাইয়া হেইদিকে চালাও মাঝি—না না, ঝাপ দিয়া কর্তামারে টাইন্যা তুলবা—'

'আচ্ছা, এই জোয়ারের ঠেলায় জলে নাইমা টাইনা তুলন মুস্কিল আছে— নৌকা ঘুরাইয়া লইয়া যাই—' লক্ষ্মণ ঠাণ্ডা গলায় কথা বলে। আর তার চেয়েও ঠাণ্ডা কঠিন গলায় ওপাশের গলুই থেকে কুমারেশ বলে, 'ঘুরিয়ে নিয়ে নৌকা অশথ তলায় বাঁধ লক্ষ্মণ।'

শুনে মুক্তার বুকের ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আবার তার গলার কাছে কথা আটকে যায়। হাল ধরে লক্ষ্মণ জোরে মোচড় দিয়ে নৌকা ঘোরায়—নৌকা

ডাঙ্গার দিকে এগোয়।

মুক্তা দু হাতে চোখ ঢেকে এবার আর্তনাদ করে ওঠে: 'বুঝছি গো—দুইডা ডাকাতে যুক্তি কইর‍্যা এই কাণ্ড করল—'

'এই, তুই থামবি, তুই চুপ করবি?' কুমারেশ হুমড়ি খেয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে এধারের গলুইয়ে চলে আসে। 'চুপ না করলে মুখে কাপড় ঠেসে দিয়ে—'

'না না—আমার হাত ধইরবেন না—আমার গা ছুইবেন না—' মুক্তা কুমারেশের হাত ঠেলে দিয়ে চেঁচাতে থাকে: 'আমার সব্বনাশ করনের লাইগ্যা এই কাণ্ডডা করতাছে ডাকাইতেরা—আমারে বাঁচাও গো, তুমরা কেডা আছ বাঁচাও—' ঝটকা মেরে মুক্তা গলুইয়ের কিনারে সরে যায়।

'ধর ধর লক্ষ্মণ—তোর গামছা দিয়ে শালির হাত পা বেঁধে নে—'

নৌকা ডাঙ্গায় এসে ঠেকল কি। যেন নৌকা বাঁধতে লক্ষ্মণ দড়ি খুঁজছে। মুক্তা লাফিয়ে জলে পড়ল। পায়ে মাটি ঠেকেছে। মাটি পেয়ে যেতে আর তার ভয় রইল না। দুহাতে জল কেটে কেটে ও ঊর্ধ্বশ্বাসে তীরের দিকে ছুটল।

'চলে যায়—পালিয়ে যায়—এই লক্ষ্মণ!' কুমারেশ মাঝিকে ধমক লাগায়। কিন্তু নৌকা না বেঁধে লক্ষ্মণ ডাঙ্গায় নামে কি করে? তার নৌকা রুখবে কে—স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নেবে।

'শালা অজবুক, আহাম্মক—' কুমারেশ রাগে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে পাটাতনের কাঠ সরিয়ে বন্দুক টেনে বার করে। কিন্তু বন্দুকে টোটা ভরতে হবে যে। আবার নুয়ে হাতড়ে পাটাতনের নিচ থেকে কুমারেশ চামড়ার থলেটা বার করে। বন্দুক রেডি করে কুমারেশ যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন রিফুইজি মেয়েটার ছায়ামূর্তি তীরের ঘন গাছপালার অন্ধকারে মিশে গেছে। তবু ওটাকে শেষ করে ফেলতে হবে। কুমারেশ পরপর দুবার ফায়ার করল।

দুবার চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল মুক্তা, তার পর ছুটল। জঙ্গল জঙ্গল। কাঁটায় তার পায়ের মাংস ছড়ে গেল, কপাল গাল কেটে গেল। ভিজে কাপড়টা গায়ে সপ্‌ সপ্‌ করছে। কাপড়টাও ছিঁড়ে গেছে। ব্লাউজ ফালা ফালা হয়ে গেছে। কিন্তু এসব দেখার সময় নেই। জঙ্গলের ভিতর সেই প্রকাণ্ড পড়ো বাড়ি পিছনে রেখে পাগলের মত ও সামনের দিকে এগোয়। জঙ্গলের শেষে মাঠ। মাঠ জুড়ে ইটখোলা। চারিদিকে ছড়ানো ছোট বড় ভাঙ্গা ইট। ইটের সঙ্গে ঠোকর লেগে তার পায়ের নখ উঠে যায়, যন্ত্রণায়

উঃ করে ওঠে মুক্তা। কিন্তু না, এখনও না—এখানে বসে বিশ্রাম করলে ডাকাতরা এসে ধরে ফেলবে তাকে, গুলি করে মেরে ফেলবে। ওরা পিছনে আসছে কি? ঘাড় ফেরাতেও সাহস পায় না মুক্তা। জ্যোৎস্নাধোয়া বিশাল প্রান্তরের ওপর চোখ রেখে ও ছোটে—ছোটে। ঐ যেন বড় সড়ক না? সড়ক দেখে মুক্তা চিনল। সড়কের পাশে ওটা ছাতিমগাছ না? বুকের ভিতর দুর দুর করছে মুক্তার। আর ভয় নেই। এই সড়ক ধরে ধরে সে চলে যেতে পারবে। আর—

'তুমি কেডা, তুমি কেডা গো!'

বাবরি চুল দেখে মুক্তা মানুষটাকে চিনতে পারল। চিনতে পেরে তার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। গাছতলায় বসে বলাই জিরিয়ে নিচ্ছিল, বিড়ি খাচ্ছিল।

ডাক শুনে ও ঘাড় তুলল। 'অ্যাঁ—এখানে!'

'চিনতে পারছ? চিনতে পার না?' বলতে বলতে মুক্তা বলাইয়ের কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। থরথর করে মুক্তার শরীরটা কাঁপছে।

'কি হল—এমন করছ কেন?' বলাই দুহাতে মুক্তার মুখটা তুলে ধরে।

'আর কথা বলতে পারছে না মেয়েটা। শ্রাবণের ধারার মত কেবল দু চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। কাপড় জামা ভিজে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

'আরে এখানে কি করে এলে?' একটু কড়া স্বরে বলাই প্রশ্ন করল। মারধর করেছিল কুমারেশ দত্ত?'

মাথা নাড়ল মুক্তা। চোখের জল মুছল। আবার জল মুছে। তার পর ধরা গলায় নৌকার সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা বলে গেল।

'তা এখন কোথায় যাবে?' শুকনা গলায় বলাই প্রশ্ন করল। 'কার কাছে?'

মাথা নাড়ল মুক্তা। 'কুথা যামুনা—তুমারে যখন মধুসূদন পাওয়াইয়া দিছে আর যামু কৈ!'

কি একটু চিন্তা করে বলাই। তার পর: 'কিন্তু আমাকে তো যেতে হবে কুমারেশ দত্তর কাছে—আমার টাকা পাওনা আছে, সব আদায় করতে হবে।'

'না, যাইবা না, আমার ওপর রাগ অইয়া আছে—তুমারে পাইলে গুলি ছুড়াইব। অখন পাগলা কুত্তা অইয়া আছে কুমারেশ।'

বলাই আবার চুপ করে ভাবে। মুক্তা তার হাত ধরে নাড়া দেয়।

'উঠ উঠ—আর এইখানে বইয়া থাকুম না—চল এইখান থন সইরা পড়ি—ডাকাইত দুইডা পিছনে আইতাছে আমাগো ধরতে।'

বলাই হঠাৎ উৎসাহ ফিরে পায়।

'কলকাতা যাবে—হেঁটে সবটা রাস্তা যেতে পারবে?'

'না না, কইলকাতা না।' মুক্তা জোরে মাথা ঝাঁকায়। 'অন্যখানে, অন্য দেশে—যেইখানে চিন পরিচিৎ মানুষ নাই—উঠ—দুই চক্ষু যেদিকে যায় চল, হাঁটি দুইজনে হাত ধইরা।'

'তার পর?' বলাই দমে যায়।

'ঘর বাঁধমু। দুইজনে থাকমু।'

'আমার তো কাজকর্ম নেই—খাব কি?'

চোখের জল মুছে মুক্তা এই প্রথম হাসল।

'মধুসূদন খাওন জুড়াইব—তোমারে যখন পাওয়াইয়া দিছে ঠাকুর আর আমার ডর নাই, আর আমার চিন্তা নাই—উঠ উঠ।'

মাথা চুলকায় বলাই। আকাশের চাঁদের দিকে চোখ তুলে অল্প অল্প হাসে। চাঁদ সুন্দর। কিন্তু বলাইয়ের হাসিটা যেন কেমন ঠেকে মুক্তার কাছে। তার বুকের ভিতর কাঁপে। 'কি কও—কি কইতা চাইতাছ?' মুক্তর গলার স্বরও কাঁপে।

'ঘর বাঁধব, দুজনে থাকব—তা—' একটা ঢোক গিলে বলাই শেষ করল: 'কুমারেশের ঘরে তো কদিন কাটল তোমার—কুমারেশ কি একদিনও তোমাকে—'

'হা-রে অবিশ্বাসী পুরুষ!' কপালে করাঘাত করল না মুক্তা, বলাইয়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল, দূরে রাস্তার ওধারেও কত নতুন ঘর উঠেছে, নতুন বাগান পুকুর গোয়াল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, তার পর বলাইয়ের দিকে চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি বাস্তুহারা মাইয়া, আগুনে পোড়া খাইয়া, দেশ ছাইড়্যা আর এক দেশে আইছি ঘর বাঁধমু আশায়—আমি দিমু ঘাটের মরা কুমারেশরে শরীল? ভাল চিন্তাখান আইছে তুমার মাথায়—কেনে ইস্টিশানে খুড়ির ভাই দোষ করছিল কি—কিন্তুক পাইছিল কি আমারে? বলি নাই তুমারে—তার আগে রেলগাড়ির তলায় গলা দিয়া মরমু, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরমু! কথা কও, জবাব দেও আমার কথার—'

আর জবাব নেই। যেন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলাই মেয়েটার ছোট ছোট পা দুখানা দেখে। একটা নখ উঠে গিয়ে এখনও রক্ত বেরোচ্ছে ঝিরঝির।

॥ তেরো ॥

ভাঁটফুলের গন্ধে দেশ পাগল হয়ে গেছে। ফাল্গুনের আর কদিন? চৈত্র এল? বাতাসটা কেমন মিষ্টি লাগছে। বসন্ত যত পাকছে, দক্ষিণের হাওয়ার রস গাঢ় হচ্ছে, তাপ বাড়ছে তত। আর সেই রসালো গাঢ় হাওয়ায় উল্লাসের চাপা গুঞ্জন তুলে মৌমাছির ঝাঁক এসে ছড়িয়ে পড়ছে ভাঁটফুলের জঙ্গলে। মধু চাই, আরো মধু। যেন দস্যুর দল লুট করে নিয়ে যাবে জঙ্গলের সব সুধা।

একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে রতি, রতিকান্ত।

মৌমাছির ঝাঁক ভয় পায়। ফুলের পাপড়ি ছেড়ে আকাশে ওঠে। একশ, দুশ, হাজার, লাখ। গোনা যায় না, অগুণতি। যেন শব্দের একটা প্রচণ্ড ঝড় তুলে পতঙ্গের দল শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। আকাশ কালো হয়ে যায়।

'এই এই তোর কাঁধে বসল দুটো দাদা, তোর কপালের পাশে উড়ছে তিনটে। হুল ফুটিয়ে দেবে এমন, তখন মজা দেখবি।' রতির কাঁধের দিকে কপালের দিকে চোখ রেখে ছোট ভাই মতি চিৎকার করে ওঠে, হাসে।

হাতের আর একটা মাটির ঢেলা জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রতি ছুটে আসে মতির কাছে। ভয়ঙ্কর একটা আক্রোশের আর্তনাদে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে পতঙ্গের ঝাঁক তখন পাগল হয়ে শূন্যে এলোপাথাড়ি ঘুরপাক খাচ্ছে। যেন ওদের এই অস্থিরতা, এই দিশেহারা ভাবটা দেখতে রতিকান্ত ভাঁটের জঙ্গলে ঢিল ছুঁড়ে মারল পর পর দুটো। এখন ছুটে এসে ছোট ভাই মতির কাঁধে হাত রেখে ওদিকে আকাশে চোখ রেখে খিল খিল করে হাসছে। হাসছে আর তাড়া খাওয়া বিব্রত ব্যস্ত ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর মধুলোভীদের মাথার ওপর ক্রমাগত পাক খাওয়া দেখছে।

'দাদা, তুই এখনো ছেলেমানুষ।' মতি বলে।

রতি হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়।

'মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি করা ভাল। না হলে মন চাঙ্গা থাকে না, বুঝলি, পচা ডোবার মত হয়ে আছে জীবনটা মনে হয়।'

দাদার কথা শুনে মতি আর কিছু বলে না।

রতি বলল, 'নে, রোদ চড়ছে, পা চালা।' বলে রতি গাছের গুঁড়িতে বাঁধা পাঁঠা দুটোর বাঁধন খুলে দেয়। মতি কপালের ঘাম মোছে। 'হাট তো এসে

গেছে। ঐ দেখা যায়।'

'তা এসে গেছি। দুটোকে সকাল সকাল বেচে দিয়ে ঘরে ফিরতে হবে না? বাবার বড়ি কিনে সকাল সকাল ফিরে যাই চ।'

'বাবার জন্যে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকলে হয় না?' মতি বলছিল। যেন কথা কানে যায় নি। 'হেট, হেট, হুট।' হাতের মেহেদীর লিকলিকে ডালটা দিয়ে পাঁঠা দুটোর পিঠে দু ঘা বসিয়ে রতি ওদের নিয়ে আগে আগে চলে। মতি পিছনে। রতি ঘাড় ফেরায়। 'কি বললি?'

'হুঁ, অ্যালোপ্যাথিক একজন—' মতি আবার বলছিল, 'ওই শালা বিধু কোবরেজ আমার মনে হয় কিছু না—চারশ-বিশ—মুখে কেবল ফটর-ফটর—'

'এখন সব শালা চারশ-বিশ হয়ে গেছে না!' পাশের বাসক জঙ্গলের ওপর থুথু ফেলল রতি। 'এখন সব ব্যাটা চেনে কেবল কড়ি। অ্যালোপ্যাথিক-কবিরাজ সব সমান।' ছাগলের বাচ্চা দুটো আবার ডাইনে বাঁয়ে মুখ বাড়ায়। রতি বিরক্ত হয়ে আবার হাতের মেহেদীর ডালটা তুলে বাচ্চা দুটোর পিঠের ওপর ধোপার কাপড় আছড়ানোর মত কঘা বসিয়ে দেয়। 'ম্যারে-ম্যারে' করে ছাগল শিশু দুটো চিৎকার করে ওঠে। মেহেদীর কঞ্চিটা আছড়ানোর চোটে ফেটে দুভাগ হয়ে ভেঙ্গে যায়। রতি এবার বাসকের ডাল ভেঙে নিতে জঙ্গলের কাছে থমকে দাঁড়ায়। মতিও দাঁড়িয়ে পড়ল।

যেন কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল সে। মুখের কথা মুখে আটকে গেল তার। রতিও ঘাড় ফেরাল বাঁয়ে। যে পথ ধরে তারা দু ভাই এগোচ্ছিল সেই পথ ধরে অন্য দুজন এগিয়ে আসছে। এদিকে। একটা মেয়ে একটা পুরুষ।

'এই গাঁয়ের নাম কি গো?'

'রাধাবল্লভপুর।' রতি পুরুষটির আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে একটা ঢোক গিলল, তার পর দৃষ্টিটা ঈষৎ আড় করে মেয়েটাকে দেখল।

'কর্তাদের নিবাস?'

চুপ করে রইল দুজন—পুরুষটা, মেয়েটা।

ঘাড় ফিরিয়ে রতি ছোট ভাইকে দেখে।

মতিও দাদার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় এবং দাদার মতন দৃষ্টি আড় করে মেয়েটাকে মাঝে মাঝে দেখে। গরীব মানুষ। দেখেই বুঝল। গায়ে জামা নেই। পরনের শাড়িখানা গলা পর্যন্ত জড়ানো। সঙ্গের পুরুষটার মুখ-ভরতি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। জামাকাপড়ও ময়লা ছেঁড়া।

'যাবেন কোথায় ?' এবার মতি প্রশ্ন করল, পুরুষটার দিকে তাকাল একটু সন্দেহের চোখে। লোকটা বিনয়ের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাসল।

'বড় বিপদে আছি আমরা।' কথাটা বলে বলাই বাসকের জঙ্গলের দিকে একবার তাকায়। যেন কি ভাবে। তার পর এদিকে মুখ ফেরায়। মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকে। মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড জামগাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে। তাই জায়গাটা ছায়ায় ঢাকা। গাছের ডালে পাখিরা কিচিরমিচির শব্দ করে। যেন কান পেতে থেকে মুক্তা পাখির শব্দগুলি শুনল একটু সময়, তার পর মতির চোখে চোখ রাখল।

'আমরা পাকিস্তানের লোক।'

'হুঁ, তা বুঝছি, তা দেখতে পাচ্ছি, পূর্ববঙ্গের ?' মতি না, রতি কথা বলল, 'যাবে কোথায় ?'

'যাওনের জায়গা নাই আমাগো।' মুক্তা একটা ভারি নিশ্বাস ফেলল। মুখ কালো করে বলাই বলল, 'আমরা আগাছা, আমরা সোতের শ্যাওলা। আমাদের কি কোথাও ঠাঁই হয় দাদা ? যখন দেশ গেছে সব গেছে।'

রতি রোদ দেখতে গাছের মাথার দিকে তাকায়। বেলা বাড়ছে। পাঁঠা দুটো হাটে বেচে দিয়ে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। বাপের ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে। তাই সে একটু ব্যস্ত, অন্যমনস্ক। এতক্ষণে প্রায় হাটে পৌঁছে যেত না তারা ?

'তা এখন আপনারা যাবেন কোথায়, এসেছেন কবে দেশ ছেড়ে ?'

'আমরা পোড়া কপাইল্যা দুই ভাই বইন।' মুক্তা বলল, 'দাদা তো কইল-কাতার মানুষ। হুঁ, আমার মামাতো ভাই। আমি দেশ ছাইড়্যা দাদার ঘাড়ে আইয়া পড়লাম।'

'কলকেত্তায় কি করা হয় আপনার ?' মতি বলাইকে প্রশ্ন করল।

'এউকগা দোকান আছে। চলতে চায় না। দিনকাল খারাপ। অখন দাদার চলে না, তয় আমি বেশতি মানুষ একটা আইলাম, দাদা মুশকিলে পড়ছে।' মুক্তা বেশ গুছিয়ে বলে ফেলল।

'তুমি কবে দেশ ছেড়ে এলে ?' রতি সরাসরি মুক্তার চোখ দুটোর দিকে তাকায়। মুক্তা চোখটা নামিয়ে নেয়।

'পরশু।'

বলাই বলল, 'বিধবা পিসীর কাছে মানুষ। বাপ-মা ছোট সময়ে মারা গেছে ৮

তা পাকিস্তানের অবস্থা ভাল না। সমথ মেয়ে সাহস পায় না থাকতে। এক পড়শীর সাথে কলকাতায় এসে পড়ল।'

'ভালই করেছে, ভালই হল।' রতি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল। লোকটির মেজাজ ভাল বুঝতে মুক্তার কষ্ট হল না। তাই সে রতির কথার পিঠে কথা বলল, 'অখন কইলকাতায় দাদায় থাকে দোকান ঘরে—আমারে নিয়া এতবড় মাইয়াছাইলা নিয়া দাদা যে কী করে!'

'আর কোনো আত্মীয়কুটুম্ব নেই বুঝি তোমাদের এদেশে?' মতি বলল, 'দোকানঘরে এত বড় মেয়ে রাখার মুশকিল আছে বৈকি।'

'আত্মীয়কুটুম্ব থাকলেও কি আর এখন চেনা দেয় ভাই—কালীঘাটে আমার আপন জেঠার বাসা আছে। বললাম, মেয়েটাকে রাখেন। নিজের মানুষ, পর তো না। বিপদে পড়েছে। জেঠাইমা চোখ উল্টে কইল—আমাগো চলে না তো একটা বাড়তি মুখ কেমন করে সামাল দিই—' বলাই আঙুল দিয়ে নিজের কপাল দেখায়। 'বুঝলেন গো মশাইরা—অদেষ্ট যখন খারাপ হয়, তখন আপন লোকও পর হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, তা যায় বটে।' রতি থুথু ফেলল, মাথার ওপর জামগাছের দিকে চোখ রেখে কি ভাবল। তার পর চোখ নামিয়ে বলাইয়ের দিকে তাকাল। 'তা এখন কি ঠিক করেছেন আপনারা—একটা কিছু মনে আছে, নাকি, পাগলের মত কেবল পথে পথে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছেন?'

'আমি শহরে থাকমু না। দাদায় কয় কইলকাতার কোনো বাবুর বাসায়-টাসায় আমারে কদিন থাকতে, ঘরের কাজকম্ম করমু, যদি দুই মুঠা ভাত দেয়—কিন্তুক শহরের বাবুগো বাড়িতে থাকতে আমি সাহস পামু না।'

রতি ছোট ভাইয়ের মুখ দেখে। মতিও দাদার চোখের ভিতরে তাকায়। যেন দুজন একসঙ্গে একটা কথা ভাবছে।

'মুক্তা শহরে থাকতে চায় না। এখন খুঁজছি যদি এসব তল্লাটে ভাল কোনো গেরস্থ মানুষের ঘরে-টরে মেয়েটাকে কিছুদিন রাখতে পারি। ঘরের কাজকর্ম সবই জানা আছে বোনটির আমার। এদিকে আমিও দেখি, যদি সুবিধা হয় ধীরেসুস্থে কলকেত্তায় একটা বাসাটাসা করে পরে না হয়—' বলাই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলল।

'তুমি বিয়া-সাদি না করলে তো আর আমারে নিয়া একলা বাসায় রাখতে পারবা না—তোমার অনেক দেরি।' ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে মুক্তা থুতনি

তুলে জামগাছের পাখি দেখে।

'হ্যাঁ, তাও বটে, সেটা একটা মূল্যবান কথা—ভাই হলে কি। সোমথ বোন নিয়ে কি একলা বাড়িতে থাকা যায়? লোকনিন্দা আছে।' রতি বলছিল, মতি মাথা নাড়ল। 'এখন এরা পাকিস্তানের মানুষ। দেশ ভাগ হয়ে এদের সব গেছে—এখন কি আর লোকের নিন্দা প্রশংসা শোনবার সময় আছে এদের? লোকে তো অনেক কিছু নিয়ে নিন্দা করে। লোকের কি খেয়েদেয়ে কাজ আছে কিছু!'

যেন কথাটা শুনে মুক্তা সুখী হল না।

'না গো মশাই—আপনার কথাখানা ঠিক হল না। না অয় লোকের নিন্দায় কান দিলাম না। কিন্তুক কইলকাতার বাসায় আমার একলা থাকতে ভয়। দাদা তো আর ঘরে বইসা থাকবে না। দোকানের কাজে থাকবে চৌদ্দ ঘণ্টা। তখন? চোর ডাকাইত গুণ্ডা বদমাইসে শহরটা ভরতি শুনি। কোনদিন দুপুইরা বেলা ঘরে উইঠ্যা—'

শুনে রতি অল্প হেসে ছোটভাইয়ের চোখের দিকে তাকাল।

'এটা খুব স্বাভাবিক—গাঁয়ে থেকে মানুষ। এখন এতবড় শহরে ডরভয়টা এমনিও একটু বেশি করবে। যদি কিছুদিন কলকেত্তায় থাকত, তবে অতটা হত না।'

'আপনি ঠিক বলেছেন মশাই'—বলাই খুশি হয়ে ঘাড় কাত করল। 'এখন আপনারা বলেন আমি এ অবস্থায় কি করি—আমাদের কি করা উচিত—আমি তো বুদ্ধি ঠিক করতে পারছি না।'

মাটির দিকে চোখ রেখে রতি আবার কি ভাবল। তার পর চোখের ইশারায় মতিকে একপাশে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে কি পরামর্শ করল।

মুক্তা আর বলাইও ফিসফিস করে পরামর্শ করে।

'আচ্ছা ভাই, আমরা হাটে চলছি—আপনারা সোজা চলে যান। হুঁ, শ্রীপুর। রাধাবল্লভপুর শ্রীপুর পাশাপাশি গাঁ। বলবেন আমরা রতি-মতির বাপ মনোহর কর্মকারের বাড়ি যাব। দেখবেন একখানা মস্ত বড় কলাবাগান, পাশে পুকুর। পুকুরপাড়ে মনোহর কর্মকারের বাড়ি; হুঁ, তিনখানা টিনের ঘর, একখানা খড়ের ঘর। খড়ের ঘরের দাওয়ায় বুড়া বসে আছে। বুড়ার সাথে কথা কইবেন না। আমরা হাট থেকে ফিরে যা বলবার বলব, বুঝলেন?'

'আচ্ছা আচ্ছা।' খুশি হয়ে বলাই ঘাড় কাত করল। তার পর মুক্তার

চোখের দিকে তাকাল। মুক্তাও ঘাড় কাত করল। মুক্তা আর বলাইকে একসঙ্গে দু ভাই আর এক নজর দেখে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। ছাগলের বাচ্চা দুটো আগে আগে ছোটে, রতি ও মতি কথা বলতে বলতে পিছনে হাঁটে।

বলাই বলল, 'চল, এগোনো যাক।'

'একটু জিরামু। আর পা দুইডা চলছে না।' মুক্তা ধপ করে জামগাছের মোটা শিকড়টার ওপর বসে পড়ল। জায়গাটা ঠাণ্ডা। বাসক জঙ্গলের সুন্দর একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। যেন জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা হুতুম পাখি হঠাৎ দুবার 'ভুতুম ভুতুম' ডাক ছেড়ে আবার চুপ করে গেল।

বলাই পা ছড়িয়ে মুক্তার পাশে বসে।

একটু দূরে রাস্তাটা দুদিক থেকে বেঁকে আবার যেন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তাই জায়গাটার চমৎকার আড়াল আছে। হাওয়ায় গাছগুলির পাতা নড়ে। খসখস শব্দ হয়। মাথার ওপর জামগাছে অগুনতি নরুন পাখির কিচিরমিচির।

'তাহলে একটা আশ্রয় জুটিবে মনে হয়।'

মুক্তা বলাইয়ের চোখ দেখে।

'সাত দিন, তুমি সাত দিনের সময় চাইছ—তার বেশি কিন্তুক আমি একদিন থাকমু না।'

দুঃখের হাসি হেসে বলাই নিজের কপালে করাঘাত করে। 'একটু বিশ্বাস রাখতে হয়। যদি আমাকে বাস্তবিক ভালবাস, আমার সুবিধা-অসুবিধাটা তোমায় দেখতে হবে না? অবুঝ হলে চলবে কেন?'

'আমি তো অবুঝ না। আমি যদি অবুঝ অইতাম তো তোমারে সাতদিন ? একদিনের সময় দিতাম না। অখন কইলকাতায় আমারে নেওনের মেলা অসুবিধা আছে বুঝি। তবু তুমি কিন্তুক সাতদিন পরে আমারে যেখানে পার আইয়া লইয়া যাইবা। দোকানের পাওনা-টাওনা আদায় করবা। দুই চার টেকা যা পাও অই সম্বল কইরা আমরা ঘর বাঁধমু।'

'হুঁ।' বলাই চোখ তুলে জাম গাছ দেখে আর ভাবে। বলতে গেলে দুজন সারারাত সেই ব্যারাকপুরের গঙ্গার ধারের মাঠ ছেড়ে উত্তর দিক ধরে হেঁটেছে। মেয়েটাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে বলাইকে অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে। একটা দোকানে কদিন সে কাজ করেছিল। কিছু টাকা পাওনা আছে। দেই দেই করে ছ মাস ঘুরিয়েছে। এখন তার টাকার দরকার।

কাজেই একবার তাকে কলকাতায় না গেলে হয় না। মুক্তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে পিছনে পুলিস লাগবে। শিয়ালদা স্টেশনে রাষ্ট্র হয়ে গেছে পাকিস্তানের আর একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে বা পালিয়ে গেছে। কাজেই—

'এরা কুমারেশের মত হবে না। চাষবাস করে। মনে হয় সরল সিধা মানুষ। তুমি কটা দিন থাক এদের বাড়ি।'

মুক্তা ডান হাতটা বলাইয়ের কোলের ওপর তুলে দেয়।

'আমার হাত ধর, হাত ছুঁইয়া কও ফাঁকি দিবা না—আমারে আইয়া লইয়া যাইবা।'

'আবার অবিশ্বাস!' যেন অনেক কষ্টে হেসে বলাই মুক্তার হাতের ওপর হাত রাখে। 'আমি তো তোমারে আনতে কুমারেশের বাড়ি ছুটছিলাম। এখন এদিকে যে এতবড় কাণ্ড ঘটল, এমন শয়তানী করল কুমারেশ আমি কি জানতাম বলো?'

'না, তুমি জানবে কেমনে—মানুষের বাইর দেইখা ভিতর বুঝা যায় না।' মুক্তার গলার স্বর গাঢ়। দু চোখ ছলছল করছে। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি সর্বাঙ্গে। যেন একটা রাতে শরীরটা চুপসে ভেঙে এইটুকুন হয়ে গেছে। একটা গরম নিশ্বাস ফেলল ও। যেন বলাইয়ের কোলের ওপর মাথা রেখে একটু চোখ বুজে থাকলে তার ভাল লাগত। কিন্তু তা বলাই হতে দেয় না। উঠে দাঁড়ায়। মুক্তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'চলো, হাট সেরে দু ভাই এখনি ফিরবে।'

কথা না কয়ে মুক্তা হাঁটে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। পায়ের আঙুলের রক্তটা এখন শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে যদিও। কিন্তু ব্যথা আছে।

॥ চৌদ্দ ॥

লেপাপোছা বিশাল তকতকে উঠোন। উঠোনে সর্ষে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পায়রার ঝাঁক এসে লেগেছে সর্ষের পিছনে। আবার পায়রার পিছনে লেগে আছে একটা বড় বাদামী রঙের কুকুর। কুকুরের গলায় ঘুঙুর সমেত বকলস বাঁধা। তাতে পায়রাদের সুবিধা হয়েছে। ঘুঙুরের আওয়াজ শুনলে পায়রা-গুলো সতর্ক হয়ে যায়। আওয়াজটা কাছে এলেই তারা সর্ষে ছেড়ে উড়াল দিয়ে ঘরের চাল নয়তো উঠোনের ওধারের লাউমাচার ওপর উঠে যায়। অবশ্য সংখ্যায়

তারা অনেক। কুড়ি দু' কুড়ি পায়রা হবে। মরদ আছে, মাদী আছে। সাদা রং, কালো রং, ইট রং, সাদায়-কালোয় চিত্রাল, হরেক রঙের পায়রা জড়ো করেছে রতি-মতি। রতি-মতির কুকুর 'রাজা' আর কয়টাকে তাড়া করবে। রাজা এদিকে তাড়া করলে ওদিকের মাচার পায়রারা উঠোনে নেমে আসে। ওদিকে তাড়া করলে এদিকের চালের পায়রারা উঠোনে নেমে গিয়ে সর্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুক্তা পায়রা ও কুকুরের খেলা দেখছিল। খেলা ছাড়া কি। পোষা কুকুর, পোষা পায়রা। ঐ তাড়া করা, ভয় দেখানো সার। মুখের নাগালের মধ্যে পেয়েও তো রাজা একটা পায়রাকে কামড় বসায় না, কেবল দাঁত বার করে ভেংচি কাটে আর ঘেউ ঘেউ শব্দ করে আর ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ে।

মুক্তার থেকে একটু দূরে আর একটা কাঠের পিঁড়িতে বসে বলাইও কুকুর-পায়রাদের খেলা দেখছিল। এখানে দুজন ভাইবোন। একটু আগে রাস্তায় বাসক জঙ্গলের আড়ালে গাছের মোটা শিকড়টার ওপর গায়ে গা ঠেকিয়ে তারা বসতে পেরেছিল। কিন্তু এখন তা করলে চলবে কেন? উঠোনের এপাশে একটা জলপাই গাছের ছায়ায় দুটো কাঠের পিঁড়ি বিছিয়ে দুজন তাই একটু আলাদা হয়ে বসেছে। রতি-মতির জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

মুক্তার জলতেষ্টা পেয়েছিল। বুড়ী ঠাকরুণকে বলতে বুড়ী ঠাকরুণ বাড়ির ঝি দামিনীকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে এবং তেমনি আবার হাত মুখ নেড়ে ইশারায় ইঙ্গিতে উঠোনে বসা মেয়েটাকে খাবার জল দিতে বুঝিয়ে দিতে কালা বোবা দামিনী রান্নাঘরের কলসি থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে এনে মুক্তাকে দিয়েছে। জল খেয়ে মুক্তা ঘটিটা একপাশে মাটির ওপর উপুড় করে রেখেছে।

খড়ের ঘরের দাওয়ায় একটা বেতের মোড়ার ওপর চুপচাপ যে বুড়ো মানুষটি বসে ঝিমোচ্ছে তার কত বয়স হয়েছে মুক্তা চিন্তা করছিল। এককালে জবরদস্ত পুরুষ ছিল বোঝা যায়। এখনও হাতের কব্জি দুটো কেমন মোটা। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। ভুরুর চুল উঠে গেছে। মাথায় সামান্য যে ক'টা চুল আছে একেবারে দুধের মত সাদা রং। কিন্তু মানুষটা যে অন্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বুড়ী ঠাকরুণ বিধবা। এবং ঐ বুড়োর সঙ্গে বিধবা বুড়ীর চেহারার একটা আদল থাকাতে মুক্তা সহজে অনুমান করতে পারল ওরা ভাইবোন। মেয়ে না। তাহলে বয়সের আরও ব্যবধান থাকত। হয়তো বছরের এ-মাথায় ও-মাথায় ভাই-বোনের জন্ম হয়েছিল। সত্তরের কাছাকাছি হবে বয়স দুজনের। মুক্তা

ভাবে। বুড়ী বুড়োর পিঠে তেল মালিশ করছে। [illegible]তর তেল হবে হয়তো।

রতি-মতি তাদের এ-বাড়ি পাঠিয়েছে শুনে বুড়ী বোবা ঝিকে হাতের ইশারায় ডেকে পিঁড়ি বিছিয়ে দুজনকে বসতে দিতে বলেছে।

'তোমরা বুঝি পাকিস্তানী মানুষ?' বুড়ী মুক্তার গলার আওয়াজে ধরে ফেলেছে সে কোন্ দেশের মানুষ। মাড়ি বার করে হেসেছিল বুড়ী। একটাও দাঁত নেই। কিন্তু বুড়ীর মিষ্টি হাসিটা দেখে মুক্তার গা জুড়িয়ে গেছে। 'বোস না বোন—হুঁ, রতি-মতি হাটে গেছে। বেচে দিতে বলেছি ওই শত্রু। কি দরকার ঘরে পুষে। শেয়ালে খাবে, চোরে তুলে নিয়ে যাবে। আমার রতি-মতি মাংস খায় না। দাদা খায় না। আর আমার তো অবস্থা দেখছই—তিরিশ বছর আগে আতপ চাল বনে গেছি, হি হি হি।' মানে, বিধবা হয়েছে। বুড়ীর কথার ধরন শুনে মুক্তা ঠোঁট টিপে হেসেছে।

বুড়ো একটা কথাও বলে নি। কেবল উঠোনে দাঁড়ানো দুজন নতুন মানুষ, মানে বলাই ও মুক্তার দিকে বোজা চোখ দুটো ও থুতনিটা তুলে ধরে কান খাড়া রেখে ওদের সঙ্গে বিধবা বোনের কথাবার্তা শুনেছে। তার পর থুতনি নামিয়ে লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেছে, 'তারা, তারা, মা ব্রহ্মময়ী!' আর কিছু না। আর একটা কথাও বুড়োর মুখ থেকে শোনা যায় নি।

এখন ভাইয়ের পিঠে তেল মালিশ করা শেষ হতে বুড়ী আবার হাতের ইশারায় বোবা ঝিকে ডাকে। ঝি আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল আর পিটপিট করে একবার মুক্তাকে, একবার বলাইকে দেখছিল। তার পর একসময় কি যেন মনে করে ডান হাতের দুটো আঙুল শূন্যে তুলে, 'আঁ উঁ বিঁ বুঁ' শব্দ করে বুড়ী ঠাকুরুণকে কি বোঝাতে চেয়েছে। বুড়ী ঠাকরুণ বোবার ধরন-ধারণ দেখে একটু সন্দিগ্ধ চোখে মুক্তার দিকে বলাইয়ের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মুক্তাকে প্রশ্ন করে বসেছে: 'এই ছেলে তোমার কে হয়, মা?'

'মামাতো ভাই।' মুক্তা আড়চোখে একবার বলাইকে দেখে পরে সহজভাবে হেসে ঠাকরুণের কথার উত্তর দিয়েছে। ঠাকরুণ নিশ্চিন্ত হয়ে তেমনি হাতের দুটো আঙুল শূন্যে তুলে বোবা যেভাবে আঁ উ বিঁ বুঁ করে কথা বলেছিল সেভাবেই নানারকম আওয়াজ বার করে বোবাকে বুঝিয়ে দিল, মানে, এরা দু' জন ভাই-বোন। বোবাকে বোবার মতন হয়ে কথা বোঝাতে হয়, এবং সেটা যে ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা শিখতে হয়, মুক্তা পরে বুঝতে পেরেছিল। বোবা দামিনীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুক্তাকে কম দুর্ভোগ পোহাতে হয় নি। বুড়ী

ঠাকরুণের কথা শোনার পর দামিনী আর তেমন সন্দিগ্ধ চোখে মুক্তা বা বলাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিল না। ঠাকরুণ দু হাত শূন্যে ছড়িয়ে কি ইশারা করতে দামিনী ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে গামছা নিয়ে এল, তারপর জলের মগ বালতি এনে ঘরের দাওয়ায় রাখল। তেল মালিশ শেষ করে ঠাকরুণ বুড়ো ভাইকে যখন স্নান করানোর কাজটাও প্রায় শেষ করে এনেছে তখন দুপদাপ শব্দ হয় উঠোনে। মুক্তা চমকে ওঠে। রতি-মতি এসে গেছে। হাঁটু অবধি ধুলো দু ভাইয়ের। এক রকম চেহারা, এক রকম শরীর। তবে রতির চেয়ে মতির রং এক পোঁচ বেশি ফরসা। বুড়ো বাপের সঙ্গে কিন্তু দু ভাইয়ের চেহারার একেবারে মিল নেই। 'তবে মার মুখ পাইছে দুগা।' মুক্তা মনে মনে বলল, 'মা সোন্দরী ছিল বুঝি।'

রতি-মতি উঠোনে জলপাই তলায় বসা মুক্তা বা বলাইয়ের দিকে তাকাল না। সরাসরি দাওয়ায় উঠে গেল।

'সকাল সকাল ফিরলি ?' বুড়ী ঠাকরুণ দু ভাইয়ের মুখ দেখে।

'হুঁ।' রতি ট্যাঁক থেকে কাগজের টাকাগুলো বার করে। বার করে এক দুই করে গুণতে আরম্ভ করে। গোণা শেষ হতে আবার সবগুলো এক সঙ্গে তাড়া করে ট্যাঁকে গোঁজে। 'তাও কি উচিত দাম দিতে চায়—সব ব্যাটা যেন বিনি পয়সার খাসি পাঁঠা খুঁজতে আসে হাটে।'

'দাদার বড়ি আনা হয়েছে ?' বুড়ী ভুরু কুঁচকায়।

'না।' মতি বলল, 'সুখেন ডাক্তারকে বলা হয়েছে। ওবেলা আসবে। বুকটা একবার যন্ত্র দিয়ে দেখুক—ও শালা আনন্দ কবরেজের ওপর আমার বিশ্বাস নেই, যা-ই বল পিসি।'

শুনে পিসি চুপ করে রইল।

বুড়োকে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলতে শোনা গেল আর শোনা গেল কাগজের মত খসখসে গলায় দুবার তারা ও ব্রহ্মময়ীকে ডাকতে।

'এরা বসে আছে, কি বলবি বলে দে।' পিসি চোখের ইঙ্গিতে জলপাই গাছের ছায়ায় বসা মানুষ দুটোকে দেখিয়ে দেয়। মতি ও রতি একসঙ্গে উঠোনের দিকে ঘাড় ফেরায়। মতির সঙ্গে মুক্তার চোখাচোখি হয়। রতির সঙ্গে বলাইয়ের চোখাচোখি হয়। মুক্তা চোখ নামিয়ে নখ দিয়ে উঠোনের মাটি খোঁড়ে। বলাই পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রতি ও মতি দাওয়া থেকে নেমে আসে।

'পদবী কি ?'

'আমরা দাস—কায়স্থ দাস।' বলাই নরম গলায় উত্তর করে।

'আমরা কর্মকার।' গম্ভীর হয়ে রতি বলল, 'যাক, জল ছোঁওয়া-ছোঁওয়ি আটকাবে না।' রতি থামল, যেন কি ভাবে সে। মতি মুক্তার চোখে চোখ রাখে।

'রান্নাটান্না সব করতে পার ?'

শব্দ না করে তেমনি হাতের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুক্তা ঘাড় কাত করল। বলাই অসন্তুষ্ট হয়। 'মুখ তুলে তাকাও। উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দোষটা কি।' ছোট একটা ধমক দেয় সে মুক্তাকে। মুক্তা উঠে দাঁড়ায়।

'আমরা জাত কর্মকার হলেও গেরস্ত মানুষ।' রতি বোঝায়। 'চাষবাস আছে। ধান আসবে, তিল সর্ষে ছোলা মটর সবই কিছু কিছু মা-লক্ষ্মীর কৃপায় ঘরে ওঠে। ঝাড়াই মাড়াই আছে, তিল সর্ষে ছোলা মটর রোদে শুকানো আছে, গোলায় তোলা আছে—এসব কাজ একটু আধটু করতে হবে। একটা বোবা ঝি নিয়ে আমরা সব দিক সামাল দিতে পারি না।'

'পারমু।' মুক্তা রতির পায়ের ধুলোভর্তি মাংসের গোছার ওপর চোখ রেখে আস্তে মাথা কাত করে। 'আমাগোও চাষবাস ছেল। ঝাড়াই-মাড়াই রোদে ছড়ানো। ধান কলাই গোলায় তোলনের কাম করার অভ্যাস আছে।'

'তবে আর কি।' এবার বড়র পিছন থেকে ছোট ভাই মতি বলল। 'তা ছাড়া থাকতে থাকতে সব কাজে হাত আসবে, দিশা হবে। কি বলেন ?'

বলাই ঘাড় নাড়ে। 'সব পারবে, সব পারবে।' বলাই এবার বড় করে হাসল, 'একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, আমার বোনের কাজের দিশাখানা খুব আছে।'

'আচ্ছা মশাই, একটু এদিকে আসেন।'

রতি বলাইকে আড়ালে অর্থাৎ উঠোনের লাউগাছের কাছে ডেকে নিয়ে গেল। দেখা গেল রতি নীচু গলায় কি বলছে। শুনে খুশি হয় বলাই, ঘাড় নাড়ে। তার পর বলাই এক পা এক পা করে মুক্তার কাছে এসে দাঁড়ায়। রতিও আসে। রতি একটু দূরে দাঁড়ায়।

'দশ টাকা আর খাওয়া দিতে চায়।' বলাই মুক্তার কানে কানে বলল, 'রাজী হয়ে যাও। এখন আমাদের কুটোটো পেলে তাই কামড়ে ধরতে হবে। বুঝেছ ?'

মুক্তার চোখের পলক পড়ছিল না। মুখে কিছু বলল না। বলাইকে দেখছিল শুধু।

'হুঁ, ঠিক আছে।' বলাই ঘাড় ফিরিয়ে তৎক্ষণাৎ রতি-মতিকে বলে ফেলল, 'একটু দেখে শুনে রাখবেন বোনটাকে। আমি হপ্তায় একবার এসে দেখে যাব।'

'তা, আপনি কি এখনি রওনা হতে চান?'

মতি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। রতি মাথা নাড়ল। 'আরে পাগল, ওবেলা যাবেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবেলা যাবেন। যাও মেয়ে, তুমি ঘরে যাও। পিসি, একখানা কাপড়-টাপড় থাকে তো দাও ওকে বার করে। দামিনী সঙ্গে যাক। পুকুরে গিয়ে চানটা করে আসুক। যাও, তুমি পিসির ঘরে যাও।'

মুক্তা খড়ের ঘরের দাওয়ায় উঠে যায়।

বলাইয়ের আপত্তি টিঁকল না। মতি বলল, 'আসুন এদিকে।'

বলাই মতিকে অনুসরণ করল।

দুজনে বাইরের উঠোনে চলে এল।

চাষবাসের কাজ ছাড়াও কর্মকারদের জাত-ব্যবসা বজায় রাখা হয়েছে। বাইরের টিনের চালায় ঢুকে হাপর, সাঁড়াসী, হাতুড়ি এবং ছোট বড় নানা সাইজের লোহার টুকরো এখানে ওখানে ছড়ানো দেখে বলাই বুঝতে পারে। একপাশে কাঠকয়লার ঢিপি।

'বসুন।'

মতি একটা জলচৌকি বাড়িয়ে দেয়। বলাই বসে।

'নিন, বিড়ি খান।' মতি বলাইয়ের হাতে বিড়ি তুলে দেয়। একটা বিড়ি নিজে ধরায়। বলাইয়ের বুঝতে কষ্ট হয় না দাদার সামনে ধূমপান করার অসুবিধা আছে বলে মতি তাকে এখন তাদের দোকানে ডেকে নিয়ে এল।

সাঁড়াসী দিয়ে হাপরের উনুনের একটা জলন্ত কয়লা তুলে মতি নিজের বিড়ি ধরায় এবং বলাইয়ের বিড়ি ধরিয়ে দেয়।

'কলকাতায় কোথায় আছেন?' মতি প্রশ্ন করল। বলাই মতির চোখের দিকে তাকায় না। বাইরের একটা কাঠমালতি গাছের মাথার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'বড়বাজার।'

'মশলাপাতির দোকান, না কাপড়ের দোকান?'

ঢোক গিলে বলাই বলল, 'মশলার দোকান।' একটু চুপ থেকে পরে সতর্কভাবে মতির চোখের উপর চোখ রাখল বলাই।

'কলকাতায় যাওয়া-আসা হয়?'

'হুঁ।' মতি হাসল। 'নাঃ—কাজ-কর্ম থাকলে দাদা বছরে এক-আধবার

যায়। আমি আমার জীবনে একবার গেছি।'

শুনে বলাই নিশ্চিন্ত হয় এবং মুখটা বিকৃত করে।

'ভাল না। পাড়া-গাঁয়ে অনেক শান্তি। গরীবের কলকাতায় পোষায় না। হা-হা।'

'কলকাতাটা ঠগ-জোচ্চোরের আস্তানা!' মতিও শব্দ করে হাসল।

চোখ বুজে বলাই হাসি মুখে বলল, 'যা বলেছেন মশাই।'—বলাইয়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুপদাপ করে রতি এসে দোকানে ঢোকে।

'কৈ মশাই, উঠুন গো—মাথায় জল দিয়ে দুটো ডালভাত মুখে দিন।'

দাদাকে দেখে মতি বিড়ি লুকিয়ে ফেলে। বলাই উঠে দাঁড়ায়।

আজ কিন্তু বলাইকে বিদায় দেবার সময় মুক্তার চোখে জল এল না। তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। ব্যারাকপুরের বাতাসে যদি ছিল আতা ও আমের বোলের গন্ধ, শ্রীপুরের বাতাস ভারি হয়ে আছে ভাঁটফুলের গন্ধে।

'আমি সাতদিনের বেশি থাকমু না।'

'সাত দিন পরে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।'

রতি-মতি দোকানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বলাইয়ের পিছু পিছু মুক্তা চলে এসেছিল মনোহর কর্মকারের পুকুরের ধারে। পুকুরপাড়ের পাশ দিয়ে সরু পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাধাবল্লভপুরের দিকে। রাধাবল্লভপুরের হাটের দরজায় বাস দাঁড়ায়। 'ঐ বাসে চাপলে বিশ মিনিটের মধ্যে আপনি শিমুরালি রেল স্টেশনে পৌছে যাবেন। সেখান থেকে এক টাকা এক পয়সার টিকিটে একেবারে শেয়ালদা।' রতি-মতি বলাইকে সকাল-সকাল কলকাতা পৌছবার পথঘাট বাতলে দিয়েছে। 'আচ্ছা আচ্ছা'—খুশি হয়ে বলাই মাথা নেড়েছে। আর মনে মনে বলেছে, 'একবার তো তোমাদের চোখের বাইরে যাই তার পর দেখা যাবে শিমুরালি গিয়ে ট্রেন ধরি কি হাঁটাপথ ধরে কলকাতার দিকে ছুটি।'

'এউকগা টাকা তো হাতে নাই, টেরেনে চড়বে কেমনে?' মুক্তা প্রশ্ন করছিল। বলাই বলল, 'সে দেখা যাবে, বারাকপুরের বাজারে আমার জানা-শোনা লোক আছে, দুটো টাকা চেয়ে সেখান থেকে ট্রেনে চাপব।'

'বারাকপুর হাইটা যাইবা?' মুক্তার চোখজোড়া কপালে উঠল।

'করা কি!' বলাই অল্প হাসল।

'কুমারেশের কাছে যাইবা না কিন্তু।' মুক্তা বলাইয়ের হাত ধরল। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নেয় বলাই। 'না, ও এখন পাগল। কুকুর হয়ে আছে তোমাকে না পেয়ে।' হি হি করে হাসল বলাই। মুক্তা অন্যদিকে চোখ সরায়। বুকের ভিতর দুবদুব করে উঠল বুঝি। কথা বলে না।

'চলি।' বলাই পা বাড়ায়।

মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে স্থির হয়ে।

বলাই বনতুলসির জঙ্গলের ওপারে চলে যায়। দেখা যায় না আর ওকে। মুক্তা আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে ফেরে। বলাইয়ের হাসিটা তার ভাল লাগে নি। তবে কি এখনও সে অবিশ্বাস করছে। 'হায় ভগবান, আমি যদি আমার বুকের ভিতরখান খুইল্যা ফাঁক কইর‍্যা বলাইকে দেখাইতে পারতাম।' মনে মনে বলল মুক্তা। এবং আজ সত্যি আর তার চোখে জল এল না। যেন ভিতরের সব জল শুকিয়ে গেছে।

॥ পনেরো ॥

এরা বৈষ্ণব। এদের গলায় তুলসীর মালা। নাকের ওপর এবং কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ছাপ। এ-বাড়িতে জীব-হত্যা পাপ। তাই পাঁঠা নাকি বিক্রি করে দেওয়া হয়। মাসের পর মাস পায়রার ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চাগুলি নিজের মনে বড় হয়। বড় হয়ে তারাই আবার বংশবৃদ্ধি করে। কাজেই পায়রার সংখ্যা কেবল বেড়েই যাচ্ছে। তেমনি হাঁস। হাঁসের সংখ্যাও অনেক মনোহর কর্মকারের। উঠানে বারান্দায় ঘরের পিছনে হাঁস-পায়রার জন্য পা বাড়োনো যায় না। দেখে মুক্তা নিশ্চিন্ত হল, নিঃশঙ্ক হল। মাংস ছাড়া ভাত খেতে পারে না কুমারেশ, আর এবাড়ির রান্নার আয়োজন করতে বসে মুক্তা দেখল লাউ কুমড়া আলু বেগুন ছাড়া আর কিছু নেই।

দামিনী বাইরের লোক। সুতরাং তার জন্য আলাদা একটু শুকনা মাছ কি ডিমটিম হয়। মুক্তা দামিনীর সঙ্গে খাবে কি? না তারও মাছ-মাংসে রুচি নেই। নিরামিষ পছন্দ করে। জীব হত্যা তার কাছেও পাপ।

শুনে বুড়ো ঠাকরুণ দন্তহীন মাড়ি দুটো বার করে হি হি করে হাসল, 'উঠতি বয়স। রক্ত গরম। কচু কুমড়া খেয়ে গতর ঠাণ্ডা রাখতে চাইছে বুঝি মেয়ে।

তো ভাল ভাল। হরিঠাকুর আর একটি কৃষ্ণের জীবকে এনে এ-বাড়ি তুলল।'

রতি-মতি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথাটা শুনল। শুনে হাসল শুধু। শব্দ করল না। এবার আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মুক্তা জোয়ান মানুষ দুটোকে ভাল করে দেখল।

তার বয়স যতই হোক পুরুষের চোখের ভাষা বোঝার অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে। বিশেষ করে কুমারেশের বাড়িতে কিছুদিন থেকে এসে অভিজ্ঞতাটা যেন লাফিয়ে একশ'র জায়গায় দুশ' ডিগ্রি চড়ে গেছে।

না, সেই চোখ না, সেরকম দৃষ্টি না এদের।

মুক্তা বুকের ভিতর শান্তি অনুভব করল। তাই সন্ধ্যার পর রান্নাঘর থেকে যখন বাইরের ঘর মানে সেই কামারশালায় তার ডাক পড়ল, মুক্তা নিঃসঙ্কোচে এক-পা এক-পা করে জোয়ান পুরুষ দুটির সামনে এসে দাঁড়ায়।

হুঁ, উনুনের আগুন নিভে গেছে। হাপরের বাতাস লেগে কেবল ছাই উড়ছে। পাটখড়ি আছে উঠোনে। এক আঁটি তুলে নিয়ে এসে মুক্তা উনুনের আগুনটা তৈরি করে দিক। ওই কোণায় কাঠকয়লা। মুঠো মুঠো করে কাঠ-কয়লা এনে উনুনে দাও। হুঁ, হয়েছে। এইবেলা হাপর চালাও। মুক্তার হাতের প্লাস্টিকের চুড়িটা ঢলঢলে হয়ে গেছে, মেয়েমানুষের হাত শুকিয়ে গেলে যা হয়। কটা দিনের নানা ভাবনা চিন্তায় সত্যি তার চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কোমরটা সরু হয়ে গেছে, হাত-পা শুকিয়ে গেছে কাঠির মতন।

এখন পাট বুনতে মাঠে মাঠে লাঙল পড়বে। দু দিন আগে এ-তল্লাটে চমৎকার বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফাগুনের শেষে এই বৃষ্টি শ্রীবিষ্ণুর আশীর্বাদ। মাঠের মাটি শুকিয়ে পাথর হয়ে উঠছিল। ব্যস, এখন জোর জল হওয়ার পর আর ভাবনা নেই। এইবেলা কষে লাঙল চালাও। কিন্তু লাঙল তো আর সব চাষীর ঘরে তৈরি নেই। ফলা ভেঙে গেছে, কোন লাঙলের হাতল ভেঙে পড়ে ছিল গোয়ালঘরের কোণায়, কারো লাঙলের ফলায় জং ধরে গেছে। এক দু দিনের মধ্যে সব সারাতে হবে। নিয়ে এসো রতি-মতির কাছে। মোহন কর্মকারের কারখানায়। রতি-মতির তাই এখন অবসর নেই। রাত দিন টুং টাং ঠুং ঠাং কাজ চলছে। দরজার বাইরে ঘাসের ওপর সরু মোটা রাজ্যের বাবলা গাছ কেটে এনে জড়ো করা হয়েছে। বাবলার কাঠ চেঁছে র‍্যাদা করে লাঙলের হাতল তৈরি হবে। সে সব পরে হবে, আগে তো মূল যন্ত্র হাপরের আগুনে পুড়িয়ে লাল করে হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে সোজা করতে হবে, ছোঁচালো করতে হবে,

তার পর শানের ওপর ফেলে ধার তুলতে হবে। যেন মাটির বুকে চেপে ধরা মাত্র মাটি ফালা ফালা হয়ে যায়।

হাপরের আগুন মুক্তার ছোট মুখখানাকে রাঙা করে তোলে। একটা লাল শাপলা ফুলের মতন দেখায়। কিন্তু রতি-মতি তো সেদিকে চোখ ফেরায় না। রতি সাঁড়াসী দিয়ে আগুন থেকে লাল টকটকে লোহাটা তুলে এনে আর একটা চৌকো মতন উঁচু লোহার পাটাতনের ওপর চেপে ধরে। মতি হাতুড়ি মারে। ঢং ঢং আওয়াজ ওঠে। দু ভাইয়ের পরনে এখন গামছা। হাত ও উরুর পেশিগুলো ফুলে ফুলে উঠছে মতির, কেঁপে কেঁপে উঠছে খোলা বুকের মাংস। ঢং ঢং ঢনাৎ—লাল লোহার টুকরো আগুনের ফুল হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। গায়ের জোরে সাঁড়াসী চেপে ধরার দরুন রতির চোয়াল দুটো পাথরের মতন শক্ত হয়ে আছে, গলার রগ ফুলে উঠেছে, মনে হয় তুলসীর মালাটা ছিঁড়ে যাবে, বুকটা পাটার মতন কঠিন হয়ে গেছে। ওরা কেউ দেখছে না তাকে, তাই মুক্তা হাপর চালাতে চালাতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জোয়ান দু ভাইকে দেখল।

মতি হাতের লোহাটা পাশে একটা বড় ভাঁড়ে ধরে রাখা ঠাণ্ডা জলে ফেলল। গরম লোহার ছ্যাঁৎ করে শব্দ হল। রতি বিড়ি ধরায়। মতি হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। এমন সময় পিছনের দরজায় এসে দাঁড়াল আর এক মূর্তি। 'বুঁ বাঁ ই ই—'

বোবা দামিনী হাত নাড়ে আর মুখের বিকট ভঙ্গী করে বিদকুটে আওয়াজ বার করে।

রতি হাত নাড়ে। ইশারা করে কি বোঝায়।

দামিনী হাতের আঙল ঘুরিয়ে ঠোঁট নাড়ে, হাঁ হুঁ শব্দ করে।

রতি মুক্তার দিকে চোখ ফেরায়।

'যাও রান্নাঘরে এখন কাজ আছে তোমার।'

দামিনী আর দাঁড়ায় না। যেন একথা বলতেই এখানে এসেছিল। মুক্তা উঠে দাঁড়ায়।

মতি বলল, 'তোমার নামটি যেন কি বলছিলে মেয়ে?'

'মুক্তা।' বলেই মুক্তা হঠাৎ থমকে যায়, তার পর কি ভেবে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'বাঙাল দেশের মেয়ে হলেও মেয়েটি চালাক-চতুর।' রতি বলছিল। মতি বলছিল, 'হুঁ, কিন্তু ভয়ানক বিপদে পড়েছে।'

রতি মাথা নাড়ল।

'দেশ জুড়েই এখন বিপদ। গভর্নমিণ্ট যদি কিছু না করে তো এ সকল লোক যায় কোথায়?'

'গভর্নমিণ্ট কি আর করছে না? এখন রোজ যদি পাকিস্তান থেকে নতুন নতুন মানুষ আমদানি হয় তো গভর্নমিণ্ট কত সামাল দেবে।'

রতি আর কথা না বলে সাঁড়াসী দিয়ে আর একটা টকটকে লাল লোহা আগুন থেকে তুলে আনে, মতি হাতুড়ি তোলে। বাতাস কাঁপিয়ে শব্দ ওঠে ঢং ঢং ঢনাৎ।

রান্নাঘরে দামিনীকে নিয়ে মুক্তা খুব মুশকিলে পড়েছে। নতুন জায়গা, নতুন ঘর। কোথায় তেজপাতা, কোথায় লঙ্কা, কোথায় তেলের ভাঁড়, নুনের হাঁড়ি মুক্তার জানা নেই। এক-একটা জিনিস খুঁজছে আর দামিনীর দিকে তাকাচ্ছে। আর হাত নেড়ে মুখ নেড়ে বোঝাতে চাইছে এটা কোথায় পাব, ওটা কোথায় আছে। যেন মুক্তার অসহায় ভাব দেখে দামিনী মজা পেয়ে হি-হি হি-হি হাসছে আর ছুটে গিয়ে এই হাঁড়ি হাতড়ে, ওই ভাঁড় হাতড়ে তেল-নুন-লঙ্কা-জিরা মুক্তার পায়ের কাছে জড়ো করছে। দামিনীর বয়স কত হবে? পঞ্চান্ন-বাহান্ন? গলা কাঁধ এক হয়ে গেছে চর্বির দৌলতে। বুক-কোমর-পাছা-উরু এমন মোটা হয়ে গেছে যে চলতে ফিরতে দামিনীর কষ্ট হয়। একটু ছুটে এসে হাঁপায়। মুখে অনেকগুলি রেখা পড়েছে। নাকটা মোটা থ্যাবড়া। ভুরু বলতে কিছু নেই। কিন্তু দাঁতগুলি খুব পরিষ্কার। দু পাটি পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁত বার করে দামিনী যখন হাসে তখন মনে হয় দামিনীর শরীর দেখে যতটা বয়স মনে হয় আসলে তার বয়স ততটা নয়। হয়তো চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। কে জানে? মুক্তা রান্নার আয়োজন করতে করতে অনেক কথা ভাবছে। বুড়ী ঠাকরুণ সন্ধ্যাবাতি জ্বালিয়ে আবার সেই ছনের ঘরের দরজার খিল এঁটে ভিতরে বসে বাপের রুগীর পিঠে তেল মালিশ করছে। বুড়ো বক বক করে দু একবার কি বলতে বুড়ী পিনপিন স্বর বার করে দাদাকে কি যেন বোঝাচ্ছে। কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে মুক্তাকে একবার ও-ঘরে উঁকি দিতে হয়েছিল। বুড়ী তো অনেকদিন আতপ চাল বনে গেছে। মুক্তা এ-বাড়ি পা দিয়েই শুনেছে। বুড়ো কতকাল বৌকে হারিয়েছে? নিশ্চয়ই রতি-মতির মা বেঁচে নেই। না হলে বুড়ী পিসি তাদের বাপের সেবা করবে কেন? এই বয়সে বুড়োকে ফেলে বৌ কোথায়

যাবে? 'আচ্ছা রতি-মতির বয়সটা কত অইছে ঠিক।' দামিনী উনুনে আগুন দিয়েছে। উনুনে কড়াই চাপাতে গিয়ে মুক্তার কথাটা মনে হয়। আর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে জোয়ান দুটি ছেলের চেহারা।

'হুঁ, বলাইর থাইক্যা বয়সে ছোড অইব। আঠার উনিশ কুড়ি বাইশ? কে জানে? আমার মনে হয় দুগা ভাইয়ের বয়সের বেশকমখান খুব বেশি না— ঐ পিঠাপিঠি অইছিল।'

দামিনী হাত নেড়ে হুঁ হাঁ করে। মুক্তা মাথা নেড়ে হাত নেড়ে হুঁ হাঁ করে। দামিনী কি বলছে আর মুক্তা কি বুঝেছে তা মুক্তা নিজেই বুঝতে পারে না।—দামিনী হাঁড়ি ভরে চাল নিয়ে এল। তারপর এক হাতের পাঁচটা এবং আর এক হাতের দুটো আঙুল তুলে চোখের ইশারায় হাঁড়ি দেখাল। এবার মুক্তা বুঝল। সাত বাটি চাল ফুটবে এবেলা। 'তা অইলে কজনা লোক খাইব?' মুক্তা মনে মনে হিসাব করে।

রান্নাঘরের পিছনের দিকে জানালা আছে। জানালার বাইরে ঝোপঝাড়। কালচে মতন চাঁদের আলো এসে পড়েছে লতাপাতার ওপর। মুক্তার মনে পড়ল আর একটা বাড়ির রান্নাঘরের কথা। মনে পড়ল আর একটা বাড়ির পুরুষ কেমন হুটহাট রান্নাঘরে ঢুকে মুক্তার পিঠ ঘেঁষে মাথা ঘেঁষে দাঁড়াবার জন্য ছটফট করত। 'কু-চরিত্তির পুরুষ' কুমারেশ আরো কি কি করত মুক্তা মনে করতে চেষ্টা করছিল। না, সেই তুলনায় এবাড়ি অনেক ভাল। এমন চ্যাংড়া বয়সের দুটি ছেলে। একবার ভাল করে মুক্তার চোখের দিকে তাকায় না। রান্নাঘরে যে ওরা কোনকালেই উঁকি মারতে আসবে না মুক্তা বুঝে ফেলেছে। তা ছাড়া এরা কাজের লোক। কুমারেশ অকর্মার ঢেঁকি। না গেলে না হয় তাই দিনে একবার কারখানা দেখতে গেছে। তখনি ফিরে এসেছে। আর সারাদিন কেবল মুক্তার কাছে ঘুর ঘুর। একটা পাগলা কুকুরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তা এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে।

মুক্তার রান্না শেষ হতে অনেক রাত হল। তার চোখে ঘুম এসেছে। বাইরের দোকানঘরে লোহা পেটার আওয়াজ আর শোনা যায় না। কাজকর্ম সারা হল বুঝি দু ভাইয়ের।

দামিনী একটা কেরোসিনের ডিবি জ্বালল।

এবার মুক্তাই প্রথম হাতের ইশারা করে ঠোঁট দেখিয়ে মুখটা দুবার নাড়ল

এবং আঙুল দিয়ে থালা দেখাল। দামিনী ঘাড় নাড়ল। মানে এখন সবাই খাবে। দামিনী হাতের তিনটা আঙুল তুলে দেখায়। মুক্তা বুঝে নেয় তিন থালা ভাত বাড়তে হবে। দামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রান্না নেমেছে, যারা খাবে তাদের খবর দিতে গেল দামিনী। মুক্তা বুঝল। বুঝতে পেরে তিন থালায় ভাত বাড়ল। তিনটে বাটিতে ডাল নিল। আলু কুমড়ার তরকারি ভাতের ওপর সাজিয়ে দিল। বড় ঘরের দাওয়ায় দু ভাই খেতে বসেছে। কেরোসিনের ডিবিটা জ্বলছে সামনে। একটা থামের পাশে বুড়ী বসে আছে। বিধবা বুড়ী কি রাতের বেলায় ভাত খাবে? দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরে বুড়ীকে দেখে মুক্তা দামিনীর দিকে চোখ ফেরায়। দামিনী এসে দুটো ভাতের থালা তুলে নেয়। তারপর থপ থপ করে বেরিয়ে যায়। রতি-মতির সামনে দুটো ভাতের থালা নামিয়ে রাখল দামিনী। রান্নাঘরে ফিরে এসে দামিনী আর একটা থালা তুলে নেয়। তারপর তেমনি থপ থপ করে থালা নিয়ে চলে যায়। মুক্তা উঁকি দিয়ে ওঘরের দিকে চেয়ে থাকে। দামিনী ঘরের ভিতরে চলে যায়। একটা বকর বকর শব্দ হয়। সেই বুড়োর গলা। তা হলে বুঝি ওটা বুড়োর ভাত নিয়ে গেল দামিনী। বুড়ীও এবার উঠে ভিতরে যায়। বাতের রুগীকে বুড়ী বোন ভাত খাইয়ে দেবে হয়তো। মানুষটার কত কষ্ট! মুক্তা চিন্তা করে। এখন মরে যাওয়া ভাল। বেশি পরমায়ু ভাল না। মুক্তার মনে আছে, তার মা বলত বেশি পরমায়ু পাওয়া পাপ। আর সেজন্যই যেন মুক্তার মা সময় হওয়ার আগে হুট করে একদিন চোখ বুজল।

'তুমি এধারে একটু এসো গো মেয়ে।' রতি বাঁ হাত তুলে ডাকে। মুক্তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে রতির। মুক্তা রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে দু ভাইয়ের খাওয়া দেখছিল।

ডাক শুনে মুক্তাকে বড় ঘরের দাওয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় বৈকি।

'একটু নুন নিয়ে এসো।' রতি বলে।

মুক্তা ছুটে এসে রান্নাঘর থেকে নুন নিয়ে যায়।

'বোবা কালা মানুষের হাতে ভাত খাওয়ার মুশকিল কত!'

একটা গরাস গিলে মতি হাসে ও মুক্তার চোখে চোখ রাখে। 'আমাকে একটু জল দাও।'

মুক্তা জলের ঘটি নিতে রান্নাঘরে আসে। দামিনী দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ভার। ড্যাবড্যাব করে মুক্তাকে কলসী থেকে জল গড়াতে দেখছে। কিছু ন'

বলে মুক্তা জল নিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। বুঝতে পারল ও, দামিনী এখন কি ভাবছে। এ বাড়ির রান্না ও পরিবেশনটা তার একচেটে ছিল। এখন মুক্তা এসে কাজে ভাগ বসাচ্ছে। দামিনীকে আস্তে আস্তে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে তাই বুঝি একটু বিরক্ত।

বুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

দু ভাই খাচ্ছে এবং সামনে মুক্তা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বুড়ীর আহ্লাদ হয়।

'একটু দেখবে শুনবে গো মেয়ে—আমার রতি-মতি ভাত খেতে বসে কি আর সুখে খেতে পারে? জল চাই, নুন চাই, আর চারটে ভাত দাও—তা ওই দামিনীকে দিয়ে কি হয়? না শোনে কানে, না পারে কিছু বলতে। দেখছ তো!'

মুক্তা কথা না বলে নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে।

ঘরের ভিতরে বুড়োর গলা শোনা যায়।

'হুঁ, যাচ্ছি।' ধুঁকতে ধুঁকতে বুড়ী ভিতরে চলে যায়। যেন আর দুটো ভাত বুড়ো ভাইয়ের মুখে তুলে সেটা চিবোতে দিয়ে বুড়ী আবার বেরিয়ে আসে।

'আমি তো ভাই নিজে এক ঘাটের মড়া—আছি আর এক ঘাটের মড়াকে আগলে। তার ওপর পারিনে কিছু ধরতে ছুঁতে—'

'হুঁ, তোমাকে এখানে কে ডাকছে বক্তিতা করতে, তুমি ঘরে যাও তো, ঐ শোন বাবা ডাকছে।' রতি ভাতের গরাস গিলে জল খায়।

ভাইপোর ধমক খেয়ে বুড়ী মোটেই দমে না।

'বলি কি আর সাধে। তোদের জন্যে বুকটা পোড়ে। মুখ না খুলে পারিনে। ঘরে আর একটা মেয়েছেলে যদি থাকত, আমি কিছু বলতাম না।' গজ গজ করতে করতে বুড়ী ভিতরে চলে যায়। রতি-মতির ডাল খাওয়া হয়ে গেছে। এখন তরকারি দিয়ে ভাত মাখছে।

মতি ছোট ছোট গরাস তোলে, রতির গরাসগুলো বড় বড়। মতির মাথার চুল ছোট, কিন্তু কুচকুচে কালো আর একটু কোঁকড়ানো। রতির মাথার চুল লালচে, ঝাঁটার কাঠির মত সিধা, খোঁচা খোঁচা।

আর তো কিছু দরকার নেই। দু ভাইয়ের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেল। তবে আর মুক্তা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন! তবু মুক্তা পা বদল করে দাঁড়ায়। জল চাইতে পারে ওরা। রতির গেলাস তো খালি হয়ে আছে। না চাইলেও কি মুক্তা ঘটিটা তুলে রতির গেলাসে জল ঢেলে দেবে? একটু বেহায়াপনা হয় না কি! চিন্তা করে মুক্তা। হয়তো চলেই আসত ও রান্নাঘরে, বুড়ী ধুঁকতে

খুঁকতে বেরিয়ে আসে। যেন রতি-মতির সঙ্গে কথা বলা শেষ হয় নি। বুড়ী পিটপিট করে দু ভাইকে আর একবার দেখে নিয়ে বলল, 'তোর যদি বিয়েসাদি করার মন না থাকে তো ছোটটাকে অনুমতি দে। মতি বিয়ে করে একটা মেয়ে তো ঘরে আনুক।'

'তোমার কি মুখে পোকা পড়েছে পিসি! আমি বিয়ে করব তোমায় বলেছি কোনোদিন? আমি বিয়ে করব না।' মতি ঘাড় তুলে কটমট করে বুড়ীর দিকে তাকায়।

রতি হাসে। ইশারায় মুক্তাকে জল দিতে বলে। মুক্তা রতির গেলাসে জল ঢেলে দেয়। সবটা জল একবারে গলায় ঢেলে রতি ঠক করে গেলাসটা মাটিতে রাখে।

'মেয়েমানুষ পাপ, বুঝলে পিসি—মেয়েছেলে হল গে তোমার যাকে কয় আসল নরক। দুনিয়ার যত অনাছিষ্টি সব মেয়েছেলের জন্যে, হা হা—আমি তো সাফ বলে দিয়েছি বিয়েসাদি হবে না। মতেও করবে না।'

'মুখে ঝাঁটা মারতে হয়, মুখে মুগুর মারতে হয়। পাপ, নরক! তোর মুখ পচে গলে পড়বে না! বলি, তুই কোনখান থেকে এলি, বড় যে মেয়েমানুষের কু-ব্যাখ্যান করছিস হারামজাদা?' বুড়ী রাগে থর থর করে কাঁপে, হাঁপায়।

'তুমি ভেতরে যাও পিসি, ভেতরে যাও—কেন খামকা মুখ খুলতে আস।' মতি শান্ত গলায় বুড়ীকে বোঝায়। 'বাজে কথা বলবে না, আমরাও বলব না।' মতি উঠে দাঁড়ায়, মুক্তার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। রতি হাতের আঙুল দিয়ে এঁটো থালায় দাগ কাটে। যেন কি ভাবে। খোঁচা খোঁচা চুলগুলোর ছায়া পড়েছে পিছনের বেড়ার গায়ে। কেরাসিনের বাতির শিখা হাওয়ায় কাঁপে, নড়ে। রতির চুলের ছায়া বেড়ার গায়ে নাচে, কাঁপে। এক পা এক পা করে মুক্তা রান্নাঘরে ফিরে আসে।

॥ ষোল ॥

বুড়ী ঠাকরুণ নিজের ঘরে আতপ চিঁড়া ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খায়। দামিনী আর মুক্তা রান্নাঘরে বসে ভাত খায়। খেয়ে ধোয়া-মোছা শেষ করতে করতে রাত গভীর হয়। রতি-মতি বড় টিনের ঘরে শোয়। ছোট টিনের ঘরের একদিকটায় কলাই ও সর্ষের বড় বড় গোলা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু পাট আছে একটা কোণায়। আর একদিকে বেড়ার সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কিছু চেরা কাঠ। আম কাঠ না জাম কাঠ, কে জানে। কত কাঠ দেখে এসেছে মুক্তা কুমারেশের বাড়িতে কিন্তু কোন কাঠই সে চিনল না। না গন্ধ শুঁকে, না রং দেখে। কেরাসিনের লম্পটা মেঝের একদিকে নামিয়ে রেখে দামিনী পাটের গাঁটের ওপর থেকে তার বিছানার বাণ্ডিল নামায়। দুটো ছেঁড়া কাঁথা, একটা তেলচিটে বালিশ। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। দামিনীর কাঁথা বালিশের গন্ধ মুক্তা বুঝতে পারে। কিন্তু তা হলেও মুক্তা নাকে কাপড় দেয় না। বোবা বুঝে ফেলবে মুক্তা ওকে ঘৃণা করছে। এটা খারাপ। এই ঘরে দামিনীর সঙ্গে তাকে শুতে হবে। অবশ্য মুক্তার জন্য বুড়ী ঠাকরুণ নিজের ঘর থেকে বালিশ কাঁথা বার করে দিয়েছে। মুক্তা বিছানার বাণ্ডিলটা মেঝের ওপর রাখে। একটা ঝাঁটা টেনে বার করে দামিনী সর্ষের গোলার পিছন থেকে। খুব মনোযোগ দিয়ে ও মেঝেটা ঝাঁট দেয়। একবার দুবার তিনবার। না, হল না। আবার ঝাঁট লাগায় দামিনী। যেন এতটুকু ধুলো বালি কোথাও থাকলে দামিনীর এমন চমৎকার বিছানা মানে ময়লা কুটকুটে ছেঁড়া কাঁথাটা বিছাতে কষ্ট হবে। মুক্তা নিজের মনে হাসে। হাসতে গিয়ে কিন্তু তার বুকের ভিতরটা কেমন ধ্বক করে উঠল। তার কাঁথা বালিশের চেহারাও খুব সুবিধার নয়। না হল, তা বলে কি তার ঘুম হবে না! ময়লা কুটকুটে বিছানায় এখনি গা এলিয়ে দিয়ে দামিনী চোখ বুজবে আর এক ঘুমে রাত ভোর করবে। রাতের পর রাত দামিনী পরম নিশ্চিন্তে এই গুদাম ঘরে ঘুমিয়ে আসছে। মুক্তা ফরসা ধবধবে বিছানা পেয়েছিল, তক্তাপোশ পেয়েছিল। কিন্তু কটা রাত ও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছে কুমারেশের ঘরে! বরং এখানে মাটির ওপর ময়লা কাঁথা বালিশে শুয়ে তার রাত কাটবে ভাল।

দামিনী দাঁত দিয়ে সুপুরি ভাঙে। কট কট শব্দ হয়। খাওয়ার পর মুখ-

শুদ্ধি চাই। তাই একটা গোটা সুপুরি দামিনী মুখে ফেলে দেয় আর কটাস কটাস শব্দ করে সেটা ভোঙে।

মুক্তা এবার নিজের বিছানা পাতে। দরজায় খিল এঁটে দিয়ে বিছানায় এসে দামিনী আঙুল দিয়ে লম্ফটা দেখায়।

কিন্তু—কিন্তু—মুক্তা ইতস্তত করে এখনি আলো নেভাতে।

শেয়ালদা স্টেশনে থাকতে তার এ-অভ্যাস ছিল না। অভ্যাসটা হয়েছে কুমারেশের বাড়িতে এসে। রাত্রে দরজায় খিল এঁটে বিছানায় বসে আরশি দিয়ে মুখ দেখা। মাথায় একটু চিরুনি বুলোনো। তাই এখন আলো নেভাবার আগে মুক্তা বিছানার ওপর চুপ করে বসে থাকে। তাকায় এদিক ওদিক। রতি-মতি তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত আলো দেখাতে আসে নি, স্নানের আগে হাতে সুগন্ধ তেল ঢেলে দেয় নি, আরশি চিরুনি দেয় নি মুখ দেখতে, চুল আঁচড়াতে। দেয় নি বলে মুক্তা হাল্কা বোধ করছিল। ভাল লাগছিল তার। কিন্তু দামিনীর কি একটা ভাঙা চিরুনি-টিরুনি নেই, চটা-ওঠা এক-আধ টুকরো আরশি? একবার যদি ও মুখখানা দেখতে পারত, চুলটা একটু ঠিক করে নিতে পারত, আর কিছু চাইত না ও। এক ঘুমে রাত কাটত মুক্তার। মুক্তা দামিনীর দিকে তাকায়। দামিনী হাত দিয়ে নিজের খোঁপা ঠিক করে। মুক্তা হঠাৎ মুখের সামনে দুটো হাত মেলে ধরে চোখের ইশারায় দামিনীকে আরশির কথা জিজ্ঞেস করে। দামিনী বোঝে। বুঝতে পেরে ফিক করে হাসে। তার পর মাথা নাড়ে। মাথা নেড়ে চোখ বড় করে হাত নাড়ে, ঠোঁট নাড়ে। কি ব্যাপার। দামিনী মুক্তার চোখের সামনে দুটো আঙুল মেলে ধরে। দুটো আরশি ছিল ওর। মুক্তা বুঝে নেয়। তার পর? দামিনী পায়ের গোড়ালিটা মেঝের ওপর দুমদুম করে দুবার ঠুকে দেখায়। কি? দুটো আরশি ও ভেঙে চুরমার করেছে পা দিয়ে ঠুকে। কেন? যেন হঠাৎ কঠিন রাগে দামিনীর চোখ দুটো জলে উঠল। ভাঙা আরশির টুকরোগুলো মেঝে থেকে তুলছে এমনভাবে ও দু হাতের দশটা আঙুল মেঝের ওপর তড়বড় করে নাড়ে, গুটোয়, তার পর চোখের ইশারায় পিছনের জানালাটা দেখিয়ে ও দু হাত জড়ো করে সব কটা ভাঙা টুকরো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ইঙ্গিত করল।

কিন্তু কেন? আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মুক্তা ভাবে। তবে কি এবাড়ির কোন মানুষ দামিনীর আরশিতে মুখ দেখা নিয়ে ওকে গালমন্দ

করেছে? আর রাগ করে দামিনী আরশি ভেঙেছে? কিন্তু কে সেই মানুষ? রতি-মতির কথাটা মনে পড়ল মুক্তার। মেয়েমানুষ নরক—অনাছিষ্টি যত দুনিয়ায় সব মেয়েছেলের জন্য। তাহলে দামিনীকে দু ভাই দেখতে পারে না? তাহলে—

কেন জানি মুক্তার মনে হল রতি বা মতি দামিনীকে আরশি দিয়ে মুখ দেখতে, চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে বারণ করেছে। এমনি মেয়েমানুষকে নিয়ে সংসারে হাঙ্গামা লেগেই আছে, তার ওপর যদি ওরা সেজেগুজে থাকে—

তাই দামিনীর চুলের এই চেহারা, মুখের এই অযত্ন!

বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ভয় ডেলা পাকিয়ে রইল মুক্তার। তবে তো আর তার এখানে মাথায় চিরুনি চালানো চলবে না, একটু সোডা-সাবান বুড়ী ঠাকরুণের কাছে চেয়ে কালো পরনের কাপড়খানা কেচে নেবে মুক্তা ঠিক করেছিল, কিন্তু তা করা কি ঠিক হবে? ফরসা কাপড় পরতে দেখলে রতি-মতি রাগ করবে। তাই তো দামিনীর পরনের কাপড় এত ময়লা। তবে দরকার নেই এ-সবের। মুক্তা ভাবে। যেমন আছে, তেমন থাক। কদিন আর। সাতটা দিন কোনমতে চোখ বুজে কাটিয়ে দেবে ও। তার পর তো বলাই আসছেই। তার পর—

হুস্-হাস্ নাক ডাকছে দামিনীর। শরীর ক্লান্ত। কিন্তু ঘুম আসতে চাইছে না মুক্তার। দু-তিনবার ও এপাশ-ওপাশ করল। তারপর একসময় চিৎ হয়ে শুয়ে কান খাড়া করে রাখল। পাশে হাঁসের ঘর। এর মধ্যে হাঁসগুলি একসঙ্গে দুবার প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে ডেকে উঠেছে। এখন আর শব্দ করছে না। একটা পায়রা কোথায় যেন মোটা গলায় বকবকম করছে। পায়রার পাখার ঝাপটা শুনল মুক্তা। কুমারেশের ঘরে শুয়ে প্রথম রাত্রে মুক্তার ভীষণ কান্না পেয়েছিল বলাইয়ের কথা ভেবে। এখনও সে বলাইকে ভাবছে। কিন্তু তেমন কান্না পায় না তো। আর যতবার সে বলাইয়ের চেহারাটা মনে করছে ততবার—বরং যেন আরও বেশি—মতির চেহারা, রতির চেহারা তার চোখের সামনে ভাসছে। দোকানঘরে রতি-মতির গামছা-পরা মূর্তি দুটোকে যেমন সে দেখেছিল, অবিকল সেই মূর্তি নিয়ে দু ভাই তার সামনে এসে দাঁড়ায়। রতির হাতের মাংস, বুকের মাংস ফুলে উঠেছে। মতি হাতুড়ি মারছে। তার পায়ের মাংসের গোছা, চওড়া শক্ত কাঁধ, কোঁকড়া চুল অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে মুক্তা পরিষ্কার দেখতে পায়। জোর করে মুক্তা চোখ বুজল আর মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল, 'না, এইডা ভাল না, এইডা ভাল না! আমি বলাইরে চাইছি। বলাই আমার পুরুষ। অন্য পুরুষের মুখ চিন্তা করা আমার পাপ। মধুসূদন, মধুসূদন!'

আর বলাই ভাবছে, 'বেঁচে গেলাম বাবা, এক জায়গায় তো গছিয়ে দিয়ে এলুম। এখন মরুক বাঁচুক, আমার মাথা ঘামিয়ে দরকার কি!'

বলাই হন হন করে হাঁটে। এখন তার নিজের চিন্তা। আপাতত একটা আশ্রয় চাই তার। উল্টাডাঙ্গার রজনীর কাছে যাবে কিনা বলাই একবার তা-ও ভাবল। চোলাই-টোলাইএর কারবারে আর থাকবে না সে। পুলিস চিনে ফেলেছে। বরং রজনী বলছিল রেলের ওয়াগন থেকে এখন কিছু কিছু জিনিস তারা সরাতে পারছে। যদি বলাই দলে থাকে, থাকতে পারে। বখরা একটা খুব বেশি এখনই সে আশা করতে পারে না, তবে থাকতে থাকতে যদি কিছু—

রজনীর সঙ্গে দেখা করা বলাই ঠিক করে ফেলল। 'না-না, মেয়েমানুষে এখন আমার দরকার নেই বাবা, শহরে মেয়েছেলের অভাব আছে নাকি কিছু! সন্ধ্যার দিকে তুমি একবার শেয়ালদার ওদিকটায় দাঁড়াও না—অনেক জুটবে। আসল হল পয়সা। তা চাল নেই, চুলো নেই তোমায় আমি গলায় বেঁধে কোথায় ঘুরব। তাছাড়া বাবা তুমি ইস্টিশান থেকে পালিয়ে আসা মেয়ে। থাকতে হলে অজ পাড়াগাঁয়ে তোমায় নিয়ে থাকতে হবে। সে আমার হবে না—কলকাতা শহর ছাড়া আমি পয়সাও রোজগার করতে পারব না, আর মনেও শান্তি পাব না। থাকো বাবা ছ মাস ছ মাস যেখানে দিয়ে এসেছি। যদি বেশী সতীত্ব করো তো কপালে আরো দুঃখু আছে। এমন একটা চমৎকার পয়সাওলা মানুষ কুমারেশকে তোমার মনে ধরল না। দেখ, এখন যদি জোয়ান দুটো ভাইয়ের একটাকে ধরতে পার। চাষী মানুষ ওরা। চোখে কুমারেশের মতন দিন রাত রঙের ফুল দেখছে না, কিন্তু যদি একবার দেখতে শুরু করে, বিপদ আছে—' কথাটা চিন্তা করে বলাই নিজের মনে হাসল, 'চাষাভূষো আর জঙ্গলের ভীমরুল এক। ও শালা যদি একবার গোঁ ধরে উপায় নেই। সাত হাত জলের নীচে লুকিয়েও তুমি রক্ষা পাবে না সোনা—সাত হাত জলের নীচে গিয়ে তোমায় কামড়ে ধরবে।'

না, বলাই এটাও চিন্তা করছিল, যদি মুক্তা রাজী থাকত, বলাই তাকে না হয় কলকাতায় ফিরিয়ে আনত। 'হুঁ, পালিয়ে গিয়েছিলাম, আবার চলে এসেছি। কেন? রসের নাগর আর রাখল না। রাখল না তো এবার কোন বাড়িউলী মাসীর কাছে যাও—কাকা বলত, এখানে আমাগো ডেরায় তোমার জায়গা হবে না।' মুক্তা কাঁদত? বেশ তো, একটু লোক-দেখানো কান্নাকাটি করে না হয় আবার রাস্তায় নামত। আর বলাই তাকে তখনি নিয়ে যেতে

পারত ক্যানিং স্ট্রীটের সেই মাদ্রাজী রেস্টুরেন্টে। যেখানে মেয়েমানুষ রাখা হয় খদ্দেরকে চা-খাবার পরিবেশন করতে। দোকানে কাজ করত মুক্তা, আর একটা বস্তির ঘর-টর ভাড়া করে থাকতে পারত। যাকে বলে প্রাইভেট হয়ে থাকা আর কি। এদিকে বলাই রাতের খদ্দের জোগাতে পারত। একজন? এমন দশ-বিশজনকে বলাই এই শেয়ালদা থেকেই ধরে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু মুক্তা তো সে-সব চায় না। 'আমায় বিয়ে কর, ঘর বাঁধ, ছেলেপুলে দাও—'

চিন্তা করতে করতে বলাই শিউরে উঠল। 'বেঁচে গেছি বাবা, বেঁচে গেছি —ও তো মেয়ে নয়—কচ্ছপ, শালা কামড়ে ধরলে আর ছাড়তে চায় না। এখন বোঝ ঠ্যালা!'

বলাই হন হন করে কলকাতার দিকে এগোয়।

॥ সতেরো ॥

নরক। পাপ। কথা মুক্তা কিছুতেই ভুলতে পারে না। তাই এখানে এসে যদি বা মুক্তা সরাসরি দু ভাইয়ের চোখের দিকে মুখের দিকে তাকাতে পেরেছে, সেদিন পিসির সঙ্গে তাদের কথাবার্তা শোনার পর থেকে দু ভাইয়ের চোখে চোখ রাখতে পারে না ও। ওদের মুখের দিকে তাকাতে গেলে তার চোখের পাতাদুটো হাওয়ায় দোলানো বাঁশপাতার মত কাঁপতে থাকে। কেবল কি চোখের পাতা—যেন পা দুটোও কাঁপতে থাকে মুক্তার। হাত কাঁপে। তাই সেদিন মতির কাছে ধমক খেতে হল।

'তুমি কি ভাদ্দর-বৌ, যে অমন মিনমিনে পিনপিনে গলায় কথা বলছ মেয়ে— উঁহু, একটা বোবাকে নিয়ে আমাদের চলে না, কজে-কর্মে নানা অসুবিধে। এখন তোমায় যদি পাঁচবার একটা কথা জিজ্ঞেস করে উত্তর জানতে হয়, চারবার বললে তবে মুখের দিকে তাকাও, তবে তো আমাদের—'

ছোট ভাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রতি বলে, 'তবে তো আমাদের আর একটা লোক রাখতে হয়।'

'মানে, গুড়ের লাভ পিঁপড়েয় খাক—' মতি গলা চড়িয়ে দেয়। 'শালার দোকানের কাজ-কারবারের তো এই অবস্থা, ধান-কলাইয়ের তো এই ফলন। এখন যদি ঘরের কাজেই তিনটে মানুষ রেখে খোরাকি দিতে হয় তবে—'

রতি আবার ছোট ভাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নেয়।

'তবে আমাদেরও শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠতে হবে।' দাদার কথা শুনে মতি মাটির দিকে চোখ রেখে অল্প অল্প হাসে। কিন্তু হাসির বান ডাকে বুড়ী পিসির গলায়। হি-হি হি-হি। বুড়ী ঘরের দাওয়ায় বসে ভাইয়ের পিঠে তেল মালিশ করছে। রতি-মতি আর মুক্তা উঠোনে সর্ষে ছড়াতে ব্যস্ত। গনগনে রোদ উঠেছে উঠোন ভরে। পায়রার ঝাঁক উড়াউড়ি করছে, ফাঁক পেলে সর্ষের ওপর এসে বসছে, কুকুরটা এক-একবার ছুটে ছুটে যায় আর পায়রাগুলো একসঙ্গে ফুলের মত চারিদিকে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, বেগতিক দেখলে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। ওদের পাখার ঝাপটায় ধুলো উড়ছে। বাঁক দিয়ে টেনে টেনে মতি আর মুক্তা যখন সর্ষে চেলে দিচ্ছিল তখনও কম ধুলো উড়ছিল না। মতি একটা ছেঁড়া বস্তা সেলাই করতে বসে গেছে। ধুলোয় মুক্তার চুল মুখ গলা পা হাত দুটো সাদা হয়ে গেছে। হঠাৎ চেনা যায় না মেয়েটাকে। রতি-মতির চুলে পিঠেও কম ধুলো লাগছে না। চওড়া পিঠ দুটো ধুলোয় আর ঘামে চটচটে হয়ে আছে। রতির কথা শুনে বুড়ী হাসছিল। হাসির ধমক কমতে বুড়ী খনখনে গলায় বলল, 'তা বাপু, একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে দে—নতুন এয়েছে, সব কাজের কি দিশা হয়েছে এখনই। আর ওইটুকুন তো মেয়ে।'

মুক্তার দিকে বিরক্তিভরা আর একটা দৃষ্টি হেনে রতি গজগজ করে কি যেন বলে বোঝা যায় না।

মতি বলে, 'এটা বাজে কথা পিসি—কথায় বলে যার না হয় ন বছরে, তার হয় না নব্বুই বছরে—কেন, জলধরদার মেয়ে কি ওর চেয়ে ছোট? গিয়ে দেখ কেমন টনটনে বুদ্ধি রাখে, দিশা রাখে ঘর-গেরস্থির কাজেকম্মে।'

জলধর মোহন কর্মকারের প্রতিবেশী। পিসি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। তার পর: 'দেশবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, মনটা মাঝে মাঝে খারাপ থাকে আর কি।' মুক্তার ধূলিমাখা মুখটা একবার দেখে নেয় বুড়ী। বুড়ীর চোখে মমতা: 'একটু চালাক-চতুর হতে হবে গো মেয়ে—হাত-পা চালিয়ে কাজ না করলে কুলোতে পারবে না সব দিক। ওদিকে আবার রান্নাঘরে দামিনী কি করছে কে জানে।'

অন্ধ মোহন কর্মকার সব শোনে এবং যেন সব কথার সব সমস্যার সমাধান চাইতে গিয়ে শুকনো [illegible] ওপরের দিকে তুলে দিয়ে বুড়ো নিশ্বাস ছেড়ে ফিসফিসে গলায় ডাকে, 'তারা—ব্রহ্মময়ী!'

মুক্তাকে এবার একটু চালাক-চতুর হতে দেখা যায়। তড়বড় করে হাতের বাঁকটা নেড়ে নেড়ে সর্ষে ছড়ায়। রতি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, বিশ্রাম করে। ঘাড় ঘুরিয়ে থুথু ফেলে। ঘাড় সোজা করে মুক্তার কাজ দেখে। এবার আর রতির চোখে ততটা বিরক্তি নেই, বরং মেজাজটা যেন একটু ঠাণ্ডা হতে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ! বাঁক দিয়ে সর্ষে টানতে টানতে মুক্তা চলে গেছে মতির পায়ের গোড়ালির কাছে। পা দুটো অবশ্য মতি তখনি গুটিয়ে নেয়। কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ওদিক থেকে রতি ভয়ঙ্কর চটে যায়। 'বলি, মানুষের গায়ের ওপর দিয়ে ওটা টানতে হবে নাকি—নাকি আমার উঠোনে জায়গা কিছু কম আছে? আচ্ছা মজার লোক জুটেছে তো আমাদের জন্যে।'

ধমক খেয়ে মুক্তার হাতের বাঁক স্থির হয়ে যায়। বুঝি হাত থেকে ওটা পড়েই যাবে। দেখে বুড়ী খনখনে গলায় হাসে, কাশে। মতি তার হাতের বস্তা, পাটের লাছি, ছুঁচ ইত্যাদি নিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি সরে বসছি ওধারে।' বলতে বলতে মতি ঘরের দাওয়া ঘেঁষে একটা জায়গা বেছে নিয়ে ধপ করে মাটির ওপর বসে পড়ল।

'নাও, এইবেলা প্রাণ খুলে সর্ষে ছড়াও—বলি, একবার বলতে হবে তো মানুষটাকে সরে বোস—না কি জিভ নড়ে না—আঠা হয়ে আটকে গেছে তালুর সঙ্গে।' রতি শব্দ করে থুথু ফেলল এবং কটমট করে মেয়েটাকে আর এক নজর দেখে নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে উঠোন পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলল।

বোঝা গেল বিড়ি ধরাতে রতি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। দামিনীর উনুনের আগুন থেকে বিড়ি ধরানো হবে। রতি পিছন ফিরতে মুক্তা স্বস্তিবোধ করে—হাত-পা দুটো আবার স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়। বাঁক টেনে টেনে ও সর্ষে ছড়ায়। পায়রার পাখার ঝাপটায় ধুলো ওড়ে। কুকুরটা লাল জিভটা ঝুলিয়ে দিয়ে কি ভেবে যেন উঠোনের একধারে চুপচাপ বসে থাকে।

'রাগী, এমনিতে খুব রাগী মানুষটা।' ভাইয়ের পিঠে তেল মালিশ করা শেষ করে এনেছে বুড়ী। উঠোনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মুক্তাকে দেখে। 'না'লে আমার রতির ভেতরটা সোনা—যারা একবার রতির মেজাজ বুঝে নিতে পারে তাদের আর ডর নেই ওকে দিয়ে—তারা ওর বুকের মাঝখানে বাসা তৈরী করে থাকতে আরম্ভ করে—হি-হি।'

পিসির কথা বলার ধরন শুনে মতি হা-হা করে হাসে আর মুক্তাকে দেখে। মুক্তার মুখ মাটির দিকে। মাটিতে ছড়ানো কোটি কোটি ধূসর লাল সর্ষের মধ্যে

তার দৃষ্টি হারিয়ে গেছে। কিন্তু মতির দরাজ গলার হাসিটা ও শুনতে পায় ঠিক। যেমনভাবে শুনতে পেয়েছে বুড়ীর কথা। 'বুকের মাঝে বাসা তৈরি কইরা থাকে—বুকের মধ্যিখানে।' কথাটা ভাবতে ভাবতে মুক্তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন মোচড় দেয়। বেতঝোপের অন্ধকারে বুকের ভিতর বাবুই-টুনটুনিরা যেমন বাসা বাঁধে? এমন একটা সুন্দর কথা মুক্তা এতকাল খুঁজে পায় নি। যেন খুঁজছিল। এখন পেয়ে গেল। একটা মানুষের বুকের অন্ধকারে বাসা তৈরি করে টুনটুনি পাখি হয়ে থাকা। বলাইয়ের বুকের ভিতর টুনটুনি হয়ে থাকতে চাইছে না মুক্তা! মুক্তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। জল না। ধুলো উড়ছে রাশি রাশি। চৈতালী ঘূর্ণি আরম্ভ হল। মুক্তা চোখ বন্ধ করে।

'সামাল! সামাল!' হৈ-হৈ করে রতি-মতি চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার করতে করতে অবশ্য ঘূর্ণির পাক থেকে যায়। গনগনে রোদ। খটখটে আকাশ। তা হলেও যদি ঘূর্ণির মত ঘূর্ণি আসে একখানা, তবে সর্ষে তো বালি হয়ে আকাশে উড়বেই—গোটা মানুষটাকে যে উড়িয়ে না নেবে তার ঠিক কি। ঘূর্ণির পাক কমলে মুক্তা আবার চোখ খোলে।

॥ আঠারো ॥

মুক্তার ভয় কাটল শেষ বেলায়। কিছুটা কাটল। তখন রোদের রং ফিকে হয়ে গেছে। ঠাণ্ডামতন বাতাস ছেড়েছে। যেন কোনদিকে বৃষ্টি হয়েছে। 'এখন জোর পানি হওয়া ভাল, পাটবোনার সময়।' মুক্তা ভাবছিল। চাষবাসের কথা তার খুব বেশি মনে পড়ছে। যেন আবার সে তার দেশের গাঁয়ে আছে। শিয়ালদার জীবন, কুমারেশের ঘরের কটা দিনের জীবন এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও ভুলে গেল নাকি। অনেকটা তাই। বারাকপুরে তবু কল-মিল স্টেশন-গঞ্জ আর রিফিউজীদের নতুন নতুন ঘরবাড়ি হয়ে শহুরে চেহারার মধ্যেও কিছুটা গাঁয়ের স্বাদ সে পেয়েছে, শিয়ালদায় তার ছিটেফোঁটা ছিল না। যেন একটা দম-আটকানো বন্ধ এঞ্জিন-ঘরে ও ছিল; কিন্তু এই জায়গা—শ্রীপুর রাধাবল্লভপুরের মাটি-আকাশ একেবারে ফাঁকা। হুঁ, জঙ্গল আছে, ঝোপঝাড় আছে। বাসক-বনতুলসি-বাবলা-তেঁতুল-আশশ্যাওড়ার জটলা পায়ে পায়ে ঠেকে। ঝোপঝাড় শেষ হতে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত। যতদূর চোখ যায়। না, উদ্বাস্তু

নেই, যেন তারা এখনও খবর পায় নি ঘর বাঁধার, চাষবাস করার হাজার হাজার বিঘে জমি পড়ে আছে এখানে। কেমন একটা রিক্ত শ্বাসচাপা ভাব চারদিকে। মুক্তার ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল, আবার লাগছিলও না। কেন এত ফাঁকার মধ্যে এসে মাঝে মাঝে কেমন হাঁফিয়ে উঠছিল ও। অবশ্য খুব অল্প সময়। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ও আকাশ দেখবে, মাটি দেখবে, ঘাস দেখবে, ফড়িং দেখবে—কাজের মানুষ রতি-মতি তা হতে দেবে কেন? ভাত খেয়ে উঠেই দু ভাই জাল-পলো-বর্শা, ঝুড়ি, মাটির হাঁড়ি সব টেনে টেনে বার করল। বোঝা গেল মাছ ধরা হবে। দামিনীর ঘর থেকে সব টেনে বার করা হল। মুক্তা কি এখন তার ছোট বিছানাটা মেঝের ওপর বিছিয়ে একটু গড়িয়ে নেবার মতলব করছিল নাকি? অনেকদিন পর অবেলায় ভাত খেয়ে উঠে শরীর কেমন ভার ভার ঠেকছিল তার। কিন্তু বিছানায় গড়িয়ে বিশ্রাম করার চিন্তা ঘরের কড়িকাঠে ঝুলে রইল।

'হুঁ, পুবের পুকুরের সব পাকাল মাছ আজ তুলে আনব। চোর-ছ্যাঁচোড়, চিল, ভোঁদড়ের পেট ভরিয়ে লাভ কি?' মতি জালটাকে গুটিয়ে-গুটিয়ে একটা পুঁটলির মত করে ফেলল। 'তা, ঝুড়ি-হাঁড়ি আগলাবার লোক চাই সঙ্গে—বোবাকে দিয়ে সুবিধে হয় না, তুমি চলো।'

রতি বাইরে শিলের ওপর ঘষে বর্শার লোহার জং তুলে ফেলছে। যেন মতির কথা তার কানে গেল। 'কেন, যাবে না বলছে নাকি—না-যাবার হয়েছে কি, ছ কোশের রাস্তা নাকি আমাদের পুবের পুকুর—আমাদের ঘোড়ামারা পুকুর?'

পুকুরটার নাম ঘোড়ামারা কেন মুক্তা হয়তো ভাবছে আর মতির চোখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছে। মুক্তা সঙ্গে যেতে গররাজী না, দাদাকে বুঝিয়ে দিতে মতি গলা বড় করে বলল, 'যাবে, যাবে না বলছে না তো—'

শুনে সন্তুষ্ট হয়ে রতি উঠোন থেকে বলল, 'না, ভাবলাম আমাদের দোকান ঘরের দরজায় দাঁড়ালে ঘোড়ামারা পুকুরপাড়ের জামগাছটা দেখা যায়—দূরে না, তবে কি পাকিস্তানী মেয়ে ভাবছে পুকুরে কুমীর-টুমীর আছে, যে ভয় করবে ওখানে যেতে?'

দাদার কথা শুনে মতি হাসে, মুক্তা মুখ লাল করে পায়ের নখ দিয়ে ঘরের মেঝে ঘষে।

বস্তুত ইচ্ছা করে দাদা মেয়েটাকে আজ সকাল থেকে খোঁচা মারছে বুঝতে

পেয়ে মতি নীচু গলায় বলল, 'দাদার কথাবার্তায় রসকস কম, বাইরে থেকে চাঁছাছোলা মনে হয় লোকটাকে, আসলে মানুষ ভাল, ভেতরটা সোনা।'

বুড়ী পিসির কথাটা মুক্তার আবার মনে পড়ল। মতির দিকে মুখ তুলে বলল, 'হুঁ, এইডা আমি বুইঝে গেছি।'

'তবে আর কি, দাদার কথা গায়ে মাখবে না।' যেন মতিও নিশ্চিন্ত হয়। মুক্তার ঠোঁট-ছড়ানো সরল হাসিটা মতির হঠাৎ খুব ভাল লাগে।

'কি, যাবি নাকি তোরা—' বাইরে থেকে রতি হাঁকে। জাল ও ঝুড়ি হাতে তুলে মতি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। পিছনে মুক্তা। মুক্তার হাতে দুটো বড় মাটির হাঁড়ি।

উঠোনের ওধারে সজনে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দামিনী। দামিনীর চোখে মুখে যেন খুশি ধরে না। স্বাভাবিক। এ-বাড়ির দুই জোয়ান যেদিন খালে পুকুরে মাছ ধরতে যায় দামিনীই সব চেয়ে বেশি সুখী হয়। কেননা, কিছু মাছ পাড়া-পড়শীদের বিলিয়ে দিয়ে, কিছু বিক্রী করেও বাড়িতে যে পরিমাণ মাছ আসে দামিনী একলা খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এ-বাড়ির লোকেরা মাছ খায় না—বৈষ্ণব! কাজেই ঝাল-চচ্চড়ি-ভাজা—তিন ভাবে মাছ রান্না করে দামিনী সব একলা খায়। কৈ, মাগুর, সিঙ্গি এলে হাঁড়ির জলে জিইয়ে রেখে রেখে দামিনী কদিন কেবল মাছ দিয়ে ভাত খায়। তা রতি-মতি কিছু রোজ মাছ ধরতে বেরোয় না। হয়তো এমাসে আর বেরোবেই না। তাই বুদ্ধি করে বোবা দামিনী কিছু মাছ শুকিয়েও রাখে। তার অভাবের দিনের পুঁজি। কাজেই আজ দু ভাই মাছ ধরতে চলল দেখে দামিনী বেজায় খুশি। 'হিঁ হিঁ হিঁ—এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ।' মতির কাছে ছুটে এসে দু হাত শূন্যে ছড়িয়ে দামিনী ইঙ্গিতে কি বোঝায়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনব—এত বড় কাতলা মাছ তোর জন্যে ধরে নিয়ে আসব।' হেসে ঘাড় কাত করে চোখ টিপে মতি দামিনীকে আশ্বাস দেয়। রতি কথা বলে না। মুক্তা দামিনীর হাবভাব দেখে হাসে।

'আর দেরি করিস নি বাবা, তোরা বেরিয়ে পড়। এমনি ফিরতে রাত হবে।' পিসি দাওয়া থেকে তাড়া দেয়। দৃষ্টিহীন চোখদুটো উঠোনের দিকে ঘুরিয়ে মনোহর মৃদু গলায় বলে, 'তারা! তারা!'

যেন পুকুরপাড়ে এসে রতি এটা আবিষ্কার করল। মুক্তার পরনে একখানা

ফর্সা কাপড়। পিসির লালপেড়ে শাড়ি রতি চিনতে পারল। বিধবা পিসি এমন পাড় দেওয়া কাপড় পরে না। কোন্ আমলে পরত। তোলা ছিল। নিশ্চয় মুক্তাকে বার করে দিয়েছে। তা দিক। কিন্তু পাকিস্তানী মেয়ে এটা এখন পরে এল কেন? তাতেও বুঝি রতির আপত্তি ছিল না। এরণ্ড ঝোপের ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো হলদে রোদ এসে পড়েছে মুক্তার মুখেচোখে। রতি আবিষ্কার করল, বেশ টান করে মেয়েটা খোঁপা বেঁধেছে—তা বাঁধুক, তাতেও বুঝি রতির রাগ হত না। বেশ পুরু করে চোখে কাজল বুলোনো হয়েছে। হলদে রোদের টুকরো লেগে কাজলপরা চোখ দুটো সাদায় কালোয় মেশানো দুটো চঞ্চল প্রজাপতির চেহারা ধরেছে। 'থুঃ—' রতি থুথু ফেলল। ঘাড় ঘুরিয়ে পুকুরের চেহারা দেখল। নামে পুকুর। জল আছে কি নেই, পাঁক থকথক করছে। এক রাত্রে এই পাঁকের মধ্যে পড়ে গিয়ে কবে কার ঘোড়া আর উঠে আসতে পারে নি। প্রথমে চারটে পা, তারপর বুক-পিঠ-গলা, তার পর মাথা কান শুদ্ধ তাগড়া তড়বড়ে ঘোড়াটা আস্তে আস্তে তলিয়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মরল। তাই ঘোড়ামারা পুকুর। মতির মুখে ঘোড়ামারা পুকুরের গল্প শুনে মুক্তার চোখ বড় হয়ে ওঠে। ভীরু চোখে এতবড় পুকুর জুড়ে থকথকে কাদার চেহারা দেখে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়বৃষ্টি হতে আরম্ভ হলে তবে আবার জল হবে পুকুরে। ভাদ্র মাসে পুকুর আর পুকুর থাকে না, সাগর হয়ে যায়। আবার কার্তিকের শেষ পড়ল কি জলের টান পড়তে আরম্ভ হল। এখন ফাল্গুন মাস। সবুজ সরের মত এক আঙুল দু আঙুল জল তবু এখানে-ওখানে থিরথির করছে। দু দিন পর তাও দেখা যাবে না। 'চৈত্র মাসে পুকুরের ওপর দিয়ে মোষের গাড়ি গরুর গাড়ি দিব্যি হটর হটর করে চালিয়ে নিয়ে যায় গাড়োয়ানরা।'

'কি, দাঁড়িয়ে কেবল কেচ্ছা করবি, কেচ্ছা শোনাতে এলি নাকি মতি মাছ ধরতে এসে।' রতি হাঁক দেয়।

মতির মুখের কথা থেমে যায়। মুক্তা চমকে ওঠে। বড় ভাই বর্শা হাতে করে পুকুরে নেমে গেছে। যেন লজ্জা পেয়ে মতি তাড়াতাড়ি কোমরের গামছাটা আরও শক্ত কার এঁটে নেয়। তার পর পলো হাতে পাঁকের মধ্যে নেমে পড়ে।

'না-না, তোমার এসে কাজ নেই, সোনা। তুমি পটের বিবি সেজে আছ, ওই ঘাসের ওপর বসে হাওয়া খাও।'

মুক্তা হাঁড়ি-ঝুড়ি নিয়ে জলকাদার দিকে নামছিল। রতি ঘাড় ঘুরিয়ে নিষেধ করল। নিষেধ করতে গিয়ে সে এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে তার গলার

শিরা দড়ির মত ফুলে উঠল। আওয়াজটা পুকুরের চার পাড়ে বাড়ি খেয়ে এধারের এরণ্ড ঝোপের গায়ে এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে তসরকাটা পাখিটা 'কুটকুট্ নিন্' আওয়াজ তুলে ঝোপ ছেড়ে উড়ে যায়। দাদা ভীষণ রেগে গেছে। কেন রাগ করল বুঝে নিতে ঘাড় ফিরিয়ে ঘাসের ওপর দাঁড়ানো মুক্তাকে এক পলক দেখে নিয়ে আবার পাঁকের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাতের পলো চেপে ধরে মতি। রতি তার আগেই হাতের বর্শা উঁচিয়ে পাঁক ভেঙে ভেঙে দূরে সরে যায়।

এখন বুঝল মুক্তা বাড়ি থেকে বেরোবার পর রতি কেন কটমট করে তাকে দুবার দেখছিল। এখন বুঝল ও কত বড় ভুল করেছে। বুড়ী পিসির কাছ থেকে ফর্সা শাড়ি পেয়েছে। কিন্তু সেটা পরে এখানে আসার হয়েছিল কি? কেবল কি তাই! বুড়ী পিসির কাছে চেয়ে মুক্তা একটা ভাঙামতন চিরুনি পেয়েছে। চিরুনির সঙ্গে অবশ্য বুড়ী চারদিক ভাঙা, পিছনের প্রায় সবটুকু রং চটে যাওয়া, ঝাপসা হয়ে আসা এক ফালি আরশিও পেঁটরা থেকে বার করে দিয়েছে। আর তাই পেয়ে মুক্তা মহা খুশি! আজ স্নানের পর ঘটা করে চুল আঁচড়িয়ে খোঁপা বেঁধেছিল। যেন এখন নিজের কাছে নিজের কাজগুলি অদ্ভুত মনে হল। শেষ বেলায় ভাত খেয়ে উঠে তাড়াতাড়ি একটা তেলের বাতি জেলে একটা ঝিনুকে করে একটুখানি কাজল পর্যন্ত তৈরি করে নিয়ে ও দুই চোখে বুলিয়েছে।

'পটের বিবি!' মুক্তার কানদুটো জ্বলছিল। 'আমি আর কুমারেশের কাছে নাই—এই বাড়ির মানুষ, ঐ যে রতি-মতি দুই জোয়ান জোয়ান ভাই এ সকল পছন্দ করে না। পছন্দ না করনডা ভাল।' মুক্তার মন বলল, 'আমি এগো ঝি দাসী—আমার তো এমন সাজাগোজা ঠিক না। রতি ঠিক ধইর‍্যা নিছে আমি একটা খারাপ মাইয়্যা।'

মুক্তার ইচ্ছা করছিল চোখের কাজল তুলে ফেলে, খোঁপা ভেঙে মাথাটা আলুথালু করে রাখে। হুঁ, দামিনীর মতন। বস্তুত, এই মুহূর্তে কি করলে ও দু ভাইয়ের চোখে ভাল হবে ভেবে না পেয়ে এরণ্ড গাছের কচি ডালটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর। বুকের ভিতর একটা বিশ্রী দুপদুপ আওয়াজ মুক্তার নিজের কানে এসে লাগে। কেবল কি লজ্জা! ভয় পেয়েছে ও। হয়তো রতি আজ বাড়ি ফিরেই বলে বসবে, 'তোমার কইলকাতার ভাইয়েরে খবর পাঠাও, আইস্যা তুমারে লইয়া যাউক, এইখানে আমরা বাবু-ঝি পোষাইতে পারমু না। বলাই কি—'

মুক্তার চিন্তায় ছেদ পড়ে। এক হাতে পাঁকের বুকে পলো চেপে ধরে আর একটা হাত তুলে মতি তাকে ডাকছে, 'এদিকে—শুনছ মেয়ে—ঝুড়ি থাক, আগে হাঁড়িটা নিয়ে এসো।'

রতির ধমক খেয়ে ঝুড়ি-হাঁড়ি ঘাসের ওপর নামিয়ে রেখেছিল ও। এখন মতির ডাকে একটু সাহস পায়। নুয়ে হাঁড়িটা তুলে নেয়, তার পর এক-পা এক-পা করে মুক্তা এগোয়। রতি পুকুরের পশ্চিম ধার ধরে ধরে তখনও কাদা ভাঙছে। মতি দক্ষিণ দিকে গেছে। হুঁ, দুবারের চেষ্টাতেই সে পলোর মধ্যে মাছ আটকে ফেলেছে।

'শিগ্‌গির,—একটু পা চালিয়ে এসো মেয়ে।'

মতি চেঁচাতে পারে না, চাপা গলায় ডাকে। কেননা বেশি জোরে কথা বললে ওদিকে রতির শিকার পালিয়ে যাবে, বুঝি সেই মুহূর্তে বর্শা উঁচিয়ে বড় শোল মাছটাকে গেঁথে ফেলতে রতি দম বন্ধ করে পাঁকের ওপর ঝুঁকে আছে। তার হাতের শিরা ফুলে উঠেছে, কাধের পেশী কাঁপছে। ভয়ে ভয়ে রতির সেই ভীষণ মূর্তি একবার দেখে নিয়ে মুক্তা পা চালিয়ে দক্ষিণ পাড়ে ছুটে গেল।

পলোর ভিতরের কাদা হাটকে হাটকে মতি মাছ তুলল। বড় বড় মাগুর, ল্যাঠা। জ্যান্ত মাছগুলোকে সে ছুঁড়ে দেয় তীরের ঘাসের ওপর আর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মুক্তা এক-একটা মাছের মাথা চেপে ধরে হাঁড়িতে পোরে। পাঁকের মাছ ডাঙায় উঠে লাফায়, ছটফট করে, মুক্তার চোখেমুখে কাদার ছিটা লাগে। ফর্সা কাপড়ে কাদার ছোপ লাগে। তা লাগুক। কাপড় নষ্ট হবে বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তার চলবে না। মতি যখন আবার একটু দূরে গিয়ে পলো চেপে ধরে মুক্তা দিব্যি পুকুরে নেমে যায়। নরম পাঁকে ওর পা ডুবে যায়, হাঁটু বসে যায়।

'থাকো, ঐখানে থাকো, আর এগোবে না মেয়ে।' মতির কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে পাঁকের তলায়। চোখে মুখে গলায় বুকে পচা শ্যাওলা আর কাদার ছোপ। মানুষটাকে আর চেনা যায় না। কিন্তু মুক্তা নিষেধ শোনে না। কী হবে তার ফর্সা কাপড়, মাজাঘষা মুখ দিয়ে! এরা তো তা চায় না। আরও বেশি বেশি করে কাদা লাগুক তার গায়ে। মুক্তা এগোয়। এবার আরো বড় বড় মাগুর-সিঙ্গি তুলে মতি মুক্তার হাতে ধরা হাঁড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। কাদায় কাদায় মুক্তার চেহারাটা এখন পেত্নীর মত দেখায়। যেন বুঝতে পারে ও নিজের চেহারাটা এইবেলা কেমন হয়েছে। বুঝতে পেরে মুক্তা দাঁত বের করে হেসে

উঠল। সরল মানুষ মতি মেয়েটার এই হাসির অন্যরকম মানে বুঝল। হুঁ, মাছ দেখে খুশি হয়েছে। যেন ওকে খুশি করতে রতি ওদিক থেকে হাঁক দেয়: 'এদিকে, এদিকে—মেয়ে।' মুক্তা চমকে ঘাড় ফেরায়। এত বড় শোল মাছ বর্শার আগায় গেঁথে তুলেছে মতির দাদা। মুক্তা কি এখনি রতির কাছে ছুটে যাবে? পাঁক আর শ্যাওলা লেগে জোয়ান পুরুষটাকে এখন দৈত্যের মত, রাক্ষসের মত দেখায়। এতবড় মাছ শিকার করেছে বলে রতি খুশি হয়ে কি মুক্তাকে ডাকছে আর সাদা বড় বড় দাঁত কটা ছড়িয়ে দিয়ে হাসছে। মুক্তার মনে হল, তা না। রতির হাসির অন্যরকম মানে বুঝল ও। 'আর আমি পটের বিবি সাইজ্জা নাই, আমি পেত্নীর চেহারা ধইরা আছি, আমি জোয়ান তু ভাইয়ের মতন কাদায় শ্যাওলায় গড়াগড়ি খাইছি—এগো মেজাজের সঙ্গে মিলা গেছি দেইখে এখন আদর কইর‍্যা ডাকছে মাছ নিতে।'

'যাই, যাচ্ছি।' মুক্তা সরু গলায় উত্তর করে। তার পর মতির চোখে চোখ রেখে মিটি মিটি হাসে: 'দাদায় ডাকছে, যামু?'

'যাও।' মতি ঠোঁট টিপে হাসে। 'মাছ গাঁথতে পেরে দাদার মেজাজ খুলে গেছে, এখন আর ডর নেই, যাও।'

'না, আর ডর নাই। এখন আমি সোন্দর মাইয়্যা না, পেত্নী শাকচুন্নী সাইজা গেছি।' মুক্তা মনে মনে বলল, 'মাইয়াছ্যালার সোন্দর সাজ দেইখ্যা পুরুষ রাগ করে কেন?'

মতির দিকে মাছের হাঁড়িটা ঠেলে দিয়ে মুক্তা পড়িমরি করে তীরে উঠে ঝোপের কাছে ছুটে গেল, ঝুড়িটা টেনে আনল, তার পর ছুটল পশ্চিম পাড়ে, যেখানে রতি মাছ আর বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু, এক সেকেণ্ডও দাঁড়ায় নি ও রতির সামনে, বুঝি ভাল করে চোখ তোলারও সময় পায় নি মতির দাদাকে এক নজর দেখতে, বাজ ভেঙে পড়ল তার মাথার ওপর। এত বড় একটা জোয়ানের হুঙ্কারে মুক্তা ছিটকে দূরে সরে গেল। তার কান বোঁ বোঁ করছিল, চোখে আঁধি ঠেকছিল। কিন্তু তা হলে হবে কি, বিষের ছুরির মত কথাটা তার বুকে বিঁধে রইল ঠিক।

যুবতী মাইয়্যা পুরুষের সামনে এমন বেশরমের মত ছুইটা আসে কোন্ সাহসে। যেন ওধারে পাঁকের ভিতর দাঁড়িয়ে মতি শুনল কথাটা, তীরের গাছগুলি শুনল; পশ্চিম আকাশে থমকে দাঁড়ানো লাল মেঘের চাকাটার কানে গেছে কথা, আগুন রঙের লাল ফড়িংগুলিও শুনে রাখল। ফড়িং-এর ঝাঁক

তাই মুক্তার বুক ঘিরে গলা ঘিরে নাচানাচি শুরু করল। মুক্তা ঘুরে দাঁড়ায় আর পা পা করে এরও ঝোপের দিকে সরে যায়। না, গাছকে ভয় নেই, ফড়িংকে ভয় নেই—মেঘ, পাখি, পায়ের নীচের মাটি—যত খুশি ওরা মুক্তাকে দেখুক, লজ্জা নেই, ভয় নেই। ভয় মানুষকে। পুরুষকে। কুমারেশকে ভয় করত সে। এখন রতিকে ভয়—সে একটু কিছুতেই হৈ-হৈ করে ওঠে বলে। কিন্তু রতির সামনে কি ও ইচ্ছা করে এভাবে গেছে? জলকাদায় কাপড়টা গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। যেন পচা পুকুরের পাঁক থেকে কী সব পোকা মুক্তার গায়ে উঠে এল। কুটকুট করছিল সারা শরীর।

ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্তা বুকের আঁচল মজবুত করল। ভিজা কাপড় টেনে পায়ের পাতার ওপর নামিয়ে দিল। তার চোখে জল এসে গেছে। যদি কেউ দেখত, টের পেত অভিমানে নরম ঠোঁট দুটো কেমন বেঁকে গেছে, একটু একটু কাঁপছে।

'মধুসূদন!' দেবতাকে ডাকল ও। 'আমি তো ইচ্ছা কইর‍্যা বেয়াদবি করি নাই, তুমি সাক্ষী। আমার পুরুষ এক, একজন—বলাই।' একটু ভাবল মুক্তা। কান খাড়া করে রাখল। তসরকাটা পাখিটা আবার উড়ে এসে মাথার ওপর সবুজ নরম ডালটায় বসে 'কুটকুটুনিন' 'কুটকুটুনিন' করে মিঠা গলায় ডাকছে। রোদ নিভে যায়। না, রতি-মতি তাকে আর ডাকছে না, ডাকবে না। কে জানে মতি হয়তো ডাকত মাছের হাঁড়ি ধরতে, দাদার ভয়ে চুপ করে আছে।

রতি-মতি আরো মাছ ধরল। দক্ষিণ ধারে কিছুটা জল আছে। জাল ফেলে মতি মৌরলা আর তিতপুঁটি তুলল। আর কুচো চিংড়ি। রতি বর্শা রেখে দিয়ে পলো চেপে চেপে মাগুরটা কইটা তুলল।

মুক্তার দিকে রতি আর তাকায় নি। মতিও না। পুকুরপাড়ে একটা কাঠের পুতুল হয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে। বেশ বুঝতে পারে ও, আজ বাড়ি ফিরে রতি তাকে চলে যেতে বলবে। মুক্তা হয়তো দু-এক দিন সময় চাইবে। হুঁ, বলাইকে, তার মামাতো ভাইকে খবর পাঠাতে, কিন্তু—

মুক্তা পুকুরের ওপারের আবছা অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে ভাবে। তার বুকের ভিতর নতুন একটা ভয় ডেলা পাকাতে আরম্ভ করে। বলাই তো তার কাছে কোন ঠিকানা রেখে যায় নি। বড়বাজারের কথাটা মিছা কথা, রতি-

মতির কাছে বানিয়ে বলা হয়েছে। আসলে—

দু ভাই জাল বর্শা গুটিয়ে মাছের হাঁড়ি-ঝুড়ি মাথায় তুলে নিল। দুজন এখন হাঁটতে থাকে, মুক্তা পিছনে পিছনে হাঁটে। ঘরে তো ফিরতে হবে, পুকুরপাড়ের জঙ্গলে বসে রাত কাটাতে পারবে না ও।

মাছ ধরার খবর পেয়ে গেছে ওরা। দোকানঘরের সামনে ভিড় জমেছে। ছেলে বুড়ো বুড়ী যুবতী হাঁড়ি-গামছা হাতে, কেউ কলাপাতা নিয়ে, কেউ শুধু হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সাত দিনে একদিন শ্রীপুরের হাট। তবে যদি গাঁয়ের মানুষ মাছের মুখ দেখে। তাই আজ রতি-মতির পুকুরের মাছ ধরা হয়েছে খবর পেয়ে সবাই মাছ কিনতে ছুটে এসেছে। রতি-মতির পাশে মাছ-ভর্তি হাঁড়ি-কুড়ি দেখে তারা খুশিতে কলরব করে উঠল। না, দেখা গেল, মাছ বেচার ব্যাপারে রতি কিছু না, এখানে মতিই সব। দোকানঘর থেকে পাল্লা পাটখারা টেনে এনে ঘাসের ওপর বসে গেছে সে, ওজন করে করে গাঁয়ের মানুষের হাঁড়ি গামছা কলাপাতার ঠোঙায় মাছ ঢেলে দিচ্ছে আর গুনে গুনে পয়সা নিচ্ছে। দামিনী পিছনে দাঁড়িয়ে। দামিনীর দু চোখ বড় হয়ে গেছে। হাতে একটা কেরাসিনের ডিবি। বোঝা গেল মতিকে আলো দেখাতে, মাছ নিয়ে কেউ না জাল সিকি আধুলি দুআনি মতির হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ে তাই দামিনী ডিবি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ যদি একটু মনোযোগের সঙ্গে তখন দামিনীর চোখ ও ঠোঁটদুটো দেখত, বুঝতে পারত ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অশান্তি, কেমন একটা বিরক্তি অনুভব করছে বোবা মেয়েটা। স্বভাবিক। যদি ওরা সব মাছ কিনে নেয়, তবে দামিনী খাবে কী? কেবল একবেলা মাছ খাবে ও? দু-একটা মাগুর, দুটো সিঙ্গি রেখে মতি সব বেচে দেবে? দামিনী তা চাইছে না। দামিনী আশা করছে ঝুড়ির বড় শোলটা, হাঁড়ির সব কটা কই-মাগুর থেকে যাবে। দামিনী আজ খাবে, কাল খাবে, পরশু খাবে। তার পরদিন,তার পরদিন—জলে জিইয়ে রেখে রেখে এক নাগাড়ে পনেরো-বিশ দিন ধরে মাছ খাবার লোভে তার চোখদুটো ভীষণ চকচক করছে। হুঁ, কিছু মাছ সে শুকিয়ে রাখতে চায়।

অন্য সময় দামিনীর হাবভাব দেখে মুক্তা হাসত, কিন্তু এখন আর ওর দাঁড়িয়ে এসব দেখার ইচ্ছা করছিল না। তার মন খারাপ। চুপ করে এক সময় ও ভিতরের উঠোনে ঢুকল। শোবার ঘরে ঢুকে নিজের ছেঁড়া ময়লা কাপড়টা

বিছানার বাণ্ডিলের ভিতর থেকে টেনে বার করল, তার পর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির পিছনের ডোবার দিকে চলল। কচু আর বাসকের ঝোপ ঠেলে মুক্তা এগোয় আর চিন্তা করে: 'যে কদিন আছি এখানে, এই ছিঁড়া ময়লা কাপড় পইরা থাকমু, চুল আঁচড়ামু না। দরকার কি? সাত দিন কোনমতে পার করি তো—তার পর দেখা যাইব।'

ডোবার জলে গা ডুবিয়ে মুক্তা মাথার ওপর আকাশের জলজলে তারাগুলি দেখতে লাগল। আর লাখ লাখ তারাকে সাক্ষী রেখে ও নিজের মনে বলল, 'তোমাগো দুই জোয়ান ভাইয়ের ওপর আমার একটুও লুভ নাই, যদি সেই পদের মাইয়া অইতাম আমি তো কুমারেশের কাছে থাইক্যা যাইতাম। কেবল শাড়ি বেলাউজ? সোনা দিয়া আমার গা ভইর‍্যা দিত কুমারেশ।'

॥ উনিশ ॥

রাত্রে আবার ডাক পড়ে মুক্তার। তখন ও রান্নাঘরে। দামিনী খুশিতে ডগমগ হয়ে নিজের জন্য মুক্তার জন্য মাছ ভাজা করে, মাছের চচ্চড়ি রাঁধে। মুক্তা এ বাড়ির বৈষ্ণবদের নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা করে।

দরজায় মতি এসে দাঁড়ায়। কি না হাপরে আগুন পড়েছে। লাঙলের কাজ এসে গেছে। অনেক রাত অবধি কাজ হবে কামারশালায়। মুক্তাকে দরকার। দাদা ডাকছে।

মনে মনে খুশি হয় মুক্তা, আবার দুরন্ত একটা অভিমানও তাকে পেয়ে বসে। 'হায় রে, ছাই ফেলবার লাইগ্যা ভাঙা কুলার আদর!' কথাটা মনে করে মুক্তা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়ায়।

দামিনী খন খন করে ওঠে। মানে, তার এখন অসুবিধা হল। মাছ রেঁধে এই রাতে আবার নেয়ে উঠে তাকে নিরামিষ রান্নায় লাগতে হবে। কিন্তু করা কি? ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে দু-দুটো মানুষকে তো কেবল রান্নার কাজে ফেলে রাখতে পারে না তারা। মতি জোরে ধমক লাগাতে দামিনী চুপ করল। দামিনীকে ধমক দিয়ে মতি মুক্তার মুখ দেখল। মাথায় একরাশ ভিজা চুল। আঁচড়ান হয় নাই, তাই কিছু কপালে, কিছু গালে, কিছু বুকে পিঠে ছড়িয়ে আছে। অথচ বিকেলে মাছ ধরতে গিয়ে কী পরিপাটি করে চুল বেঁধেছিল মেয়ে।

চোখে এখন কাজলের চিহ্ন নেই। কেউ বলতে পারবে না এই চোখে কাজল ছিল। যেন রাগ করে চোখ রগড়ে রগড়ে ডোবার জলে সব ধুয়েটুয়ে এসেছে মুক্তা।

কিছু বলল না মতি। মাথা গুঁজে রান্নাঘরের দরজা ছেড়ে উঠোনে নামল। মুক্তা পিছনে। মুক্তাও কথা বলছে না। দুজনের নীরবতার মাঝখানে যেন একটা কথা দানা বাঁধতে থাকে। কী কথা? মুক্তা চিন্তা করে। মতি কি এই-বেলা কিছুই ভাবছে না? কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে মতির আগে আগে চলে। মতি কি কেবল কুকুরটাকে দেখছে? 'না, এইডা সম্ভব না। জোয়ান পুরুষ যুবতী মাইয়্যারে পিছনে রাইখ্যা যখন হাঁটে, তার মাথার খুলির পিছনে দুইডা চক্ষু খোলা থাকে। না ফিরাক ঘাড়, না ফিরাক মাথা। মতি ঠিক দেখছে সাইজা-গুইজা থাকলে মুক্তারে কত চমৎকার দেখায়—আর এখন কেমন পেত্নীর মতন দেখাইতে লাগছে। রতি তার এই বেশ দেইখ্যা খুশি হইতে পারে—কিন্তু ছোড ভাই মতি।' বস্তুত, অন্ধকার উঠোন পার হয়ে পুবঘরের পৈঠা ঘুরে ও যখন দোকানের দিকে এগোয় তখন কথাটা বার বার তার মনে জাগল। মতির মনের কথা বুঝতে না পেরে মুক্তা ভিতরে ভিতরে ছটফট করে।

কিন্তু অন্ধকারে মানুষের মন একরকম থাকে, আলোর সামনে আর একরকম হয়। এখন দোকানে ঢুকে মুক্তার তাই হল। উঠোন পার হয়ে আসতে আসতে যত কথা সে ভাবছিল, হাপরের সামনে বসে সে-সব কথা, সে-সব ভাবনা যেন কর্পূরের মতন তার মন থেকে উড়ে গেল।

রতির মতন মতির কাঠকাঠ চেহারা। দু ভাই একবার তার দিকে চোখ তোলে না। ডুব দিয়ে চান করে এসেছে দু'জন, কাদামাটির চিহ্ন নেই কারুর শরীরে, পরনে শুকনো গামছা, নেংটির মতন করে কোমরে জড়ানো। রতির মাথার ঝাঁটার কাঠির মতন খাড়া খাড়া চুল এখন জলে ভিজে নরম হয়ে নুয়ে পড়েছে। তাই মাথাটা ছোট দেখায়। মতির মাথাটা বড় দেখায়। কালো কোঁকড়া চুল জলে ভিজে কেমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুটো মাথার ছায়া টিনের বেড়ার গায়ে নড়াচড়া করে।

'হাত চালাও, হাত চালাও।' মুখের বিড়ি ফেলে দিয়ে রতি হঠাৎ মুক্তার দিকে মনোযোগ দেয়। 'হাঁ করে তাকিয়ে দেখছ কি? জোর বাতাস না পেলে আগুনের তেজ ওঠে?'

মুক্তা চমকে ওঠে। তাই তো! তাকিয়ে আছে সে কোন্‌দিকে? মতির

চওড়া পিঠ দেখছে, না কি রতির কাঁধের ফুলে ওঠা মাংসের দিকে ওর চোখ। চোখজোড়াকে বশে আনতে পারছে না ও, শাসন করতে পারছে না? ছোট একটা ভয়ের ধাক্কা জাগল মুক্তার বুকে। বুঝতে পারল ও—'এইডা ভাল না। আমার তো এই ব্যামার আছিল না। শিয়ালদার বুঁচির আছিল, খুড়ির আছিল, পুরুষ দেখলে, জোয়ান মানুষ দেখলে চাইয়া চাইয়া ঢোক গিলছে। চরিত্তির খারাপ অইলে এই ব্যামার হয়, আমার কি—'

যেন জোর করে চোখ বুজল ও, আর গায়ের সবটুকু শক্তি একত্র করে হাপরের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাতাস ঠেলতে লাগল। কাঠকয়লার ফুটফাট শব্দ হয়, গলগলিয়ে ধোঁয়া ওঠে, তার পর দপদপিয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। দমকা আগুনের আভায় চালের টিন ঘরের বেড়ার লাল রং ধরে, মতির ফর্সা মুখ লাল রং ধরে, রতির কালো রংটাও পোড়া মাটির মতন লালচে দেখায়। আর মুক্তা? অতিরিক্ত ফর্সা বলে মুখখানা গোলাপের মত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুক্তা এসব কিছুই দেখছে না। চোখ বুজে প্রাণপণে হাপরে বাতাস ঠেলছে। সাঁড়াসী বাগিয়ে লাল টকটকে লোহাটা আগুন থেকে তুলে এনে মতি ইস্পাতের পাটার ওপর চেপে ধরে আর সাঁই সাঁই করে রতি হাতুড়ি পেটে। হাতুড়ি পেটার শব্দে মাটি কাঁপে, ঘরের বেড়া কাঁপে। চোখের নিমেষে দুর্ঘটনা ঘটল। যেন খেয়াল নেই মেয়েটার, এমন ভাবে হাপরের ওপর ঝুঁকে আছে, কাপড়ের আঁচলটা ঝুলে আছে, কি করে হুস করে আঁচলে আগুন ধরে গেল। 'গেল গেল গেল— আহা হা হা!' রতি চিৎকার করে উঠল? আর মতি,—যেন কারুর গায়ের কাপড়ে আগুন ধরে গেলে কি করতে হয় জানা আছে, হুমড়ি খেয়ে মুক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল। এক সেকেণ্ড। মুক্তার আঁচলের আগুন নিভল বটে, আর এদিকে, বুঝি বুক দিয়ে চেপে ধরে মুক্তার গায়ের আগুন নেভাতে গেল বলে মতির বুকের চামড়া একটু জ্বালা করে উঠল, বুকের দুটো লোম চড়চড় করে পুড়ে গেল। এই পর্যন্ত। আর কিছু না। আর কিছু হয় নি তার। কিন্তু কাপড়ে আগুন লেগেছে দেখে মুক্তা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠার সময় পায় নি। তার আগেই মতি আগুন নিভিয়ে দিল। মুক্তার কাছ থেকে সরে এসে মতি ইস্পাতের পাটার কাছে বসে সাঁড়াসী বাগিয়ে লাল টকটকে লোহা চেপে ধরে। কিন্তু রতির হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে না তো। হাতুড়ি হাতে ঝুলিয়ে সে একবার মুক্তাকে দেখল, একবার ছোট ভাইকে দেখল, তার পর চোখ নামিয়ে বেড়ার গায়ে থুথু ফেলল। আর মুক্তা হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে না পারছে

রতির দিকে তাকাতে, না পারছে মতির দিকে তাকাতে, চোখ নামিয়ে চুপ করে বসে আছে।

তার পর অবশ্য রতি একসময় হাতুড়িটা দু হাতে শূন্যে তুলে গরম লোহার গায়ে আঘাত করল, কিন্তু কাজে যেন তেমন জোর রইল না। অবশ্য জোর না ধরার কারণ পাড়ার বন্ধু শশী এসে তখন দোকানে ঢুকে কোন্ দিকের জমির নালার মামলা নিয়ে রতি-মতির সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে গেছে।

বাইরের লোক দোকানে ঢুকতে রতি চোখের ইশারায় মুক্তাকে ভিতরে চলে যেতে বলল। মুক্তা উঠে পিছনের দরজা দিয়ে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেল। উঠোনে নেমে মুক্তা স্বস্তিবোধ করল। কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে নেড়ে তার পা ঘেঁষে হাঁটু ঘেঁষে আদর জানাতে আসে। অন্য সময় হলে মুক্তা গলায় কানে হাত বুলিয়ে আদর করত, এখন তা আর পারল না, মন খারাপ লাগছিল, খারাপ না—কেমন যেন একটা খটকা লাগছে ওর বুকের ভিতর। মতি তার কাপড়ের আগুন নিভিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার পর, রতি এমন চুপ মেরে গেল কেন, কি ভাবছিল তখন সে বেড়ার দিকে চোখ রেখে ?

রাত্রে দু ভাই বড় ঘরের দাওয়ায় খেতে বসে। মুক্তা ভাত দেয়। অন্যদিন দু ভাই খেতে খেতে জমির কথা, পুকুরের কথা, দোকানের কাজ-কারবারের কথা বলে। আজ দুজন গুম মেরে আছে। যেন মতি একবার কি জিজ্ঞেস করছিল দাদাকে, রতি উত্তর দেয় নি। ঘটি তুলে ঢকঢক করে জল গিলেছে। মতি আর কিছু বলে নি। আর রতি বা মতি একবারও তো চোখ তুলে মুক্তার দিকে তাকাল না। মুক্তা পরিষ্কার টের পায় কি একটা হয়েছে রতির। যেন মতিরও। মুক্তা বুঝতে পারে, ছোট ভাইয়ের ওপর রতি কিছু একটা নিয়ে চটেমটে আছে।

এই 'কিছু একটা'র চিন্তা মুক্তার বুক কুরে কুরে খেতে লাগল। ভাল করে ও ভাতই খেতে পারল না। দামিনী প্রচুর মাছ দিয়ে এত এত ভাত খেল। খেতে খেতে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। না, মাছের চচ্চড়িতে বেশী লঙ্কা পড়েছে বলে কি, যেন উল্লাসে, অনেক মাছ খাওয়ার আনন্দে বোবা সুখের অশ্রু ফেলছিল। যদি মুক্তার মন ভাল থাকত, এই নিয়ে বোবার সঙ্গে দুটো রসিকতা করত, কিন্তু তা আর করতে পারল কই ! যেন ও আর একটি বোবা সেজে দামিনীর হলদেটে ধূসর চোখদুটো কেমন চকচকে হয়ে গেছে দেখতে

লাগল আর লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তবে কি আমারে লইয়া তুই জোয়ান ছাইলার মন কষাকষি?' সাপের ফণা হয়ে কথাটা মুক্তার বুকের অন্ধকারে জেগে রইল। তখন মধ্যরাত্রি। জোর বাতাস উঠেছে বাইরে। গুদাম ঘরের পিছনে পেঁপেগাছের পাতাগুলির পত পত শব্দ হয়। একফালি জ্যোস্না জানালা দিয়ে কখন জানি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দামিনীর বিছানার কাছে শিয়রের ধারে জ্যোৎস্নার টুকরোটা চুপ করে পড়ে আছে। দামিনী দেখছে না। তার নাক ডাকছে, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। বেশি ভাত খেয়ে পেটটা ঢাকের মত ফুলে আছে। মুক্তার চোখে ঘুম নেই। 'আমার বুকে জড়াইয়া ধইর‍্যা মতি আগুন নিভাইছে, আর সেই আগুন যাইয়া বাসা বাঁধছে রতির বুকের মাইঝে।' চিন্তা করে মুক্তা শোয়া থেকে উঠে বসে। তার কপাল ঘামছে, পিঠ ঘামছে। যেন তখন দোকানে যা যা ঘটল, যেভাবে ঘটল সবটা ছবি নতুন করে দেখতে মুক্তা উঠে বসে। হুঁ, তার মাথার ভিতরেও আগুনের দপদপানি শুরু হয়েছে। 'কিন্তুক, মতি তো কু-মন লইয়া আমারে জাপটাইয়া ধরে নাই—কথাখান কি রতি বুঝল না?' মুক্তা নিজেকে প্রশ্ন করে আর চোখদুটো টান করে মেলে ধরে দামিনীকে দেখে। বয়স হয়েছে দামিনীর।

মুক্তা নিজের শরীরের দিকে তাকায়। মুক্তার ভাল লাগে। কিন্তু এই ভাল লাগা এক মিনিটের। সঙ্গে সঙ্গে দোকানঘরের আগুন জ্বলে ওঠার ছবি আবার তার চোখের সামনে দপ দপ করে। ভয় হল মুক্তার। 'না, এই ভাবনা এসকল চিন্তা তো ভাল না। কুলক্ষণ।' আর ঠিক তখন ঘরের পিছনের জঙ্গলে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। মুক্তার গলা শুকিয়ে গেছে। উঠে ও বেড়ার কাছে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে জল খায়। 'মধুসূদন, বলাইয়ের কাছে আমারে সকাল সকাল লইয়া যাও, দুই জনারে কড়া দিনের মাইঝে মিলাইয়া দেও।' চোখ বুজে বুকের ওপর ছোট হাতদুটো জড়ো করে ধরে রেখে মুক্তা ঠাকুর-দেবতাকে ডাকে, কিন্তু অবাক হয় ও চোখ বোজা মাত্র বলাইয়ের মুখ তো তার মনে পড়ছে না! যেন বাবরি চুলের চেহারাটা তার মন থেকে হারিয়ে গেছে। গরম লোহা সাঁড়াসী দিয়ে চেপে ধরে মতি হাপরের সামনে বসে আছে, রতি তার পাশে দাঁড়িয়ে। রতি কটমট করে তার দিকে চায়, বাঘের চোখের মত চোখ পুরুষটার। বৈষ্ণবের ঠাণ্ডা নরম দৃষ্টি না। মুক্তার পা দুটো কাঁপছিল, বুকের ভিতর কাঁপছিল। কুঁজোর ধার থেকে সরে এসে ও

পাতা বিছানার ওপর বসল। 'আমি কি নষ্ট অইয়া গেলাম, আমি কি—?'

চুপ করে শুয়ে চোখে ঘুম আনতে চেষ্টা করল মুক্তা। কিন্তু ঘুম আসে না। যেন অন্ধকার ঘরে কুমারেশ আসে। মুক্তার সামনে দাঁড়ায়। শয়তান হাসে। কুমারেশের পিছনে ওই মানুষটা কেডা? হুঁ, আর এক শয়তান। চিনতে পারে মুক্তা। শিয়ালদার খুড়ির ভাই। মুক্তার গায়ে হাত দিছিল।

'তাই কও' মুক্তা, নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠল। 'বলাই আমারে তেমন কইর‍্যা চায় না, লোকটার মনের মাইঝে অন্য চিন্তে। আমার লাইগ্যা তার টান কম। ভালবাসা নাই। না অইলে অখন বলাইর মুখ আমার মনে পড়ত, শিয়ালদার আর বারাকপুরের শয়তান দুইডার মনের পাপ আমার মনে পাপ ছড়াইছে। মধুসূদন, এই পাপের জইন্যে আমারে শায়েস্তা কর—আমারে শাস্তি দিয়া মনের পাপ ধুইয়া দেও, সকালে ঘুম থাইক্যা উইঠা আমি যেন সাদা চোখে সাদা মন লইয়া দুই ভাইরে দেখতে পারি।' মুক্তা কাঁদতে লাগল।

॥ কুড়ি ॥

গ্যারেজটা পরিষ্কার মনে আছে বলাইর। দুমড়ানো মোচড়ানো একটা ভাঙা লরী পড়ে আছে দিনের পর দিন। জলে রোদে ভিজে পুড়ে মাডগার্ড ফুটবোর্ড জং ধরে এমন চেহারা ধরেছে যে কোনদিন এগুলো আর কাজে লাগবে চিন্তা করা যায় না। গাড়িটার আশা একেবারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। গ্যারেজের পিছনে জঙ্গল গজিয়েছে। জঙ্গলে ডাহুক ডাকছে। কাজেই কেবল ডাঙা না, ওধারটায় জল আছে, বলাই চিন্তা করল। হয়তো জলা নিয়েই জঙ্গল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বলাই ভাঙা লরীর ফুটবোর্ডের ওপর বসল। হেঁটে হেঁটে পা দুটো ধরে গেছে। খবর পেয়েছে সে এখানে এই পড়ো গ্যারেজে সন্ধ্যার দিকে রজনী তার দলবল নিয়ে আসে। মিটিং বসে। কাজের কথা হয়। রজনীর ডেরার ঠিকানা নতুন লোককে দেওয়া হয় না। কি জানি যদি পুলিসের লোক হয়। যদি রজনী আর তার দলকে ধরিয়ে দেবার কুমতলব থাকে বলাইর—খুব বেশি দিন তো তার সঙ্গে পরিচয় হয় নি; করে মনে কি আছে চিন্তা করে ইয়াসিন সম্ভবত বলাইকে এই জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেছে। যা হোক, তবু যে ইয়াসিনের দেখা পেয়ে গেছে সে কলকাতায় পা দিতে না দিতে—না হলে

রজনীকে পেতে বলাইর যথেষ্ট বেগ পেতে হত, চিন্তা করে বলাইর ভাল লাগল। ভাল লাগল কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আর এতটা পথ হাঁটার দরুণ তার শরীরের অবস্থা এমন হয়েছে যে তার ইচ্ছা করছিল শুয়ে পড়ে। গাড়ির পাটাতনের ওপর উঠে শুয়ে পড়বে কিনা সে চিন্তা করছিল। বড় বড় হাই উঠল। বসে রইল সে এই কারণে যে শুয়ে পড়লে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। ঝির ঝির হাওয়া দিচ্ছে। সে ঘুমিয়ে আছে, এই অবস্থায় যদি রজনী এসে দেখতে পায় ভাববে লোকটা অলস, ভাববে হাতে পয়সা আছে, কাজ কারবারে নামবার গরজ কম; কে জানে হয়তো—

বলাইর চিন্তায় ছেদ পড়ল। মানুষের পায়ের শব্দ না? কান খাড়া করে ধরল সে। অন্ধকার হয়ে গেছে। ওধারের পাটকলের চিমনি বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল, যেন এক সঙ্গে অনেকগুলি শিয়াল চেঁচিয়ে উঠে সিফ্‌ট বদলের কথা জানিয়ে দিল। বলাই নড়ে চড়ে বসল। চিমনির আওয়াজ থামতে তিনটা মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়ায়। না, ইয়াসিন নেই। সকলের পিছনের লম্বা ছিপছিপে চেহারার মানুষটা রজনী—বলাই এক নজর দেখে চিনল। যেন ক-মাসে আরো রোগা হয়ে গেছে মানুষটা। সঙ্গের দুটো লোককে বলাই চেনে না। বলাইর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। যা হোক ইয়াসিন তবে রজনীকে জানিয়ে দিয়েছে শিয়ালদার চোলাইয়ের দোকানের ছোঁড়া তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ইয়াসি-নের ওপর কৃতজ্ঞতায় বলাইর মন ভরে উঠল।

'কি খবর?' রজনী এগিয়ে এল। হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে কাশল দুবার। সঙ্গের লোক দুটো সরে গিয়ে ভাঙ্গা লরীর পিছনে ইটের পাঁজার ওপর বসল। যেন দুজন কি ফিস ফিস করে।

'দোকান উঠে গেছে।' রজনীর সরু নাকটার দিকে সারাসরি তাকাতে বলাই ইতস্তত করে, তারপর অবশ্য তাকায়, রজনীর নাক দেখে চোখ দেখে কপাল দেখে; রোগা হলেও ঐ মাথাটার অনেক দাম—বলাই চিন্তা করে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল। অনেক দুষ্কর্ম করে রজনী আজও জেলের বাইরে রয়ে গেছে। তাকে ধরবার জন্য পুলিসের লোক রাতদিন ঘুরছে—কিন্তু রজনী তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

'তা এখন কি করা হচ্ছে?' রজনী জংধরা ফুটবোর্ডর ওপর বসল।

'বেকার।' বলাই মাটির ওপর বসল।

'চলন্ত-ট্রেনে ওঠার অভ্যাস আছে?' রজনী প্রশ্ন করল।

'আছে।' বলাই সরাসরি মিথ্যা কথাই বলল।

'জানিস তো, এসব কাজের অনেক ঝুঁকি। একটু বেসামাল হলে চাকার নীচে পা চলে যাবে—তার পর তো বুঝতেই পারিস।' রজনী একটু চুপ থেকে কি যেন চিন্তা করল, তার পর: 'আর রাত দিন লাইনের ধারে ধারে বন্দুক নিয়ে পুলিস ঘুরছে—সন্দেহ হলেই গুলী ছুঁড়ছে।'

'জানি।' বলাই অল্প হাসল। এমন ভাবে হাসল যেন সব জেনেশুনে সে রজনীর দলে ভর্তি হতে চাইছে।

রজনী আর কিছু বলল না, উঠে ভাঙ্গা লরীর পিছনে চলে গেল। যেন কি পরামর্শ করল সে দলের সেই লোক দুটোর সঙ্গে। বলাই একলা চুপচাপ বসে থেকে যখন ভাবছে তখন গাড়ির পিছন থেকে রজনীর দলের সেই দুজনের একজন তার সামনে এসে দাঁড়ায়। এবার ভাল করে বলাই মানুষটাকে দেখতে পায়। অল্প বয়স। বলাইর চেয়ে অনেক ছোট হবে। কদম ফুলের মত ছোট করে চুল ছাঁটা, বুকটা চেতানো, নাকটা থ্যাবড়া। পরনে হাফ-প্যাণ্ট। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি।

'নাম কি?' ছোঁড়া এমন কটমট করে বলাইর দিকে তাকায় যে বলাইর রাগ হয়। কিন্তু এখন রাগ করলে চলবে না চিন্তা করে সে ধৈর্য ধরে থাকে। বরং হেসে প্রশ্ন করে, 'তোর নাম কি?'

'নাম নেই।' ছেলেটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'তিন নম্বর বলে সবাই ডাকে।'

বলাই এত বড় একটা ঢোক গিলল। আর কথা বলল না। বুঝল এখনই নিজের নাম-ধাম ওরা কেউ বলাইর কাছে প্রকাশ করবে না। নিশ্চয় দলের সর্দার রজনী বারণ করে দিয়েছে।

'আস্তানা কোথায়?' ছেলেটা আবার প্রশ্ন করে।

'নেই।' বলাই একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ে—ইচ্ছা করে ছাড়ে, যাতে রজনীর সাকরেদ শুনতে পায়। 'এখন ভাই ফুটপাথে রাত কাটছে।'

'বৌ টৌ আছে? ছেলেপুলে?'

বলাই এবার শব্দ করে হাসল।

'না, বিয়ে করি নি। খেতে পাইনে তো আবার—'

সঙ্গের আর একজনকে নিয়ে রজনী এসে দাঁড়ায়।

'হুঁ, তিন নম্বর তোকে একজায়গায় নিয়ে যাবে। কোথায় যাচ্ছিস কেন যাচ্ছিস এখন বলা হবে না। তবে একটা কথা মনে রাখবি, যদি বেইমানি

করেছিস আমার কানে আসে তোর মাথা থাকবে না। চলি।'

আর দাঁড়ায় না রজনী। তিন নম্বর ছোঁড়া দাঁড়িয়ে থাকে। সঙ্গের সেই বেঁটে লোকটা রজনীর সঙ্গে চলে যায়। লোকটার চেহারা ভাল করে দেখার সুযোগ পায় না বলাই। কিন্তু চোখ দুটো অসম্ভব ছোট এবং সাংঘাতিক জলজল করছে এটুকু বলাইর চোখে পড়ল। লোকটাকে হয়তো দু নম্বর বলে ডাকা হয়—দু নম্বর কি দশ নম্বর তাই বা কে জানে। বলাই চিন্তা করে। যেন বাঙ্গালী না। হিন্দুস্থানী। বলাই অনুমান করল।

দুজন চোখের আড়াল হতে তিন নম্বর বলাইর দিকে হাত বাড়ায়।

'বিড়িটিড়ি আছে ?'

বলাই মাথা নাড়ে।

'একটা ফুটো পয়সার মুখ দেখি না আজ তিনদিন—বিড়ি কিনব কি।'

ছেলেটা শব্দ করে থুথু ফেলল।

'রাস্তার ভিক্ষুক।'

'তাই ভাই, তাই—' বলাই রাগ করে না। 'কারবার ফেল পড়ে ভিখিরীর অধম হয়ে গেছি।'

কিন্তু এখন এসব দাঁড়িয়ে শোনার সময় না এমন ভাব দেখিয়ে তিন নম্বর ঘুরে দাঁড়ায় ও হাঁটতে আরম্ভ করে। বলাই দাঁড়িয়ে থাকে। দু পা এগিয়ে ছেলেটা ঘাড় ফেরায়। শব্দ না করে হাতের ইশারায় বলাইকে ডাকে। বলাই এগোয়।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটল দুজন। কথা নেই। জঙ্গলের ধার ধরে ধরে তারা খালের কাছে এসে যায়। চাঁদ উঠেছে। দূরে রেল লাইন। ডিস্‌টাণ্ট সিগন্যালের নীল আলো চোখে পড়ে। একটা ঝাঁকড়া মাদার গাছের নীচে তিন নম্বর দাঁড়ায়। বলাইকেও থামতে হয়। তার পা চলছে না। বলাই বসে পড়ল। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল।

'এখন কি গাড়ি আসবে ? মাল গাড়ি ?'

'হুঁ, সিমেণ্ট। চার ওয়াগন।'

ছোঁড়ার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায় বলাই। এরই মধ্যে কি করে খবর এসে গেছে ? নিশ্চয় রেল কোম্পানীর লোকের কাছ থেকে খবর যোগাড় করা হয়েছে। হয়তো ওখানেও রজনীর দলের লোক আছে। বলাই চুপ করে

রইল। রাত এখন কত অনুমান করতে পারছে না সে। দশটা বাজল কি! মনে মনে প্রশ্ন করে সে। এতক্ষণ চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া ছিল। আবার গুমট দিতে আরম্ভ করেছে।

'এপথে এলি কেন?'

'তুই এলি কেন?'

বলাই আঙুল দিয়ে নিজের পেট দেখাল।

তিন নম্বর এই প্রথম হাসল। যেন অনেকক্ষণ একসঙ্গে থেকে তার মেজাজ নরম হয়েছে, দলের নতুন লোকের সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলতে চাইছে বুঝি। বলাইর পাশে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছোঁড়া। প্যাণ্টের পকেট থেকে কৌটা বার করে, দেশলাই। বলাই মনে মনে হাসে। সঙ্গে বিড়ি রেখে এতক্ষণ খায় নি, বলাইর কাছে বিড়ি চেয়েছিল। কিন্তু বলাই তাতে কিছু মনে করল না। নিজেরটা যতক্ষণ পারে মানুষ বাঁচিয়ে রাখে, খরচ করতে চায় না। ছোঁড়ার দোষ নেই।

বলাইর হাতে একটা বিড়ি তুলে দিয়ে ছোঁড়া নিজেরটা ধরায়।

'একলা পেটের জন্যে আমি শালা চুরি করতাম না।'

'আর কে আছে তোর?' বিড়ির মাথায় দেশলাইয়ের কাঠি ঠেকিয়ে বলাই শুধায়।

'বুড়া বাপ মা, তিনটে বোন কাঁধের ওপর।'

'সোমত্থ!'

'না, এইটুকুন সব। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের ছাওয়াল সব।'

'তুই বুঝি আগের পক্ষের?'

'হুঁ।' ছোঁড়া তারপর বলে গেল সব। দুবছর হয় তার বাবার চাকরি গেছে। ওষুধের কোম্পানিতে চাকরি করত। ইউনিয়ন করত বলে মালিক ছাড়িয়ে দেয়। অবশ্য সে কথা মালিক বলে না। বুড়ো মানুষ দিয়ে কাজ চলে না, এই বলে নোটিশ দিয়ে তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে চাকরিও গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা বিছানা নিল। আমবাত। উঠতে পারে না চলতে পারে না। কাজেই সুধীরকে রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হল। ইস্কুলে পড়ছিল। পড়া হল না। বিস্তর হাঁটাহাঁটি ধরাধরি করে অফিস-টফিসে কাজ পেল না। তার পর মৌলালির একটা চায়ের দোকানে কাজ নেয়। বড় ছেলে, একমাত্র ছেলে, কাজেই তার রোজগার সংসারের আশা ভরসা। দুট্

করে নিজের নামটা প্রকাশ করে ফেলল তিন নম্বর। বলাইর হাসি পেল। হাসল না যদিও। কিন্তু ছোঁড়ার কথা শুনে কেমন যেন একটু মায়া হল তার। আসলে ছেলেটা সরল। ভাবল সে।

'চায়ের দোকান ছাড়লি কেন?'

'পোষায় না। ত্রিশ টাকা মাইনে—গাধার খাটুনি।' সুধীর থামল, যেন কি চিন্তা করল একটু সময়। হাতের পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তা হলেও আমি ঐ দোকানে লেগে থাকতাম—কিন্তু পারলাম না মুকীর জন্য।'

'মুকী কে?' বলাই ঢোক গিলল।

'মুকুল—আমি চা বানিয়েছি আর ঐ শালী খদ্দের এলে চা দিয়েছে।'

'অ!' বলাই এখন বুঝল। চায়ের দোকানের মেয়ে। 'ঝগড়া হয়েছিল বুঝি মেয়েটার সঙ্গে?' বলাই চোখ ট্যারা করে সঙ্গীর মুখ দেখে।

সুধীর মাথা নাড়ল।

'ঝগড়া করবে কি—মুখে ঝগড়া করার মেয়ে না—খচ্চর, আসল খচ্চর।' একটু চুপ থেকে সুধীর এমন স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করল, যেন এই মাত্র সে কেঁদে উঠেছে। বাবার পুরনো হাতঘড়িটা বিক্রী করে সে মুকুলকে শাড়ি ব্লাউজ কিনে দিয়েছে। নিজের জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে এটা ওটা কিনে দিত ওকে। কি, একদিন কালীঘাটে গিয়ে দুজন দুজনের মাথায় হাত রেখে দিব্যি করে এসেছিল। তারা বিয়ে করবে। এবং বিয়ে করে ধারদেনা করে বা যেভাবে হোক কিছু টাকা যোগাড় করে একটা চায়ের দোকান দেবে। দুপুরে ম্যানেজার যখন চেয়ারে বসে ঢুলত, যখন দোকানে খদ্দের থাকত না, দুজনে পিছনের কামরায় বসে কত সব জল্পনা করেছে—একদিন না—দেড় বছর। তার পর—

বলাই চমকে উঠল। দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে ছেলেটা কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

বলাই আস্তে তার কাঁধের ওপর হাত রাখল।

'কি হল! হুঁ, তার পর—' বলাই গলাটা নরম করে প্রশ্ন করে।

'পালিয়ে গেল শালী। তিন দিন হয় নি দোকানে ঢুকেছিল মেধো শালা। ওই শালার সঙ্গে কিনা হারামজাদী মজে গেল। প্রথম দিন বুঝি নি। দ্বিতীয়

দিনে দেখলাম দুজনে ফিসির ফিসির করছে। আমার দিকে শালী আর চোখ তুলে তাকায় না। ভাবলাম শোধ তুলতে হবে অপমানের। পরদিন কামাই করলাম—দোকানে গেলাম না, মন খারাপ করে সারাদিন রাস্তায় ঘুরলাম আর চিন্তা করতে লাগলাম মুকুলকে কি করে শিক্ষা দেওয়া যায়—ক টাকা আর কামাতাম—ঐ থেকে বাড়ির সবগুলোকে ধরতে গেলে একরকম উপোসে রেখে ওর শাড়ি সায়া তেল পাউডারের খরচ জুগিয়েছি ; নিজের টাকা খরচ করত না, মার হাতে তুলে দিত। হুঁ, পেয়েরাবাগানের মেয়ে, বলে কিনা খাঁটি গেরস্থঘর ওদের—অভাবে পড়ে রেষ্ট রেণ্টে ঢুকেছে। গেরস্থ না ছাই—বেশ্যা—ভালমানুষের সন্তান এমন হয় না।' সুধীর চুপ করল।

'তা ওরা পালাল কবে ?'

'যেদিন আমি কামাই করলাম ঠিক সেদিন দুপুরে—ম্যানেজারবাবু নাকি মাঝখানে একসময় দোকান থেকে বেরিয়ে পিছনের গলিতে পায়খানা করতে গিয়েছিল। আর সেই ফাঁকে ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে সব টাকা তুলে দুজন দোকান ছেড়ে চলে গেছে।'

'পুলিসে খবর দেয় নি ? দিনদুপুরে ক্যাশ তুলে পালিয়ে গেল !' বলাই অবাক।

'কে জানে, সে খবর আমি রাখি না। পরদিন দোকানে গিয়ে দেখি ম্যানেজারবাবু একলা মুখভার করে বসে আছে। দোকানের একটা দরজা মাত্তর খোলা, বাকি সব বন্ধ। দোকানের উনুনটা পর্যন্ত জ্বলছে না। খদ্দের নেই।'

'তোকে কিছু বলল ? না কি তোকেও সন্দেহ করছিল ?'

সুধীর মাথা নাড়ল।

'আমাকে সন্দেহ করবে কেন ? চালাক লোক বাবু। আমার হাতে চাবি দিয়ে কতদিন বাইরে কাজেকর্মে বেরিয়ে গেছে, তা ছাড়া সেদিন আমি দোকানে ছিলাম না। আমায় তখনি পাঠাল পেয়ারাবাগানে। ছুটে গিয়ে জানলাম মুকুল রাত্রে ফেরে নি, সকালে ফেরে নি, দুপরেও না—মা উল্টা আমার ওপর অসন্তুষ্ট খবর নিতে গেছি বলে। বলে কিনা কুটুমবাড়ি বেড়াতে গেছে হয়তো—'

'তবে বোধ করি আগে থাকতে মেধোর সঙ্গে মেলামেশা ছিল মেয়ের—মেয়ের মাও জানত এসব হবে।'

'পঁচিশ টাকা চুরি হয়েছিল ক্যাশ থেকে। ম্যানেজারবাবুর খুব একটা লোকসান যায় নি। কিন্তু শপথ করল, দোকানে আর মেয়েছেলে রাখবে না। আমি অবিশ্যি দুদিন না যেতে বললাম, আমায় ছুটি দিন, আর কাজ করব না।'

'কেন ?' বলাই আর একটা বিড়ির জন্য উসখুস করছিল।

টের পেয়ে সুধীর সঙ্গীর হাতে বিড়ি তুলে দিয়ে বলল, 'না, মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল! দোকানের চেয়ার টেবিল উনুনের ধার মায় পেয়ালা পিরিচগুলোর মধ্যে আমি যেন বেইমানির গন্ধ পেতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল আমি ওখানে কাজ করলে মরে যাব—শক্ত অসুখে পড়ব। চলে এলাম।'

'এখানে এলি কি করে, রজনীর দলে ?'

'সে অনেক কথা। আর একদিন বলব। মোটরের পোঁ শুনছি না ?' সুধীর হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকায়। বলাইও শুনল। একটু ভয় পেল যেন সে।

'পুলিসের গাড়ি! আমরা কি ওই ঝোপের পিছনে গিয়ে লুকোব ?'

'আরে না-না।' সুধীর অল্প হেসে বলাইর হাত চেপে ধরল। 'লরী নিয়ে সাত নম্বর আসছে। সোওয়া এগারটা। এগারটা সাতাশের গুড্‌স টেরেন আসার সময় হল।'

সুধীরের কথা শেষ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে একটা লরী এসে তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়ায়। হেড-লাইট নেবানো। লরী থামতে সুধীর উঠে দাঁড়ায়, বলাই উঠে দাঁড়ায়।

দরজা খুলে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এল। কালো মুখোশ পরা মানুষ। কাজেই মুখ চেনার উপায় নেই। গাড়িতে আর কেউ নেই। তবে ড্রাইভারকেই সাত নম্বর বলে ডাকা হয়—বলাই চিন্তা করল। হাত পা কোমর ও বুক দেখে বলাই অনুমান করল সেই বেঁটে লোকটা। তখন গ্যারেজে একটু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল।

হাতের ইশারায় ড্রাইভার সুধীরকে ডাকল। সুধীরের সঙ্গে কানে কানে কি যেন কথা হয়। সুধীর গাড়ির ভিতরে ঢোকে। যখন বেরিয়ে আসে তার ডান হাতে কি সব কাপড়চোপড় দেখা যায়। রেশনের থলের মত একটা থলে বাঁ হাতে ঝুলছে। থলেটা বলাইর সামনে মাটিতে রেখে সুধীর ডান হাতের একটা কালো কাপড় বলাইর দিকে বাড়িয়ে দেয়। 'ওটা চট্ করে পরে নাও দাদা।'

সুধীরের দাদা ডাক শুনে বলাই খুশি হয়। ছেলেটার ওপর তার মায়া জন্মে যাচ্ছে। সম্ভবত ওই রেষ্ট রেণ্টের মেয়েটা তার সঙ্গে এমন বজ্জাতি করেছে শুনে বলাইর কষ্ট হচ্ছিল। টুপির মত দেখতে কাপড়টা হাতে করে বলাই

দাঁড়িয়ে থাকে। 'কি হল, চট্ করে মাথায় ঢোকাও।' সুধীর তাড়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে হাতের আর একটা মুখোস সে নিজে পরে নেয়। 'উঁহু—মুখের দিকের ডুরেটা টেনে ওটা ফাঁক না করলে মাথায় ঢুকবে কেন।' ফিস ফিস করে ওঠে সুধীর। তার পর বলাইর হাতে থেকে মুখোশটা কেড়ে নিয়ে বলাইকে পরিয়ে দেয়। বলাই হঠাৎ কেমন হাঁসফাঁস করে ওঠে, যেন ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না।

'আর আঁটব ?' এখন আর সুধীরের মুখ চেনা যায় না। ছুটো ফুটোর ভিতর দিয়ে সে বলাইকে দেখছে। বলাইও মুখের ঢাকনার কাটা অংশ দিয়ে সুধীরকে দেখে, মুখোশ পরা সাত নম্বরকে দেখে। 'না, আর আঁটতে হবে না।' বলাই এবার নিজেই গলার দিকের ডুরেটা বেঁধে নেয়।

দূরে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা হুইসেলের আওয়াজ শোনা গেল।

রেশনের থলেটা তুলে নিয়ে সুধীর বলাইকে মাথা নেড়ে ইশারা করে। বলাই তার সঙ্গে এগোয়। সাত নম্বর দাঁড়িয়ে থাকে।

'ওতে কী আছে ?' বলাই প্রশ্ন না করে পারে না।

'বোমা।'

বলাইর গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাই, মনে মনে চিন্তা করে সে, চুরি ডাকাতি করতে সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হয়। বৈঠকখানা বাজারের হারুর কথা মনে পড়ল বলাইর। আলুর গুদামের পিছনে একটা ঘরে হারু হাতবোমা তৈরী করত। প্যাকিং বাক্স তৈরী হত হারুদের কারখানায়। সামনের সবটা জমি জুড়ে কাঠের বাক্সের পাহাড় জমে থাকত। আর মাঝে মাঝে লরী এসে সেগুলি তুলে নিয়ে যেত। বলাই জানত দরকার মতন হারু ঐ সব প্যাকিং বাক্সের মধ্যে হাত বোমা পুরে এখানে ওখানে চালান দিত। বড় বড় পার্টি ছিল তার হাতে। শহরে শহরতলীতে রাতদিন হাঙ্গামা লেগে আছে, রোজ ক্রেকার ফাটছে এমন দিন গেছে। তখন হারু বেশ মোটা পয়সা কামিয়েছে নিজের হাতের তৈরী বোমা বেচে। সেদিন তাদের চোলাইয়ের দোকান যখন পুলিস ঘেরাও করে বলাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ঘুমন্ত অবস্থায় পুলিস আসে। না হলে সে পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে চলে যেতে পারত হারুর কাছে। ছুটো বোমা যোগাড় করতে পারলেই হত। পরে বলাইর আফসোস হয়েছে। অবশ্য হারু বেশিদিন কারবার চালাতে পারে নি। এই তো সেদিনের ঘটনা। রাজা-বাজারের কাছে ট্রামের সঙ্গে হারুর প্যাকিং বাক্স বোঝাই লরীর ধাক্কা লাগে।

একটা বাক্সে বোমা ছিল। বাস—আর কথা নেই। সে কী ভয়ঙ্কর আওয়াজ। একটা রিক্সাওয়ালা লরীর ঠিক পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। লোকটার মাথা উড়ে যায়। রাস্তার পাশের একটা জুয়েলারী দোকানের শো-কেস-এর আয়নাগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়। আর জখম হয় ফুটপাথের একটা ভিখিরী। লরীওয়ালা বেঁচে যায়, ট্রামটারও কিছু হয় নি। ভাগ্যিস বোমার বাক্সটা লরীর ঠিক পিছনের দিকে রাখা হয়েছিল। সেই থেকে পুলিস হারুর বোমা তৈরীর কারখানার সন্ধান পায়। হারু সম্ভবত এখনও জেলে আছে। কাজেই কী সাংঘাতিক জিনিস ঐ রেশনের ব্যাগে নিয়ে সুধীর হাঁটছে বলাইর অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যদি কোন রকমে ইটপাথরে একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে সুধীর তো একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে। ভয় করছিল বলাইর সুধীরের সঙ্গে হাঁটতে। একটু পিছনে পিছনে হাঁটলে ভাল হয় না কি ?

'কি দাদা, পা চলছে না ?' সুধীর ঘুরে দাঁড়ায়।

'না, এই তো চলছি।' বলাই জোরে পা চালায়।

এবার দুজন পাশাপাশি হয়ে হাঁটে। দু মিনিটের মধ্যে তারা রেল লাইনের উঁচু পাড়ের কাছে এসে গেল। চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকারটা এখন পাকা হয়েছে। ওদিকের আকাশটা ফর্সা। উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের আলোর জন্য এরকম দেখায়। সুধীর আর দাঁড়িয়ে নেই, বসে পড়েছে। দেখাদেখি বলাইও ঘাসের ওপর বসে পড়ল। দূরে গুমগুম আওয়াজ শোনা গেল। 'মালগাড়িটা আসছে।' বলাই ফিসফিস করে বলে। সুধীর মাথা নাড়ে : 'প্যাসেঞ্জার। সাত মিনিট পর গুডস টেরেন আসবে। উঁহু, শুয়ে পড়।' সুধীর ঘাসের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে পা দুটো পিছনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। বলাইও তা করে। প্রচণ্ড শব্দ করে মাটি কাঁপিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেল। যেন ট্রেনটা এক সেকেণ্ডের জন্য উল্টাডাঙ্গা স্টেশন ধরে আবার হুসহাস শব্দ করে বেরিয়ে যায়। সুধীর ও বলাই কান খাড়া করে সব শোনে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের আলোটা জবাফুলের মত লাল হয়ে ছিল। ধক্ করে আলোর রং নীল হয়ে যায়। আর কোথাও কোন শব্দ নেই। যেন কোথায় ব্যাং ডাকছে। হাতে পায়ে মশার কামড় অনুভব করছে দুজন, কিন্তু নড়ছে না। এমনি ঘাসের সঙ্গে মিশে শুয়ে থাকতে হবে। ওপরে রেললাইনে। নীচে নালা। জলকাদায় থিক থিক করছে। ওই পচা জল থেকে মশা উঠে আসছে বলাই অনুমান করল। ঢালুর ওপর শুয়ে আছে বলে ওপর দিকটা ওরা দেখতে পায়। রেল লাইন, টেলিগ্রাফের তার, আকাশ। লাখ লাখ

তারা জলছে।

যেন কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল বলাই, আঙল নেড়ে সুধীর তাকে চুপ থাকতে ইশারা করে। আর সেই মুহূর্তে শোনা যায় গুমগুম আওয়াজ। এবার উল্টা দিক থেকে শব্দ আসছে। অর্থাৎ উল্টাডাঙ্গা হয়ে ট্রেন শেয়ালদা দিকে যাবে।

'মাল গাড়ি ?' বলাই ফিসফিস করে।

সুধীর এবারও কথা না বলে মাথা নাড়ে এবং আঙল নেড়ে বলাইকে চুপ থাকতে ইশারা করে। বুকের ভিতর ঢুবঢুব করছে বলাইর। সিমেণ্ট নিয়ে আসছে মাল গাড়িটা। গাড়িটা কি এখানে দাঁড়াবে ? না দাঁড়ালে সিমেণ্ট কি করে নামানো হবে ? বোধ হয় ট্রেনটা ওই সিগন্যালের খুঁটি পার হয়ে আস্তে আস্তে চলবে। তবেই না চলতি গাড়ি থেকে তারা মাল খালাস করার সুবিধা পাবে। কিন্তু তারা দুজনে আর ক বস্তা সিমেণ্ট নামাতে পারবে। রজনীর দলে কি আর লোক নেই ? বলাই বেশ ভাবনায় পড়ে যায়। কান খাড়া রেখে সে ট্রেনের শব্দ শোনে। শব্দ ক্রমে বড় হচ্ছে ভারী হচ্ছে। সুধীরও মাথা তুলে ধরেছে। বোমার থলেটা এক পাশে শুইয়ে রেখেছে সে। না, ট্রেন উল্টাডাঙ্গা ধরল না। সোজা এদিকে ছুটে আসছে। বলাই ভেবে পেল না, এভাবে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকলে তারা কী করে ওয়াগন থেকে সিমেণ্টের বস্তা নামাবে। লাফিয়ে চলতি ট্রেনে যদি উঠতে হয় তবে তো এখনে তাদের উঠে লাইনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সুধীরের সেরকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বলাই অস্বস্তি বোধ করে। অথচ কিছু সে জিজ্ঞেস করবে তারও উপায় নেই। কথা বলতে গেলে সুধীর হাতের ইশারায় বলাইকে থামিয়ে দেবে। কানে তালা লাগে—এত জোরে মালগাড়ি ছুটে আসছে ; মাটি কাঁপছে বুক কাঁপছে ; ইঞ্জিনের মাথার চড়া আলোটা সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বড় হচ্ছে, কাপড়ের ফুটোর ভিতর দিয়ে ওদিকে তাকাতে গেলেও যেন চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আর এক সেকেণ্ড। হুসহাস শব্দ করতে করতে দৈত্যের মত এত বড় ট্রেন কাছে চলে এল। না, দাঁড়ায় না, গতি শিথিল করার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই, বাঁ দিকের সিগন্যাল গাঢ় নীল বর্ণ হয়ে আছে—লাইন পরিষ্কার, কাজেই গাড়ির দাঁড়াবার কথা নয়। তবে বোধ হয় সিমেণ্ট নেই এ-গাড়িতে—রজনীর দল ভুল খবর পেয়েছে, চিন্তা করে বলাই মাটি থেকে মাথাটা একটু তুলে ধরে যখন ওপরের দিকে তাকাতে গেছে, তখন কালো কালো সব বস্তা চলতি গাড়ি থেকে ছিটকে লাইনের দুধারে ছড়িয়ে

পড়ল। যেন বস্তাগুলির প্রাণ আছে এমন ভাবে সব লাফিয়ে নীচে ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল, একটা বস্তা গড়িয়ে লাইনের উঁচু জমি ছেড়ে নীচে নালার কাছে চলে গেল। ট্রেন সরে যেতে সুধীর স্প্রীং-এর মত লাফিয়ে উঠে বসে, তারপর লাইনের কাছে ছুটে যায়। বলাই সুধীরকে অনুসরণ করে। বলাই হতভম্ব হয়ে গেল। না, সবই সিমেণ্টের বস্তা না, কালো মুখোস পরা ঢুটো মানুষও চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছে! গা ঝাড়া দিয়ে তুজন উঠে দাঁড়ায়। সুধীর ইশারা করতে বলাই তাদের সঙ্গে বস্তা টানতে আরম্ভ করে। আবার অস্পষ্ট একটা হুইসেলের শব্দ শুনে সে ঘাড় ফেরায়। ও'দিক দিয়ে ঘুরে লরীটা ক্রসিং লেবেলের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন বলাই বুঝল চোরাই সিমেণ্টের বস্তাগুলি ঐ লরীতে তোলা হবে। লরী দাঁড় করিয়ে মুখোশ-পরা বেঁটে ড্রাইভারটা তাদের কাছে ছুটে আসে। পাঁচ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে ভারী ভারী বস্তাগুলি টেনে লরীতে তোলা হয়। এগারোটা বলাই গুণল। এক বস্তা সিমেণ্টের দাম কত? এগারো বস্তা বিক্রী করে মোট কত টাকা পাওয়া যাবে? মনে মনে সে হিসাব করছিল যেন; কিন্তু হিসাবটা শেষ করতে পারে না, এক জনের হাতের ধাক্কা খেয়ে বলাই চমকে ওঠে। লাফিয়ে সবাই লরীতে উঠছে, বলাইও উঠল। লরী ছেড়ে দেয়। রেল লাইন ছেড়ে গাড়ি নীচু জমির মাটির সড়ক ধরে এগোয়। কোথায় যাচ্ছে তারা এখন? তিন নম্বর ছোঁড়াকে প্রশ্ন করতে বলাই ঘাড ফেরায়। বস্তার ফাঁকে ফাঁকে মুখোশ-পরা তিন জন চুপচাপ বসে আছে। সুধীরের মুখ কোন্‌টা বলাই হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। ওই ড্রাইভার ছাড়া বলাই এখন আর কাউকে আলাদা করে চিনতে পারছে না। চিনতে পারত যদি তখনকার মত বোমার থলেটা হাতে করে থাকত সুধীর। কিন্তু ওটা ওপাশে ঢুটো বস্তার মাঝখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কাজেই—

কাজেই সকলের মত বলাই চুপ করে বসে থাকে। মাটির রাস্তা পার হয়ে লরী বাঁধানো সড়ক ধরে এগোয়। তবে কি তারা শহরের দিকে যাচ্ছে। বলাইর চিন্তায় ছেদ পড়ে। লাইনের ওধারটায় গুরুম করে প্রচণ্ড শব্দ হয়। বাতাসে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে শব্দটা কাঁপতে কাঁপতে এখান পর্যন্ত ছুটে এল। ফায়ার করছে পুলিস। হয়তো ওদিকের সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। হয়তো চলতি ট্রেনের ওপর চোখ বুলিয়ে ধরে ফেলেছে একটা ওয়াগনের মুখ খোলা—রাস্তায় সিমেণ্টের বস্তা পাচার হয়ে গেছে। না কি, আর এক দল ওয়াগন ভেঙ্গে অন্য কিছু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল? আবার শব্দ হয়। কিন্তু এবারের

শব্দ মৃদু। রেল লাইন এখন অনেক দূরে। লরীটা ক্রমাগত ছুটছে। বলাইর বিড়ির তেষ্টা পায়। মুখোশ পরা তিনটা মুখের কোনটা সুধীরের আর একবার চিনতে চেষ্টা করবে বলে বলাই ঘাড় ঘুরিয়ে কালো কাপড়ের ফুটোর ভিতর দিয়ে পিট পিট করে তাকায়। কে জানে, হয়তো আমাকেও সুধীর চিনতে পারছে না, বলাই চিন্তা করল, সিমেন্টের বস্তার সঙ্গে ওয়াগন থেকে লাফিয়ে পড়া আর-দুটো মানুষের সঙ্গে নিশ্চয় সুধীর আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে।

॥ একুশ ॥

পরদিন একটি নতুন মানুষ এ-বাড়ি বেড়াতে এল। একটি মেয়ে। মুক্তার বয়সী, কিন্তু গায়ের রং মুক্তাব চেয়ে অনেক বেশি ফর্সা, মুখখানাও সুন্দর। গরুর গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটি রতি মতির পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। একটা বেগুনী রং শাড়ি পরা। হলুদ রং ব্লাউজ গায়ে। টান করে খোঁপা বাঁধা। সঙ্গে দুটো কুমড়ো, কিছু লাউডাঁটা, আর এত বড় একটা মানকচু নিয়ে এসেছে মেয়েটি। গাড়োয়ান গরুর গাড়ি থেকে সব টেনে নামায়।

'এত সব আনার দরকার ছিল কি?' রতি শুধায়।

মেয়েটি চুপ করে হাসে।

'জামাই আছে কেমন?' মতি শুধায়।

'ভাল আছে।' মেয়েটি এবার ফিক করে হাসে।

রতি-মতির ভাগ্নী। মুক্তা পরে জানতে পারল। নাম সাবি। গত বছর বিয়ে হয়েছে। গাঁয়ের নাম নিশ্চিন্তপুর। দু দিনের জন্য বেড়াতে এল ও মামাবাড়ি। বুড়ো দাদু কবে মরে যায়, দেখতে এসেছে।

বুড়ী পিসি এক গাল হেসে বলছিল, 'তো একলা এলি, জামাই এল না যে বড়?'

সাবি ঘাড় নেড়ে বলেছে, এখন পাট বোনার সময়, এখন কি কুটুমবাড়ি বেড়াতে আসার সময় ওর? দাদুকে দেখতে মন ছটফট করছিল তাই বাড়ির গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ও একলাই চলে এসেছে।

হুঁ, বেশ গল্প করতে পারে রতি-মতির ভাগ্নী। অন্ধ মনোহর নাতনীকে কাছে ডেকে কুশলবার্তা ও নিশ্চিন্তপুরের আর পাঁচটা খবর জিজ্ঞেস করল। দাদুকে সব

খবর বলা শেষ করে সাবি সোজা এসে রান্নাঘরে ঢুকল। মুক্তা উনুন ধরাবার উদ্যোগ করছে। দামিনী সাবিকে দেখে মহা খুশি। হাত নেড়ে হিঁ হিঁ এ্যাঁ উঁ নানা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে রতি-মতির ভাগ্নীকে সংবর্ধনা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হাত ও ঠোঁটের ইশারায় বোবার একথা-সেকথার জবাব দিতে দিতে সাবি চোখ বড় করে মুক্তাকে দেখল। পরিচয় করিয়ে দিল পিসি। সাবির পিছে পিছে বুড়ী রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের মেয়ে। যাকে বলে বাস্তুহারা। বিপাকে পড়েছে। ভাই কলকাতায় দোকান নিয়ে আছে। সোমত্থ বোনকে রাখবার জায়গা নেই। কদিন এখানে থাকবে। তারপর সুবিধামতন ভাই এসে মুক্তাকে নিয়ে যাবে। 'তা মেয়েটি ভাল, কাজকর্ম সব জানা আছে, নিজের বাড়ি মনে করে দিনরাত খাটছে—'

বুড়ীর কথা শেষ হতে সাবি মুক্তার হাত ধরল। মুক্তা খুশি হয়ে মেয়েটির চোখের দিকে তাকাল। এক মিনিটের মধ্যে দু জনের ভাব হয়ে গেল।

তারপর আর কি! সারাদিন দুজনের কথা আর কথা। আজ দোকানের কাজ বন্ধ। রতি-মতি হাটে চলে গেল। শ্রীপুরের হাট না, বিদ্যুৎবার যুগল-পুরের হাট। জোয়ান মানুষদুটো বাড়িতে নেই বলে বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা চুপচাপ হয়ে রইল। দোকানের কাজ নেই, তেমনি উঠোনে ধান-সর্ষেও ছড়াতে হল না। মুক্তা প্রাণভরে সাবির সঙ্গে কথা বলতে পারল। জল তুলে দিয়ে বাটনা বেটে দিয়ে রান্নার কাজটা দামিনীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মুক্তা সেই যে সাবির হাত ধরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল আর বড় একটা সেদিকে ঘেঁষল না।

'এসো ভাই, আমরা পুকুরপাড়ে গিয়ে বসি।' সাবি প্রস্তাব দিতে মুক্তা রাজী হয়। তখন রোদ চড়ে গেছে। জঙ্গলে ঘুঘু ডাকছে। পুকুরপাড়ের রাস্তায় বাঁশঝাড় আর বেতঝোপ দেখতে দেখতে মুক্তা যখন হাঁটে তখন আজ আবার তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। এমনি ভরদুপুরে তাদের গাঁয়ের যমুনার বা শোভার হাত ধরে ও কতদিন বেড়াতে বেরিয়েছে এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। কাঁঠালের মুছি পেড়ে তেঁতুল নুন লঙ্কা মাখিয়ে খেয়েছে। দুটো বাঁশগাছ মাথায় মাথায় ঘষা খেয়ে এমনি কড়মড় আওয়াজ করত। আর থেকে থেকে ঘুঘুর উদাস ডাক, তসরকাটার 'কুটকুট নিন' মিষ্টি শব্দ—যেন বাতাসে মিশ্রী ভেঙে পড়ে।

'যেন কি ভাবছ ভাই!'

'দেশ-গাঁওয়ের কথা মনে পড়ছে।'

সাবি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তোমাদের বাস্তুহারাদের ভারি কষ্ট—দেশ বাড়ি সব ছেড়ে এসে—'

'হুঁ, মাইঝে মাইঝে মনডা চনমন করে। তা এই হ্যাশের মানুষও খারাপ না। যদি আমার ভাইয়ের কিছু সুবিধা অইত, সুখ পাইতাম।'

'এই দেশও তোমার দেশ ভাই।' সাবি মুক্তার সুন্দর মুখখানা দেখে। 'আমরা বাঙালী, তোমরা বাঙালী। তোমাদের বিপদে যদি আমরা না দেখি তো কে দেখবে?'

'হুঁ, মেলা মানুষ এইখানে জমি পাইছে, ঘরবাড়ি বানাইছে।' একটু থামল মুক্তা। 'গবর্নিমিণ্ট সুবিধা কইরা দিতাছে বাস্তুহারাগো।'

'তোমরাও জমি পাবে, ঘর পাবে।' সাবি আশ্বাস দেয়। 'এই দেশ এখন তোমাদের দেশ।'

যেন হঠাৎ আবার কি ভাবে মুক্তা।

'সব মানুষ ভাল না।'

ক্ষীণ গলায় সাবি হাসে।

'হাতের পাঁচ আঙুল সমান না ভাই।' মুক্তা চুপ থাকে। সাবি বলে, 'আমার দুই মামা খুব ভাল, রতি-মতি, কেমন না?'

মুক্তা ঘাড় নাড়ল। সাবি খুশি হল। কিন্তু মুক্তা যে রতি-মতি ছাড়া আরো মানুষের কথা ভাবছে। খারাপ মানুষ কুমারেশের কথা ভাবছে। ভাল মানুষ প্রভার কথা ভাবছে। প্রভাকে নৌকা থেকে ধাক্কা দিয়ে কুমারেশের জোয়ারের স্রোতে ফেলে দেওয়ার ছবিটা আজ কদিন পর তার মনে পড়ে। যেন হঠাৎ মুক্তার বুকের ভিতর ধ্বক্ করে উঠল। একটা নিশ্বাস ফেলল। সাবি বকছে।

'আমার শ্বশুর খারাপ, শাশুড়ী ভাল। দেওর খারাপ, ননদ ভাল।' সাবি ভাল মানুষ মন্দ মানুষ বোঝাতে তার শ্বশুরবাড়ির গল্প জুড়ে দেয়। তার পর চলে আসে নিজের স্বামীর কথায়। খুব ভাল মানুষ। সাবিকে কত ভালবাসে। স্বামীর কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার কথাগুলো সুখী মেয়েটি বাস্তুহারা মেয়েটির কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না বলে পারল না। মুক্তা কান পেতে শুনল। বেলার মনে বেলা গড়ায়; সূর্য হেলে পড়ে, গাছের ছায়া লম্বা হয়, জঙ্গলের ভিতর ডাহুক ডাকে।

ভাল মানুষ মন্দ মানুষ বলতে, মুক্তা আশা করেছিল, সাবি তার জোয়ান দুই

মামার কথা একটু বেশি করে বলবে, রতি-মতির আসল চেহারাটা মুক্তার চোখের সামনে তুলে ধরবে, কিন্তু তার কিছুই শুনতে না পেয়ে মুক্তা ছটফট করতে লাগল।

'কি হল ভাই ?' স্বামীর সোহাগের গল্প থেমে যায় সাবির।

'একটা কাঠপিঁপড়া কডাস্ করে কামড় বসাইল।' মুক্তা অল্প হাসে। তার যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, ঠোঁটটা বেঁকিয়ে ফেলে সাবির দিকে তাকায়।

'হুঁ, তবে এই ঘাস থেকেই পিঁপড়ে উঠেছে—' বলে ব্যস্ত হয়ে সাবি উঠে দাঁড়ায়। 'ওঠ ভাই, বেলা হল বাড়ি ফিরি।'

মুক্তা তাই চাইছিল। চট করে উঠে পড়ল।

বেলাবেলি দু ভাই হাট থেকে ঘরে ফিরেছে, স্নান করেছে, ভাত খেয়েছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে, দু ভাই ক্লান্ত। ভাত খেয়ে দুজনেই একটু গড়িয়ে নিয়েছে। এমনটা বড় হয় না। দিনের বেলায় রতি-মতির বিছানায় গড়াবার সময় কই। আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। ফলে বাড়িটা তেমনি চুপচাপ রইল। তাতে সাবি ও মুক্তা প্রাণ খুলে গল্প করার সুবিধা পেল। দুই যুবতী গল্প করছে, মেয়েমানুষ হয়ে কৌতূহল চাপতে না পেরে দামিনী বুঝি দুবার তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু সাবির ধমক খেয়ে বোবা সরে গেছে। বোবা সরে যেতে সাবি খিলখিল হেসে উঠেছে। মুক্তার কষ্ট হচ্ছিল দামিনীর জন্য। কিন্তু দামিনী এখানে থাকলে তো চলবে না। সাবি যে এ-বাড়ির এই বোবা ঝি সম্পর্কে সাংঘাতিক এক ঘটনার কথা বলতে বসেছে। বোবা হলে হবে কি, দামিনীর এক কালে রূপ ছিল, যৌবন ছিল। এই যে সাবির দাদু, রতি-মতির বাবা, অন্ধ মনোহর কর্মকার, একবার রাণাঘাট যায় সেখানে আদালতে কি একটা মামলার সাক্ষী হয়ে। তখন শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষ মনোহর। হুঁ, সূয্যি ওঠার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে মনোহর। রাণাঘাটের হোটেলে উঠে দুপুরে চান করে, ভাত খায়। যুবতী দামিনী সেই হোটেলের ঝি। দামিনীকে দেখে মনোহরের ভাল লাগে। ঘরে বৌ আছে, দুটো ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে বড়। কিন্তু তা হলে হবে কি, মনোহর সেদিনই ঠিক করে ফেলল, মেয়েটাকে হোটেল থেকে ছাড়িয়ে ঘরে আনতে হবে। দামিনীর সঙ্গে কথা হয়। হোটেলের চাকরি ভাল লাগে ? না, ভাল লাগে না। খাটুনি সার। মাইনে কম। গেরস্থবাড়িতে কাজ পেলে দামিনী চলে যায়। ছেলে রাখা,

কি রান্নাবান্না করা, কি রুগীর সেবাযত্ন করা। মনোহর সেই রাত্রেই 'তৃপ্তি হোটেলে'র মালিক মুরারী হাজরার সঙ্গে কথা বলে। শুনে মুরারী হাজরা চোখ কপালে তোলে। পাগল নাকি, দামিনী চলে গেলে 'তৃপ্তি হোটেল' এক বেলা চলবে না। কিছু টাকা? মনোহরের প্রস্তাব শুনে মুরারী চিন্তা করে। তার পর হাসে। কত টাকা? একশো। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মত শ্রীপুরের পয়সা-ওয়ালা মনোহর কর্মকারের প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় হাজরা। থাক—হোটেলেই থাক দামিনী। বোবা মানুষ, বিয়ে-থা হয় নি, কেউ করবেও না বিয়ে। ছোটবেলা বাপ-মা মরেছে, ভাইবোন বলতে কেউ নেই। হাজরার সঙ্গে দামিনীর একটা আত্মীয়-তার সূত্র রয়ে গেছে। হাজরার বৌয়ের মাসতুতো বোনের ননদ ছিল দামিনীর মা, কাজেই মেয়েটার প্রতি একটা কর্তব্য আছে বৈকি মুরারীর। এমনি ঘরে বসিয়ে খেতে দেবার অবস্থা যদিও তার না। তাই নিজের হোটেলে রেখে—। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনোহর টাকাটা বাড়িয়ে দেয়। দুশো। মুরারী মাথা নাড়ে। তিনশো! মুরারী চোখ বড় করে মনোহরের মুখ দেখে। একটু আশ্চর্য হয়। ঐ বোবা কালা মেয়েটার জন্যে তিনশো টাকা? আরও একটু চাপ দিয়ে দেখবে নাকি? ঘাড় নাড়ে মুরারী। পাঁচশো টাকা। মনোহর মরীয়া হয়ে প্রস্তাব দিয়ে ফেলে। এবারের পাটের টাকাটা সে এভাবেই খরচ করবে। শুনে মুরারী খুশি হয়েছে। কল্কে ঢেলে সেজে নতুন তেজ নিয়ে হুঁকো টেনেছে। তা ছাড়া কি, —টাকা-পয়সা ক'দিনের। আত্মসুখই হল সুখ। মরে গেলে পাঁচভূতে লুটে খাবে পয়সা। বৌ-ছেলেমেয়ে ভূত ছাড়া আর কিছু না। আমার উপায়ের টাকা, মেহনতের পয়সা যদি আমি ভোগ না করলাম তো—

মনোহর পরদিন সকালে দামিনীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। কায়েতের মেয়ে। বোবা-কালা। তার ওপর তিন কুলে কেউ নেই। হুঁ, পেটের জন্য হোটেলে দাসিগিরী করতে এসেছিল। দেখে দুঃখ হল মনোহরের। তার তো আর ভাতের অভাব নেই। তা ছাড়া ঘর-গেরস্থালীর কাজে একটা মানুষের দরকার আছে। কাজেই রতি-মতির মা সরল মানুষ, মনোহর যেভাবে বোঝাল সেভাবে বুঝল প্রথমটায়। কিন্তু পাপ তো আর চাপা থাকে না। সংসারের আর পাঁচজন না বুঝুক, রতির মা একদিন ঠিক বুঝে ফেলল বোবা দাসীটার সঙ্গের বাড়ির কর্তার কী সম্পর্ক। কিন্তু বুঝতে পেরেই বা কী করতে পারল বেচারা? ভাত খেতে বসে ভাত খেত না, সারাদিন চুপ করে বসে কেবল ভাবত। মনোহর এসব গ্রাহ্য করত না। এদিকে ঘরের বৌয়ের

রকমসকম দেখে দামিনী ঠোঁট টিপে হাসত। কথা বলতে না পারলে কি হবে, বজ্জাতি বুদ্ধিতে তার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পারত না কি কেউ? দামিনীর কাছে অপমান, স্বামীর কাছে অপমান আর অনাদর পেয়ে পেয়ে রতির মা একদিন গলায় দড়ি দিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে রতির পিসি রতির মাকে রান্নাঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলে আছে দেখতে পেয়েছিল।

সাবির তখন জন্ম হয় নি। বড় হয়ে মা-র কাছে সে এই গল্প শুনেছে। রতি-মতি? তারাও কি আর তখন কিছু বুঝত? মা যখন মরে, হাঁটি হাঁটি পা-পা বয়স দু ভায়ের। বড় হয়ে এর ওর মুখে সব শুনেছে।

গল্প শুনতে শুনতে মুক্তার চোখ বড় হয়ে যায়, নিশ্বাস পড়ে না। সাবি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তা পাপ করলে ভগবানের কাছে শাস্তি আছে, দেখছ না, দাদু অন্ধ হয়ে গেছে!'

গল্পে গল্পে দিনের আলো নিভে গেল।

মুক্তা উঠে এঘর-ওঘরের বাতি জ্বালে। দামিনী রান্নাঘরে ঢোকে। সাবি পড়শীদের বাড়ি বেড়াতে যায়। কাল-পরশু আবার সে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে। তাই সকলের সঙ্গে দেখা করতে পাড়ায় বেরুলো। বড় ঘরে আলো দিতে গিয়ে মুক্তা আর একবার ভাল করে অন্ধ মনোহরকে দেখল আর ঠোঁট টিপে হাসল। বুড়ী পিসি ভাইয়ের হাতে পায়ে গরম তেল মালিশ করছে তখন। মুক্তা হাসল বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি অনুভব করছিল ও।

কেন এই অস্বস্তি, কিসের যন্ত্রণা মুক্তা কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে না। এ-বাড়ির অনেক গল্প সে সাবির মুখে শুনল, কিন্তু তাকে নিয়ে এ-বাড়িতে দু দিনের মধ্যে যা যা ঘটল, সেই পুকুরপাড়ে রতির রাগারাগি, দোকানঘরে তার কাপড়ে আগুন লাগা, মতির আগুন নেভানো, রতির গুম মেরে থাকে, এসব কিছুই সে সাবিকে বলল না। বড় ঘটনা না, ছোটখাটো ঘটনা—কিন্তু তা হলেও মুক্তার মনে হচ্ছিল যেন সাবিকে সব বলতে পারলে তার ভাল লাগত।

॥ বাইশ ॥

সন্ধ্যার পর দোকানে হাতুড়ির শব্দ শোনা যায়।

রতি-মতি কাজ করছে, মুক্তা মনে মনে বলল। কিন্তু আজ তার ডাক পড়ল না সেখানে। পড়ল না বলে মুক্তা যেন স্বস্তিবোধ করে। রান্নাঘরে দামিনীকে এটা ওটা বাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করে। পাড়া-বেড়ানো সেরে সাবি ফিরে এসে আবার গল্প জমায়। রান্নাঘরের জানালার বাইরে একটা বড় জারুল গাছ। নীচেটা অন্ধকার। পাতার আগায় আগায় জ্যোৎস্না চিকচিক করে। সাবির গল্প শুনতে শুনতে মুক্তা চিন্তা করে ঐ জারুল গাছের ডালে কি রতি-মতির মা গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলেছিল ? চিন্তা করে মুক্তার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় কত দুঃখ পেয়ে একটা মানুষ গলায় দড়ি দেয়! দুঃখের কথা চিন্তা করতে গিয়ে মুক্তার আর একটা মুখ মনে পড়ে। প্রভার, কুমারেশের স্ত্রীর মুখ—কিন্তু সেখানে গলায় দড়ি দিতে হয় নি, কুমারেশ বৌকে জলে ডুবিয়ে মারল। কেন মারল, কার জন্য মারল ? আমার লাইগ্যা ? আমি আর এউকগা দামিনী। এ্যাঁ, আমি কি দামিনী ? উনুনের গোড়ায় আলুথালু চুল নাকমোটা ড্যাবসা শরীর মোটা দামিনীকে দেখে মুক্তা কেমন চমকে ওঠে। যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। আর এক সেকেণ্ড এখানে বসে ঐ বোবা ঝিটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মুক্তা মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবে। যেন সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ও দরজার বাইরে ঘরের পৈঠায় এসে দাঁড়ায়। বাঁশের খুঁটি ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সাবি এসে পিছনে দাঁড়ায়। মুক্তার কাঁধে হাত রাখে। 'কি ভাই, দামিনীকে দেখে বুঝি তোমার রাগ হচ্ছে, সেই গল্প শুনে ?' ফিসফিসে গলা সাবির। মুক্তা চট করে উত্তর দিতে পারে না। বরং অবাক হয় ভেবে, ও মেয়েটা তার মনের কথা কেমন করে টের পেল ? কিন্তু সবটা তো ও টের পেলে না, মুক্তার মনের সবটুকু চেহারা যে তার জানা নেই। তাই কি ? 'চাঁদের আলো আর আঁধারে আমার মন ভইর‍্যা আছে —সুখী ম্যাইয়া সাবি কি কইরা টের পাইব।' চিন্তা করে মুক্তা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল আর অল্প শব্দ করে হাসল, 'না ভাই, আমি আর একখান কথা ভাবছি।'

'কি কথা শুনি ?'

'আছে, একখান বড় ভাবনা আছে আমার বুকের মাইঝে।' মুক্তা আর হাসে না। যেন কিসের গন্ধ পায় রতি-মতির ভাগ্নী, চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুক্তার হাত চেপে ধরে পীড়াপীড়ি করে। 'বলতে হবে, না বললে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।'

'এ জন্মে কি আর তোমার সঙ্গে দেখা অইব ভাই, যদি আমি কইলকাতা ভাইয়ের কাছে চইলা যাই?' মুক্তা আবার একটু হাসে।

'হবে, কেন হবে না?' সাবি মুক্তার কাঁধে ঝাঁকুনি দেয়, 'মনের টান থাকলে দুজনের আবার দেখা হবে।'

কাজেই মুক্তাকে হার মানতে হয়। এবং এ অবস্থায় আর পাঁচটি মেয়ে যা করত, মুক্তাও তাই করল। সাবির কাছে সে তার মনের একটা দিক মেলে ধরল। মনের মানুষ বলাইয়ের কথা বলল। না, বলাই তার ভাই না। লোকে খারাপ চোখে দেখবে তাই মিছা একটা পরিচয় দেওয়া। শুনে সাবির খুব ভাল লাগল। মুক্তাকে জড়িয়ে ধরল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কত কি প্রশ্ন করল। কবে দেখা, কোথায় দেখা হয়েছিল দুজনের। বলাই মুক্তাকে কি কি উপহার দিয়েছে। বলাই লেখাপড়া কিছু জানে কি না, তার আর কে কে আছে, ইত্যাদি।

সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ করে মুক্তা সাবির হাত চেপে ধরল। এবার মুক্তা পীড়াপীড়ি করে। সাবি ঘাড় নাড়ে। না, কাউকে বলবে না সে এ-কথা; অন্ধ মনোহর, বুড়ী দিদি, দামিনী, তার মামা রতি-মতি—কারো কানে সে একথা তুলবে না। কেননা, তাহলে মুক্তা সম্পর্কে এ-বাড়ির মানুষগুলির মনে নানারকম ধারণা সৃষ্টি হবে। তার এখানে কদিন থেকে চাকরি করাই হয়তো হবে না। সাবির আশ্বাস পেয়ে মুক্তা নিশ্চিন্ত হয়। নিশ্চিন্ত হয় আর অন্যদিকে সে ভেবে অবাক হয় ব্যারাকপুরের এতবড় ঘটনাটা সে বেমালুম চেপে যেতে পারল—যেমন এখানকার ঘটনাগুলো সে সাবির কাছে চেপে গেল। কিন্তু চেপে গিয়ে মুক্তা শান্তি পায় কি! ছটফট করতে থাকে। কেবল তার মনের আলো, চাঁদের আলোর ছিমছাম রেখাটাই সে আর একটি মেয়েকে দেখাল, মনের চাপ চাপ অন্ধকারের কথা কিছুই বলল না। অথচ অন্ধকারই তো তার মনের বেশির ভাগটা জুড়ে আছে। চাঁদনীর রেখাটা ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে না? বলাইয়ের কথা সে কতক্ষণ ভাবে? এই এখনও বলাইয়ের কথা বলতে গিয়ে বলাইকে যত না ভাবল, তার চেয়ে অনেক বেশি সে রতি-মতিকে ভাবল, কান খাড়া করে

দোকানঘরের হাতুড়ির আওয়াজটা শুনল। রতি হাতুড়ি পিটছে, মতি সাঁড়াশী দিয়ে লাল লোহা চেপে ধরেছে। হাপরের আগুনে মতির ফর্সা মুখ পাকা সোনার রং ধরেছে, রতির ময়লা মুখ তামার রং ধরেছে। মুক্তাকে কি দু ভাই একবারও ডাকবে না? মুক্তা যদি হাপরে হাত না লাগায় তবে আগুনের তেজ উঠবে কি?

'তোমার দুই মামার বিয়াসাদি করনের ইচ্ছা নাই?'

'তাই তো দেখছি!' সাবি একটুও অবাক হয় না প্রশ্ন শুনে। 'ছোট বেলায় দামিনীকে এ-বাড়ি ঢুকতে দেখেছে, মাকে গলায় দড়ি দিতে দেখেছে, সেই থেকে মেয়েজাতটার ওপর দু ভায়ের বিদ্বেষ, রাগ।' বলে হঠাৎ কি একটু ভাবে সাবি, তারপর ফিক্ করে হাসে। 'তা বলে আমার ওপর মামাদের একটুও রাগ নেই, বড্ড ভালবাসে দুজনেই।'

চুপ থেকে মুক্তা উঠোনের কোণায় লাউমাচার পাশে বড় ধানের গোলাটা দেখে। গোল একটা ছায়া পড়েছে চাঁদের আলো ছোপানো আঙিনায়।

॥ তেইশ ॥

সত্যি আজ আগুনের তেজ কম। কাঠকয়লা বার বার নিভে যায়। একদিক লাল হয়ে ওঠে তো অন্যদিকের কয়লা কালো হয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে মতি উনুনটা খোঁচাতে থাকে, লোহাটা বার বার কয়লার ভিতর ঠেসে ধরে। হাতুড়ি নামিয়ে রেখে রতি কপালের ঘাম মোছে, বিড়ি ধরায়। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে রতি কি যেন চিন্তা করে, দোকানের দরজার দিকে তার ঘাড়টা ফেরানো, দরজার দিকে চোখ। মতি আড়চোখে মাঝে মাঝে দাদাকে দেখে। সারাদিন দুজনের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ হয় নি। কেবল হাটে গিয়ে সওদা কিনতে দরকার মতন দু একটা কথা যদি হয়ে থাকে। হাটে যাবার সময় দু ভাই আগে পিছে থেকে থেকে নীরবে হেঁটে গেছে। একবারও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা হাঁটে নি। হাট থেকে বাড়ি ফেরার সময়ও তাই। মতি আজ হাটে নতুন লুঙ্গি কিনেছে। লাল সবুজ ডোরাকাটা লুঙ্গি। রতি কিনেছে গামছা। মতি আর একটা জিনিস কিনেছে। সরু ও মোটা দাঁতের একটা চিরুনি। অর্থাৎ যা দিয়ে দরকার হলে মেয়েছেলেও চুল আঁচড়াতে পারে। মতির মাথায় বাবরি এবং চুলও মোটা। কাজেই এরকম

একটা চিরুনি ছোট ভাইয়ের দরকার আছে চিন্তা করে রতি এ সম্পর্কে কোন কথা বলেনি। কিন্তু রতি যখন পরাশরের মনোহারী দোকান থেকে একটা বড় সুগন্ধি সাবান কেনে, মতি তখন অবাক হয়। কেননা দাদাকে সে এ জীবনে কোনদিন সাবান মাখতে দেখে নি। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় সর্ষের তেল গায়ে মেখে রতি স্নান করে। মতি বরং হাতেমুখে দরকার মতন একটু সাবান-টাবান ঘষে, তাও এক-আধ টুকরো কাপড়কাচা সাবান। দাদাকে আট গণ্ডা পয়সা খরচ করে এমন চমৎকার গায়ে-মাখা সাবান কিনতে দেখে মতি যেমন অবাক হয়েছিল, তেমনি তার হাসিও পেয়েছিল। হাসিটা অবশ্য চেপে রেখেছিল সে। তার পর দু ভাই তাদের সংসারের জন্য পাঁচ সের নুন, আড়াই সের গুড়, ঘরের বড় ছেঁড়া জালটা মেরামত করতে হবে বলে দুই তাগা পাকানো সুতলী ও কিছু গাব কেনে। তখন অবশ্য জিনিসপত্রের দাম এবং কি পরিমাণ কিনতে হবে এই নিয়ে দু ভাই একটা দুটো কথা বলেছে। কিন্তু তার পর আর দুজনের কথা হয় নি। তখন বাড়ি ফেরার সময় মতি যেমন চিন্তা করছিল, এখন দোকানে বসেও সে তাই ভাবছে। দাদা এমন গুম মেরে আছে কেন? কাল রাত থেকে এটা লক্ষ্য করছে সে। এদিকে রতিও চিন্তা করছে ছোটভাই মতি তো চুপ করে থাকার ছেলে নয়। কী হয়েছে তার?

আশ্চর্য, দুজনেরই এক চিন্তা, কিন্তু কেউ কাউকে এ নিয়ে প্রশ্ন করছে না। অবেলায় ঘুমিয়ে উঠে দুজনের চোখমুখ ফুলে আছে, চোখের রং জবাফুলের মত লাল। যেন নতুন চিরুনি চালিয়ে মতি তার ঝাঁকড়া চুল পালিশ পরিপাটি করে তবে দোকানে এসে বসেছে। পরনে নতুন লুঙ্গি। তবে গামছার মত খাটো করে কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে পরা। রতির পরনে নতুন গামছা। কিন্তু রতি যে আজ তার সেই নতুন সাবানটা গায়ে মেখে বিকেলে চান করে নি মতি এটা বেশ বুঝতে পারছিল। কেননা, তাহলে তার দাদার গায়ে সেই ভাল গন্ধটা পাওয়া যেত, এত চড়া গন্ধ সেই সাবানের, গায়ে মেখে চান করলে মতি নিশ্চয় টের পেত! সাবানের মোড়কটাও ছেঁড়া হয় নি। এনে তেমনি রেখে দেওয়া হয়েছে। কোথায় সেটা রাখা হয়েছে মতি খোঁজ করেনি যদিও। যা খুশি করুক, যেখানে খুশি রাখুক সাবান, মতির জানতে একটুও আগ্রহ নেই। কিন্তু দাদা কথা বলছে না কেন?

আড়চোখে মতি যখন রতিকে দেখতে গেছে ঠিক তখন রতিও আড়চোখে মতির মুখটা দেখবে বলে দরজার দিক থেকে ঘাড়টা এদিকে ঘুরিয়েছে। ফলে

দু ভাইয়ের চোখাচোখি হয়। দুজনেই যেন কেমন চমকে ওঠে।

'কয়লা জ্বলছে না?' রতি ঠোঁট থেকে বিড়িটা নামায়।

'জ্বলবে, দেরি হচ্ছে।' মতি হাত বাড়িয়ে হাপরে বাতাস করে। 'কয়লাটা শুকনো নয় মনে হচ্ছে।'

'তা দামিনীকে একবার ডাক না, এসে বাতাস করুক।'

মতি দাদার চোখ দেখল। না, ভুল দেখছে না সে। রতির শক্ত পাথুরে চোয়াল, স্থির নিষ্পলক চাউনি। ভুল করে দামিনীর নাম উচ্চারণ করার চেহারা তো নয় এটা! বড় একটা ঢোক গিলল মতি। তার পর:

'ওদিকের কাজকর্ম সারা হয়েছে কিনা বোবার কে জানে? ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ হচ্ছে যেন এখনো রান্নার।'

'রান্না করার অন্য লোক আছে বাড়িতে।' রতি ধমকের গলায় বলল। 'তুই একবার ডাক বোবাকে।'

মতি উঠে আস্তে আস্তে দরজার বাইরে যায়। যেন অন্ধকার পৈঠা ঘুরে সে পিছনের উঠোনে নামবে। টের পেয়ে ঝাঁপের বাইরে রতি গলা বাড়িয়ে দেয়। 'আরে, উঠোনে নামবার দরকার কি, এখান থেকে ডাক না।' রতির গলার ঝাঁজটা এবার আরো পরিষ্কার হয়ে মতির কানে লাগে। মতি রাগ করে না; একটা কিছু সে অনুমান করতে পারে—পেরে বরং মনে মনে হাসে, তার পর দোকানের দরজার দিকে ঘাড় ফেরায়।

'এখান থেকে ডাকলে কি কালা আমার গলা শুনবে?'

রাগ করে রতি পৈঠার ওপর একদলা থুথু ফেলল। 'বাড়িতে অন্য লোক আছে না? নাকি সব কালা হয়ে আছে? ডেকে বলে দে দামিনীকে পাঠিয়ে দিক।'

অন্য কাউকে না ডেকে মতি বুদ্ধি করে বরং জোর গলায় দামিনীকে ডাকল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বোবা ছুটে এসে দোকানে ঢোকে। মতি লক্ষ্য করে, দাদার চেহারাটাও যেন সেই সঙ্গে আরো কুৎসিত কদাকার হয়ে ওঠে। ঘৃণা রাগ বিরক্তি অস্থিরতা নিয়ে রতি হাঁসফাঁস করতে থাকে। মতি হাতের ইশারায় দামিনীকে হাপর দেখিয়ে উনুনে হাওয়া করতে বলে। এ কাজ দামিনীর অজানা নয়, কিন্তু তা হলেও হাপরে বসে সে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। কোন-দিনই পারে নি। তাই আগে আগে ওকে ডাকা হত দোকানে, পরে বিরক্ত হয়ে দু ভাই বোবাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই হাপর চালিয়ে লোহা গরম করেছে, গরম

লোহা পিটে পিটে কাস্তে কাটারি লাঙলের ফলা তৈরি করেছে। হাপর চালাবার লোকের অভাবে কাজ বন্ধ থাকে নি।

আজও কি আর বোবাকে দিয়ে সুবিধে হবে? মতি মনে মনে বলল এবং লোহার টুকরোটা কয়লার মধ্যে গুঁজে দিয়ে উনুনের কখন গনগনে চেহারা ধরবে আর লোহাটা গরম হয়ে লাল টুকটুকে হবে তার অপেক্ষা করতে লাগল। হাতুড়ি হাতে রতি দোকানঘরে পায়চারি করে আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দামিনীর হাপর চালানো দেখে। কেরাসিনের ডিবিটা মতির পায়ের কাছে দপ দপ করে জ্বলছে। রতি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই বলে তার ছায়াটাও ঘরের বেড়ার গায়ে নড়াচড়া করে। কিন্তু কতক্ষণ? দু মিনিটও পার হয় না। অস্থির গলায় রতি হুঙ্কার ছাড়ে, 'কৈ, আগুন তো দেখছি নে, উনুন নিভিয়ে দেবে নাকি হারামজাদী!'

রতির হাতুড়ি নাড়া দেখে দামিনী ভয় পায়, যেন হাতুড়িটা তার মাথার ওপর পড়বে চিন্তা করে হাপর থেকে হাত তুলে ছিটকে গিয়ে দূরে সরে বসে। বোবার ভয় পাওয়া দেখে মতি অল্প শব্দ করে হাসে, কিন্তু তাতে আবহাওয়া তরল হয় না।

'ওঠ্, উঠে যা এখান থেকে।' হাতের হাতুড়ি শূন্যে নেড়ে রতি দামিনীকে ধমকায়। মতি আঙুলের ইশারায় দামিনীকে সরে যেতে বলে। প্রায় কেঁদে ফেলবে, মুখচোখের এমন ভাব করে 'এ্যাঁ, উঁ' কি যেন বকতে বকতে বোবা দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

দাদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মতি। বস্তুত, এর পর রতি কি বলবে মতি তার অপেক্ষায় থাকে। মতি নিজে থেকে কিছু বলছে না, প্রস্তাব দিচ্ছে না, কেননা রতির মেজাজ তার চেয়ে আর কে বেশি বোঝে! রতি আর একটু সময় পায়চারি করে, তার পর মতির দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

'তবে ঐ মেয়েটাকে ডাক না?'

'আবার না কাপড়ে-টাপড়ে আগুন লাগিয়ে বসে!' মতি ঘরের মেঝের ওপর চোখ রাখে।

'তা যদি কাজ করতে বসে কেবল কাপড়ে আগুন লাগায় তো আমরা কী করতে পারি, তাই বলে কাজ তো করতে হবে, না এমনি বসে বসে ভাত গিলবে?'

'না, ভাত এত সস্তা না।' মতি চোখ তুলল।

'তো ডাক না ওটাকে।'

'এখান থেকে ডাকব?' মতি দরজার ঝাঁপের ওপর চোখ রাখে। রতি সঙ্গে সঙ্গে ভেংচি কাটে, 'এখান থেকে ডাকবি না তো কি গিয়ে পায়ে ধরে সাধাসাধি করবি নাকি? না কি ওটার মত এটাও কালা হয়ে বসে আছে?'

আর কথা না বলে মতি উঠে ঝাঁপের বাইরে গিয়ে গলা বড় করে মুক্তাকে ডাকল। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের উঠোন থেকে একটা কচি গলার সাড়া পাওয়া গেল। রতি ঘামছে। হাত দিয়ে সে কপালের ঘাম মুছল। মতি ভিতরে এসে উনুনের ধারে বসল। রতি ঘাড় ঘুরিয়ে ছোট ভাইকে দেখে। 'কাঠকয়লা আছে?'

'আছে।' মতি কোণার বস্তাটার দিকে চোখ ফেরায়।

'আজ সারা রাত কাজ হবে।' রতি আর মতির দিকে তাকিয়ে নেই। ঘরের কড়িকাঠ দেখে। যেন নিজের মনে বলে, 'যোগী গায়েনের লাঙ্গলটা কদিন থেকে পড়ে আছে, হাত দেওয়া হচ্ছে না, ওটা সেরে ফেলতে হবে—সাধন নন্দী দু-দুটো লাঙ্গলের বায়না দিয়ে গেছে সেই কবে, দুটোর একটা তো ওকে করে দিতে হয়; কাল সকালে আবার ও ঠিক আসছে—'

রতির কথা বন্ধ হয়, মতি দরজার দিকে চোখ ফেরায়, ঝাঁপ নড়ে ওঠে। ঝাঁপ ঠেলে মুক্তা ভিতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাওয়ার ঝলক ভিতরে ঢুকে বাতির শিখাটাকে নাচিয়ে দেয়। ঘরের সবগুলো ছায়া একসঙ্গে নেচে ওঠে।

'কি করমু দাদা?' যেন ভয়ে ভয়ে মুক্তা রতির দিকে তাকায়। রতি মোটেই ওর দিকে তাকায় না। হাতের হাতুড়ি শক্ত করে ধরে রেখে ঘরের মেঝে দেখে, বাতির চঞ্চল শিখাটা দেখে। তার চোয়ালদুটো হঠাৎ কেমন কঠিন দেখায়।

'হাপরে হাত লাগাও।' মুক্তার দিকে তাকায় না মতি, উনুনে কিছু কাঠকয়লা ছেড়ে দিয়ে যোগী গায়েনের ভাঙা লাঙলের ফলাটাকে উনুনের ভিতর গুঁজে দেয়। মতির কথা মতন মুক্তা হাপর চালিয়ে উনুনে হাওয়া করতে আরম্ভ করে। রতি তখনও দাঁড়িয়ে। বাতির শিখা থেকে চোখ সরিয়ে সে ঘরের বেড়া দেখে; বেড়ার গায়ে একটা খোঁপা সমেত বড় মাথার ছায়া নড়ছে, কাঁপছে। বস্তুতঃ একটা মানুষের মাথা ছায়া হয়ে কত বড় দেখায় যেন আড়-চোখে মুক্তার ছোট্ট মাথাটা দুবার দেখে রতি চিন্তা করছিল। মতি হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতে রতি অন্যদিকে ঘাড় ফেরায়। মতি একটা বড় নিশ্বাস

ফেলে। নিশ্বাসের শব্দ রতি শুনতে পায় না যদিও; মুক্তা জোরে জোরে হাওয়া করছে, উনুনের কয়লার ফুটফাট শব্দ হচ্ছে; কয়লার বুক ঠেলে সাপের জিভের মত লিকলিকে নীল সবুজ ছোট বড় আগুনের শিখা ফুঁড়ে বেড়িয়েছে। যেন উনুন টের পেয়েছে হাপরে কার হাত লেগেছে, তাই খুশি হয়ে হুস হাস শব্দ করছে আর হাসছে আর ছোট বড় জিভ বার করে এটা ওটা খেতে তৈরি হচ্ছে। গায়েনের জং ধরা লাঙলের লোহাটা দেখতে দেখতে সোনার পাত হয়ে ওঠে। সাঁড়াসী দিয়ে ধরে মতি ওটা উনুন থেকে তুলে এনে পাটার ওপর রাখে, তারপর আর একটা বড় সাঁড়াসী দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে। মতির হাতের কাঁধের মাংস ফুলে উঠল। রতির হাতুড়ি শূন্যে ঝাঁকুনি খেয়ে দরাম করে পাটার ওপর লাফিয়ে পড়ল। হাতুড়ির ঘায়ে ঘরের মাটি থর থর করে কাঁপে। মুক্তা চমকে ওঠে। যেন আজ হাতুড়ির জোর বেশি, আওয়াজটা অনেক বড় হয়ে তার কানে বাজে। আড়চোখে মুক্তা রতিকে দেখে। মতি আবার লাল গনগনে লোহাটা সাঁড়াসী দিয়ে পাটার ওপর শক্ত করে চেপে ধরেছে। রতির পায়ের মাংসের গোছা লোহার ডেলার মত কঠিন হয়ে গেছে। তার হাতের হাতুড়ি শূন্যে উঠছে, চোখের পলকে আবার নীচে নামবে, দড়াম করে আওয়াজ হবে, থরথর করে মাটি কাঁপবে; আর আগুনের ফুলকি হয়ে কিছু গরম লোহার গুঁড়ো মতির চোখের সামনে, নাকের সামনে নেচে উঠবে। 'তা উঠুক, মাথাটা অত সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া বসবা না।' যেন মনে মনে মুক্তা মতিকে সাবধান করে দিতে চাইছিল আর নিশ্বাস বন্ধ করে রতির হাতের হাতুড়ি দেখছিল। শূন্যে ঝাঁকুনি খেয়ে হাতুড়ি যখন নীচে নামে মুক্তা বুঝি ভয়ে চোখদুটো বুজে ফেলে।

কিন্তু তার এই ভয়ের কোন মানে হয় না।

কামারশালায় কামারেরা রাতদিন তো গড়া-পেটার কাজ করে। একজন গরম লোহা ধরে রাখে আর একজন হাতুড়ির ঘা মারে। তাই বলে কি হাতুড়ি কারো মাথায় লাগে, না হাতে লাগে? দেশে থাকতে মুক্তা তাদের গাঁয়ের বিশ্বম্ভর কামার আর বিশ্বম্ভরের ছেলে রাজুকে দা কাস্তে লাঙল কোদাল কত কি তৈরি করতে দেখত। একদিনও তার মনে হয় নি রাজুর হাতুড়ি গরম লোহার ওপর না পড়ে বুড়ো বিশ্বম্ভরের মাথায় গিয়ে পড়বে। তা মুক্তা এখন এসব ভাবছে কেন? এবং তার ভাবনাটা যে কিছু না চোখ খুলে পরিষ্কার দেখতে পেল। হাতুড়ির ঘা জায়গামতন পড়েছে, আগের মত আর গরম লোহার গুঁড়োর ফুলঝুরি উড়ল না, লোহার কাঁচাসোনা রংটাও কেমন কালচে লাল হয়ে গেছে;

তার মানে লোহা ঠাণ্ডা হয়ে এল। রতি হাতুড়ি সরিয়ে নেয়। যোগী গায়েনের পোড়া লাঙলের ফলাটা সাঁড়াসী দিয়ে তুলে মতি আবার উনুনের মধ্যে ঠেসে ধরে। হাপর চালিয়ে মুক্তা জোরে জোরে উনুনে হাওয়া করে।

'হুঁ, কয়লা দে, বেশি করে কয়লা দে।' রতি কারো দিকে তাকায় না। হাতুড়ি মাটিতে রেখে বিড়ি ধরায়। 'আজ সারারাত কাজ হবে।'

দাদার কথা মতন মতি উনুনে কাঠকয়লা ছড়ায়। কয়লার ফুটফাট শব্দ হয়, গলগলিয়ে ধোঁয়া ওঠে; প্রচুর ধোঁয়া নাক দিয়ে মুখ দিয়ে গিলতে গিলতে মুক্তা হাপর ঠেলে। যেন তার হাতের জোর বেড়ে গেছে আজ। ধোঁয়ায় মুখটা আড়াল করে দেয় বলে ও চোখ তুলে জোয়ান দু ভাইয়ের দিকে একবার তাকাতে পারল। রতির মুখ দেখা যায় না, কেননা মুখ ঘুরিয়ে বসে সে বিড়ি টানছে। মতির মুখ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়েছে। মুক্তা তার চওড়া কব্জি ও উঁচু কাঁধদুটো পরিষ্কার দেখতে পেল। 'না, আইজ আর কাপড়ে আগুন লাগতে দিমু না। ছি ছি, কাইল কী কাণ্ডটা অইছিল! আইজ যদি আগুন লাগে মতি নিবাতে চাইবে না, সাহস পাইবে না রতির লাইগ্যা; রতি রাগ করে। কাল রতির চোখ দেইখ্যা আমি বুইঝা গেছি।' মুক্তা আরো আঁটসাঁট হয়ে বসে, গায়ের আঁচলটা একটুও ঝুলতে দেয় না। লাল লোহা সাঁড়াসী দিয়ে তুলে মতি পাটার ওপর রাখে। রতি হাতুড়ি হাতে উঠে দাঁড়ায়। ধোঁয়ার ছিটেফোঁটা নেই। কেরাসিনের কুপিটা দপ্‌দপ্ করে জলছে, রতির দু চোখ জ্বলছে। একটু আগের ভয়টা আবার মুক্তার বুকের ভিতর যেন ডেলা পাকাতে থাকে।

'মাথাটা সরাও, মাথাখানা পিছনে ঝুঁকাইয়া রাখো।'

না, হাতুড়ির শব্দ হল না। হাতের হাতুড়ি স্থির হয়ে আছে রতির। বরং লোহার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে হাতুড়ি যত না শব্দ করত তার চেয়ে বেশি শব্দ হল রতির হাসির।

মতি চুপ করে থাকে, মাথা তোলে না।

মুক্তা? তারও বুঝতে বাকি থাকে না কথাটা ঠোঁট থেকে আলগা করে সে কী বিপদে পড়েছে। ভয়ে লজ্জায় কেঁচোর মত ও নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। দুই হাঁটুর ফাঁকে ঘাড় মাথা গুঁজে দিয়ে ও চুপ করে গেছে। ঘরের বেড়া চাল কাঁপিয়ে রতি কর্মকার হাসল, পায়চারি করল, থুথু ফেলল।

'হুঁ, মতের জন্যে খুব ভাবনা—হাতুড়ি তার মাথায় পড়বে, হাতে পড়বে।

কেমন রে মতে, ভয় পাচ্ছিস ?'

মতি চোখ তুলে দাদার দিকে তাকায়। তার মুখটা বড় বেশি লাল-লাল দেখাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না, কথা বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলছে।

'দরদ !' রতি ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার ঝাঁপের ওপর থুথু ছিটায়। নিজের মনে কথা বলে। তার পর ছোটভাইয়ের দিকে হাতুড়িটা বাড়িয়ে দেয়। 'পাটা ছেড়ে দে। আমি পাটায় বসব, তুই হাতুড়ি নে।' রতি আবার টেনে টেনে হাসে।

'দাদা—'

'আর 'দাদা'র দরকার নেই, দাদা যা বুঝবার বুঝে ফেলেছে।' রতি একটা গরম নিশ্বাস ছাড়ল, দু চোখের কোণা দিয়ে মুক্তাকে দেখল।

ধমক খেয়ে মতি চুপ ; চোখের কোণা দিয়ে সে মেয়েটাকে দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সাহস পায় না। না, কথাটা তো ভাল হয় নি—আজ কি তারা দাদা-ভাই নতুন কাজ করছে এখানে যে, মেয়েটা হুট্ করে একটা ভয়-দেখানো দরদ-দেখানো কথা বলে বসল ? হুঁ, রতি ঠিক একটা কিছু ঠাওরে নিয়েছে। মতি চিন্তা করল। এবং কিছু ঠাওরে নেওয়া না শুধু, ভিতরে ভিতরে রতি ভীষণ রেগে গেছে মতির বুঝতে কষ্ট হয় না। সে ছোটভাই। আজ কুড়ি-বাইশ বছর দাদাকে দেখছে। রতির রাগ চেনে না সে ? রতির হাসিটা মতির ভাল লাগে না। 'এই মেয়ে !' মতি গরম হয়ে ডাকল।

চমকে মুক্তা হাঁটুর ভিতর থেকে মাথা তুলল। টলটল করছে দুটো কালো চোখ। যেন ছায়াঘেরা দুটো শান্ত পুকুর। ভয় নেই, চঞ্চলতা নেই ; রাগ দুঃখ অভিমান আশঙ্কা কিছুই নেই ওই চোখে। সরল ঠাণ্ডা অসহায় অবোধ চাউনি। বুঝি তা না হয়ে উপায়ও নেই ওর। এই মাঝরাতে দু-দুটো জোয়ান মরদের সামনে, তাদের ঘরে, তাদের রক্তচক্ষুর সামনে মাটির পুতুলের মত হয়ে যেতে পারলে মুক্তা তাই হয়ে যেত। যেন তার ইচ্ছা নেই, অনিচ্ছা নেই, ঘুম নেই, ক্ষুধা নেই, আলস্য নেই, ক্লান্তি নেই ; পছন্দ-অপছন্দ কিছুই নেই। তাই সেই চোখজোড়ার সামনে মতি থমকে যায়, যতটা গরম হবে বলে মনে মনে তৈরী হচ্ছিল ততটা হতে পারল না। হাঁ করে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মেয়েটাকে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি এখান থেকে সরে যাও, আমি—আমারাই পারব উনুনে হাওয়া করতে।'

'না না না—মেয়েমানুষ ছাড়া আগুন ভাল জ্বলে না, তুই কি জানিস না

গরু ?' গর্জন করতে গিয়ে রতি হেসে ওঠে, তাই চেহারাটা আরো কুৎসিত দেখায়। মতি অন্যদিকে তাকায়, কি ভাবে, তার পর হাতের সাঁড়াশি মাটিতে রেখে দাদার জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। রতি পাটায় বসে। মতি হাতুড়ি তুলে নেয়। মুক্তা হাপরে হাত লাগায়।

যোগী গায়েনের ভাঙা লাঙল সেরে দিয়ে দু'ভাই সাধন নন্দীর নতুন লাঙলের জন্য উনুনে নতুন লোহা গরম করে, হাতুড়ি মারে। মতির হাতের জোর রতির চেয়েও কি বেশি ? তাই হবে। কেবল ঘরের মাটি না, ঘরের বাইরে চাঁদের আলো ছোপানো নিশুতি রাত চমকে চমকে উঠছিল হাতুড়ির আওয়াজে। দামিনীর রান্না সারা হয়েছে অনেকক্ষণ। রতি-মতি না খেলে সে খেতে পারে না, তাই এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। বুড়ো মনোহরের খাওয়া হয়ে গেছে, এখন শুয়ে পড়েছে। বুড়ী পিসি বিধবা মানুষ, রাত্রে ভাত খাওয়া নেই, দুটি খৈ-মুড়ি চিবিয়ে জল খেয়ে বড়ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে সলতে পাকাচ্ছে, মেঝের এক পাশে সাবি শুয়ে ; দিদিমার কাছে গল্প করছে ও, হুঁ, সবটাই তার শ্বশুর-বাড়ির গল্প। বুড়ীর কথামতন সাবি গরম গরম দুটি খেয়ে নিয়েছে। কে জানে, হয়তো কাল সকালে মেয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে। হয়তো জামাই নিজে এসে হাজির হবে সাবিকে নিয়ে যেতে। বুড়ী খনখনে গলায় হাসে। 'নাতজামাই আমার রসের নাগর বোন, রসের নাগর—দু রাত তুই কাছে না থাকলে—হি-হি…' শুনে সাবির কান গাল লাল হয় না, দিদিমার এরকম ঠাট্টা সয়ে গেছে—বরং হাসে ও খিলখিল করে, তার পর আবার গল্প আরম্ভ করে, এবার তাদের ধান পাট কেমন হল, পুকুরের মাছ কত বড় হল, কোন গাইটা নতুন দুধ দিতে আরম্ভ করেছে, কোন ছাগীটা আবার বিয়োবে, ইত্যাদি। বুঝি শ্বশুর-বাড়ির গল্প করতে করতে সাবির চোখেও এক সময় ঢুলুনি আসে, হঠাৎ ও চুপ করে যায়। বুড়ীও ঢুলছে। আকাশে চাঁদ ঘুরে যায়। গাঁয়ের মানুষ এক ঘুম ঘুমিয়ে যদি এখন জেগে ওঠে তো নিশ্চয় তারা কামারশালার হাতুড়ির শব্দ শুনছে। হয়তো তারা ভাবছে অনেক লাঙল কাস্তের বায়না পেয়েছে মনোহরের ছেলেরা। রাত জেগে কাজ করছে। হুঁ, এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে দলে দলে বাস্তুহারারা এসে ঘর বাঁধছে, জমি পেয়ে চাষবাস করছে। তাদের লাঙল চাই, কাস্তে-কোদাল চাই। মনোহরের দুই ছেলের এখন পোয়া বারো। এবার পাকা ঘর উঠবে মনোহরের ভিটায়। না, আর কামারশালা বন্ধ রেখে চাষবাস

করতে হবে না রতি-মতির, বাস্তুহারাদের চাষের যন্ত্রপাতি গড়ে-পিটেই দু ভাই লাল হয়ে যাবে।

মানুষ ভালর দিকটাই আগে দেখে; গড়ে তোলা, গড়ে ওঠা, হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে; যেমন গাঁয়ের মানুষ মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে রতি-মতির হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনে স্বপ্ন দেখছিল, ভাবছিল। কিন্তু তারা কি জানল মনোহরের দুই জোয়ান ছেলে একটি বাস্তুহারা মেয়েকে সামনে বসিয়ে কেবল ভেঙে দেওয়া ভেঙে পড়ার সর্বনাশা নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। রতি-মতি নিজেও বুঝতে পারে না তারা কী করতে চলেছে, কেবল এটুকু বুঝল সর্বনাশা নিয়তির মত একটা পনেরো-ষোল বছরের ফরসা মেয়ে দু ভায়ের মাঝখানে এসে জুটল।

মতি হাতুড়ি পিটছে। রতি সাঁড়াশি দিয়ে লাল লোহার পাতটা শক্ত করে ধরে আছে। না, একবারও মুক্তা বলছে না রতিকে মাথাটা পিছনের দিকে 'ঝুঁকাইয়া' সাবধান হয়ে বসতে। বললে ভাল হত, মতি চিন্তা করল। না হলে দাদার মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না। দাদাকে সে জানে। এমন জেদী একরোখা মানুষ হয় না। মেয়াটার ওপর যত না রাগ তার চেয়ে অনেক বেশি রেগে গেছে রতি মতির ওপর, মতির বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই সে অস্বস্তি বোধ করছে। যদি কেউ লক্ষ্য করত, দেখত অশান্তির সরু মোটা কটা রেখা পড়েছে মতির কপালে। হাতুড়ি মেরে মেরে ঘেমে গেছে সে। কপালের রেখার খাঁজে খাঁজে ঘাম জমে চিকচিক করছে। 'দাদা, আমার কোন দোষ নাই— বাস্তুহারা, তার ওপর ঝি হয়ে বাড়িতে ঢুকল—এমন একটা মেয়ের ওপর আমার লোভ হবে, তুমি মনে করো না।' মতির ইচ্ছা হচ্ছিল দাদাকে বলে। যেন বলতে গিয়ে তার ঠোঁটদুটোও নড়ে উঠেছিল একবার। কিন্তু তখনই ঠোঁট স্থির হয়ে গেছে, মুখের মাংস শক্ত হয়ে গেছে; দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল দুটোকে পাথুরে কঠিন করে মতি গরম লোহার ওপর হাতুড়ির ঘা বসিয়েছে। কিন্তু রতির হাতুড়ির ঘা শুনে ভয়ে মুক্তা যেমন চোখ বুজে শ্বাস বন্ধ করে থাকে এখন তো তা করে না। তবে কি মতির হাতুড়ির বাড়ির জোর কম? তেমন করে মাটি কাঁপে না, ঘর কাঁপে না, বুক কাঁপে না? টলটল করে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। রতির দিকে চেয়ে আছে আর হাপর ঠেলছে। উনুনের সবগুলো কয়লা হীরার মত জ্বলছে। আর তো হাওয়া দেবার দরকার নেই। কিন্তু মেয়েটার হাত হাপর থেকে উঠছে কই? আগুনের আভায় গোলাপ ফুলের রং ধরেছে ওর ফরসা গালের থুতনির কপালের। গোলাপের চিকণ পাতার মত বাঁকা ভুরুদুটো ছড়িয়ে আছে দুই চোখের ওপর।

ঠোঁট দুটো বেশি লাল—যেন গোলাপফুলের একেবারে বুকের মাঝখানের দুটো কচি পাপড়ি।

একটা গরম নিশ্বাস ফেলল মতি।

রতি ঘাড় ঘুরিয়ে থুথু ফেলল।

লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। রতি সেটা উনুনে গুঁজে দিয়ে আবার কিছু কাঠ-কয়লা ছড়ায়। উনুন কালো হয়ে যায়। ফুটফাট শব্দ হয় নতুন কয়লার। ধোঁয়া ওঠে গলগলিয়ে।

'চোখ জ্বালা করছে বুঝি?' রতি শুধায়।

'না।' মুক্তা হাঁটুর ওপর চোখ ঘষে আর কেমন যেন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে গলায় একটুখানি হাসে। হাসিটা মতির কানে যায়, কিন্তু তাতে সে অবাক হয় না, অবাক হয় তার দাদা রতি কর্মকারের গলার স্বরটা কেমন মিঠা নরম হয়ে গেছে শুনে। মনে মনে হাসল মতি। দাদার মেজাজ এখন ঠাণ্ডা। দাদার মেজাজ ঠাণ্ডা আছে দেখলে মতির ভাল লাগে।

কোন কথা না কয়ে সে ঝাঁপ সরিয়ে দোকানের বাইরে আসে। বিড়ি ধরায়। বিড়ি ধরিয়ে রাতের আকাশ দেখতে চোখ তোলে। গাছের আড়ালে চাঁদ নেমে গেছে। হাওয়াটা মিষ্টি। দূরের মাঠ থেকে ভাঁটফুলের গন্ধ ভেসে আসে। মতি চিন্তা করল, মেয়েটা এখানে যতদিন আছে, রতি ততদিন এরকম রাগারাগি করবে, আবার হঠাৎ একসময় নরম হয়ে যাবে। দাদা মেয়েছেলে সহ্য করতে পারে না। সেই ছোটবেলা থেকে। দামিনী এ-বাড়ি ঢুকল আর তাদের মা গলায় দড়ি দিয়ে মরল, রতি তা কিছুতেই ভুলতে পারে না। মতিও পারে না। কিন্তু রতির মত মেয়েছেলে দেখলেই মতির মাথা গরম করা কি রাগারাগি করা ভাল লাগে না। দামিনী বুড়ী হয়ে গেছে। কদিন আর বাঁচবে। এখানে আছে থাকুক। আর এই মেয়েও কি বেশিদিন থাকবে? বড় জোর আর দিন তিন চার। ভাই এসে নিয়ে যাবে। একেবারে কম বয়স মেয়েটার। বিপদে পড়ে এসেছে। ওর ওপর রাগ করে কী হবে? নিশ্চয় রতিও মাঝে মাঝে তা চিন্তা করে। তখন বুঝি তার মনটা নরম হয়। যেমন এখন। 'ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে' কথাটা জিজ্ঞেস করল তো? আর তখন ওই মেয়ে মতিকে মাথা পিছনে রেখে সাবধান হয়ে বসতে বলাতে রতির কী রাগ? দরদ? মতির হাসি পায়। দু দিনের জন্য তার ওপর দরদ দেখিয়ে ওর লাভ কি?

কিন্তু মতির মনের এই হাল্কা ভাব কতক্ষণ থাকে? বিড়ি শেষ করে দোকানে

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটাও বুঝি গরম হয়ে উঠল। উনুনের আগুন আবার জোরালো হয়ে উঠেছে। আগুনের আভায় মেয়েটার গাল গলা গোলাপী রং ধরেছে। ওর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সে। যেন একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি মতির চোখের সামনে বসে আছে। কেবল মাথা গরম হয় না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও যেন মতির বুকের মধ্যে ডেলা পাকিয়ে ওঠে। তাদের গাঁয়ের মধু ধোবার বাজির কারখানার কথা মতির মনে পড়ে যায়। এইটুকু একটা বারুদের টুকরো, কিন্তু কী তেজ— কেমন করে জানি হঠাৎ জ্বলে উঠে ফেটে পড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্বালিয়ে দিতে চায়। নরম ছোট শরীরের ওই মেয়েটাকে দেখে মতির তাই মনে হল। যেন কত ঠাণ্ডা কত শান্ত দেখতে, কিন্তু আসলে যে ওর ভিতরে—

অবাক হল মতি দাদাকে দেখে। রতির হাতে সাঁড়াশি নেই। হাতদুটো হাঁটুর ওপর রেখে চুপ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ে না; যেন ছোট ছেলে অবাক হয়ে নতুন পুতুল দেখছে। মতির কপালে ছোট বড় কটা রেখা দেখা দেয়। হাতুড়ি তুলে সে পায়চারি করে। উনুনে আগুন দপদপ করছে, সাপের জিভের মত সবুজ নীল শিখা ওপরে উঠে কী যেন খেতে চাইছে—হাপর ঠেলে হাওয়া করার বিরাম নেই মুক্তার। সাধন নন্দীর লাঙলের লোহাটা উনুনে মুখ গুঁজে আছে; লোহাটা পুড়ে পুড়ে মোমের মতন সাদা হয়ে গেল না? রতি ভুলে গেছে ওটা তুলে এনে পাটার ওপর রাখতে হবে; রতি কি দেখছে না হাতুড়ি হাতে করে মত অপেক্ষা করছে? মতির হাত নিসপিস করছে, হাতুড়ি ধরা হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে, দড়াম দড়াম করে সে হাতুড়ির ঘা বসাতে চাইছে। 'দাদা—' একবার ডেকে মতি থেমে যায়। মেয়েটা উপুড় হয়ে হাপর ঠেলছে, উনুনের ওপর মাথাটা ঝুঁকে আছে, কানের ওপর দিয়ে দুগাছি চুল এমন ভাবে ঝুলে আছে এখনি চুলে আগুন ধরে যাবে হয়তো।

'এই মেয়ে—' ডাকতে গিয়ে মতি চুপ করে গেল।

দাঁত ছড়িয়ে রতি হাসছে। যেন খুশি হয়েছে, ভাল লাগছে তার মেয়েটা এভাবে উনুনে হাওয়া করছে দেখে। যেন রাত চাইছিল, কেবল হাপর ঠেলে না, গোলাপের পাপড়ির মত পাতলা নরম ঠোঁটদুটো আগুনের সঙ্গে ঠেকিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনকে আরো জোরালো ভয়ঙ্কর করে তুলুক মেয়ে। তার এই ভয়ঙ্কর ইচ্ছার ছোঁয়াচ মেয়েটারও লাগছে না? পাগলের মতন ও হাপর

ঠেলছে, পিঠটা বেঁকে আছে, সরু কোমরটা পিছনের দিকে সরে এসেছে।

'এই, এই —' চিৎকার করতে গিয়ে মতির গলা আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আর, তার চিৎকার কি ওরা শুনত! মতি পরে চিন্তা করেছে। আগুন জ্বালাবার, আগুন জ্বালানো দেখবার সাংঘাতিক ইচ্ছা যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন আর কোন শব্দ আর কারোর ডাক সে শোনে না; রতি শুনল না, মুক্তা শুনল না। কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মতি তাই দেখল, দেখছিল। এমন চমৎকার আগুনের ঝলক যদি গায়ে না লাগল, শাড়ির আঁচলে না লাগল তো কষ্ট করে তা জ্বালানো কেন? মতি সব বুঝল। যেন তার দাদা তৈরি হয়ে ছিল। আর একটু সামনের দিকে মেয়েটা ঝুঁকতে ঝুপ করে ওর বুকের আঁচলটা আগুনের ওপর পড়ে; চোখের পলক ফেলার আগে রতিও আঁচলসুদ্ধ ওকে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু মুক্তা কি ভয় পেল? আগুন বা জোয়ান পুরুষের হাতের শক্ত বাঁধন কিছুই যে ওকে চমকে দেয় নি, ভয় পাইয়ে দেয় নি, মুক্তার চোখ, ওর শরীরের ক্লান্ত এলানো ভঙ্গি থেকে মতি পরিষ্কার বুঝল। মতি তার দাদার দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখল। মুখ ঘুরিয়ে দোরের ঝাঁপের কাছে সরে গেল, থুথু ফেলল, গলার একটা শব্দ করল। কিন্তু সেই শব্দে ছাব্বিশ বছরের একটা জোয়ানের দাগড়া বুক থেকে ষোল বছরের মেয়ের নরম তুলতুলে শরীর আলগা হয়ে আসে না।

তবু যদি আগুন থাকত, আঁচলের একটা সুতো পোড়বার আগে রতি এভাবে মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে না নিত! প্রথমটায় আস্তে, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে মতি হেসে ফেলল। চেষ্টা করছিল সে হাসি চাপতে, কিন্তু নিজে থেকে যেন হাসিটা তার বুক ফুঁড়ে গলা ঠেলে হো হো করে বেরিয়ে এল। যেমন বাঁধ ভেঙে বানের জল বেরিয়ে আসে।

এই হাসির অর্থ রতি বুঝল। রতির গায়ের সঙ্গে কাঁটার মত বিঁধে থেকে মুক্তা বুঝল। মতি এত জোরে হাসল বলে মুক্তার গায়ে এখন কাঁটা দিয়ে উঠল। যেন এতক্ষণে তার দিশা হয়েছে কী কাজটা সে করে বসেছে! আগুন? না, তার আঁচলে গায়ের চামড়ায় আগুনের আঁচটিও লাগে নি। যদি সেরকম কিছু চিহ্ন থাকত, দাগ থাকত, সেটা সাক্ষী করে মুক্তা মাথা তুলে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাতে পারত। যেমন কাল মতির আগুন নেভানোর পর পোড়া আঁচলটা হাতে করে ও বড় ভাইয়ের দিকে তাকাতে পেরেছিল, নিশ্বাস ফেলতে পেরেছিল। রতির হাত ছাড়িয়ে মুক্তা আস্তে আস্তে উনুন পার হয়ে ঘরের

আর কোণায় সরে যায়, তার পর ঝাঁপ ঠেলে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে যায়।

আর রতি? মেয়েটা বেরিয়ে যেতে রতি বুঝল, যেন তখন তার কানে গেল, মতি জোরে জোরে হাসছে। রতি মুখ গুঁজে বসে থাকে। সাধনের লাঙলের লোহাটা পুড়তে থাকে। হাওয়ার অভাবে উনুনের কয়লা কালো হতে থাকে। এক সময় উনুন নিভে যাবে, লোহাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। রতি জানে, মতি জানে। কিন্তু সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। হাতুড়িটা ঘরের কোণায় পড়ে আছে। মতি পায়চারি করছে আর থেকে থেকে হাসছে। হাতুড়ির দিকে ভুলেও সে তাকায় না।

দোকান থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমে মুক্তা বড় ঘরের দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কান পেতে থাকে। সাবি ঘুমোচ্ছে; পিসি ঘুমোচ্ছে, বুড়ো কর্তা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারল ও; বুঝতে পেরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। পা টিপে টিপে গুদামঘরের পৈঠায় উঠল। পৈঠার ওপর দামিনী শুয়ে। দামিনীর নাক ডাকছে। কুকুরটা এক পাশে শুয়ে আছে। সব ঘুমিয়ে পড়েছে যখন, তখন রাত অনেক হবে মুক্তা অনুমান করতে পারল। তার কপাল ঘামছিল। শরীরটাও ঘামছে। যেন ঘামে চান করে উঠেছে। ঠাণ্ডা হাওয়াটা ভাল লাগছিল। কিন্তু এই ভাল লাগা অন্যদিন 'আর এক রাইতে ভাল লাগত আমার—আইজ না, আইজ বড় অশান্তি লাগছে মনে', চিন্তা করে পৈঠার খুঁটিটা ধরে মুক্তা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চাঁদটা নেমে গিয়ে উঠোনের লাউমাচার পাশে সজনে গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু খুঁটি ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মুক্তা তো চাঁদ দেখছে না। চাঁদ দেখছে না, আকাশ দেখছে না, উঠোন দেখছে না—কুকুর যেমন শিকারের শব্দ পেয়ে কান খাড়া করে ধরে, মুক্তার অবস্থা তাই হল। কান খাড়া রেখে সে তার বুকের ভিতর দুবদুব শব্দটা শুনছে আর শুনছে দোকানঘরের হাসি। যেন পাগল হয়ে গেছে মতি। দমকা হাওয়ার মত হাসিটা থেকে থেকে ভেসে আসছে। 'না, রতির মুখে আওয়াজ নাই—রতি মুখ বুইজা চুপ মাইরা আছে;—তুমি না বড় ভাই, তোমার লাজ কি; এই ঘর এই সংসার, জমিজমা তুমার—তুমি একবার মুখ ফুইটা কও, বাস্তুহারা মাইয়াগারে আমি চাই, আমি বিয়া করমু, এই মাইয়ারে লইয়া আমি সংসার পাতমু।' মুক্তা রতির সঙ্গে মনে মনে কথা বলল। কিন্তু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের যন্ত্রণাই

বাড়ল, আর কিছু ফল হল না। তার মনের কথা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। কেননা, বড় রকমের একটা আওয়াজ শুনল সে দোকানঘরে। যেন হাতুড়ি ছুঁড়ে মেরেছে কে, যেন বেড়ার গায়ে হাতুড়িটা ছিটকে পড়ল। মুক্তার পা কাঁপছে। তা হলেও একবার উঁকি দিতে হয়, দেখতে হয়। কে জানে দুজন যদি খুনাখুনি—

উঠোনে নেমে এক পা এক পা করে মুক্তা এগোয়—সাহস পায় না, দোকান-ঘরের বেড়ার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ায়।

'হুঁ, কাল—কাল সূয্যি ওঠার আগে ওটাকে তাড়িয়ে দেব।'

'তাই দাও, তাই দিও—ছি ছি, তুমি জগৎ কর্মকারের নাতি, মনোহর কর্মকারের ছেলে—একটা বাস্তুহারা মেয়ে, চাল নেই, চুলো নেই, বাপ-মার পরিচয় নেই—এই রকম একটা মেয়ে যদি—'

'আর বলতে হবে না, আর বেশি বলিস নে মতে—তোর পায়ে ধরি। কাল সূয্যি ওঠার আগে তুই নিজের হাতে ঘাড়ে ধরে ওটাকে তাড়িয়ে দে, আমি কিছু বলব না।' যেন রতির গলার স্বরটা কেমন, যেন কাঁদছে সে ছোট ভাইয়ের সামনে।

সব বুঝল মুক্তা, বুঝে নিশ্চিন্ত হল। হাল্কা পায়ে ও তার ঘরে উঠে এল। বিছানা পাতল না। এমনি মাটির ওপর শুয়ে পড়ে বুকের ওপর দু হাত জড়ো করে ধরে রেখে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল: 'মধুসূদন—মধুসূদন—আমার গতি কর, বলাইরে সুমতি দেও, যেন কাইল আইয়া আমারে এইখান থাইক্যা উদ্ধার করে।' ঠাকুরকে ডাকল বটে ও, কিন্তু চোখের সামনে তো বলাইকে দেখল না—দেখল রতিকে, মতিকে। মুক্তা কাঁদতে লাগল। এক দুঃসহ যন্ত্রণার কাঁটা তার বুকে বিঁধে আছে। এই কাঁটা কুমারেশের ঘরে থাকতে ছিল না। মুক্তার ইচ্ছা হল গলায় দড়ি দেয়।

॥ চব্বিশ ॥

আগুন ঝরছে আকাশ থেকে। কোথায় যেন একটা চিল ডাকছে। আর কোন শব্দ নেই চারদিকে। মানুষ না, গরু ছাগল না, একটা পাখি পর্যন্ত চোখে পড়ে না। বাবলা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে বলাই ভাবছে। সারারাত ঘুমোয় নি। বাবলার ঠাণ্ডা ছায়ায় তার চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু তা হলেও কি এমন জায়গায় সে ঘুমোতে পারে! মাথায় অনেক দুশ্চিন্তা। সুধীর পুকুরে নেমে মাথা ডুবিয়ে স্নান করছে। বলাই দেখতে পাচ্ছে। সুধীরের মাথাটা গরম হয়ে আছে। তাই জলে ডুব দিয়ে দিয়ে ছোঁড়া মাথা ঠাণ্ডা করতে চাইছে। ওদিকে তাকিয়ে থেকে বলাই থুথু ফেলল। তার পর হাত বাড়িয়ে সুধীরের ঘামে ভেজা হাফ সার্টটা ঘাসের ওপর থেকে কোলের কাছে টেনে আনল। পকেটে পাঁচ টাকার দুটা কারেন্সি নোট। নতুন নোট। মেটিয়াবুরুজের সেই হিন্দুস্থানিটার টাকা। তার গুদামে রাতারাতি সিমেন্টের বস্তাগুলি তুলে দিয়ে এত বড় এক নোটের তাড়া নিয়ে পাঁচ জন সূর্য ওঠার আগে লরী চালিয়ে উল্টাডাঙ্গার সেই পড়ো গ্যারেজের পিছনের জঙ্গলে ফিরে আসে। নোটের তাড়া ভেঙ্গে রজনী পাঁচজনের হাতে টাকা তুলে দিয়েছে। সাত নম্বর, অর্থাৎ বেঁটে ড্রাইভার পেয়েছে তিনখানা নোট, সুধীর পেয়েছে দুখানা, আর আট ও ছ নম্বর—সিমেন্টের বস্তা নিয়ে চলতি ট্রেন থেকে যারা লাফিয়ে পড়েছিল, চারখানা করে নোট পেয়েছে পাঁচটাকার। আর বলাই? দু টাকার একটা লাল নোট। সুধীর তখন শব্দ করে নি। পকেটে টাকাটা পুরে গুম মেরে ছিল। বলাইর অবশ্য রাগ করার কিছু ছিল না। সবে সে দলে ভিড়েছে। হয়তো চুরির প্রথম দিন বলে সে কিছুই পাবে না ধরে রেখেছিল। নিজের হাতে তো কিছু করে নি সে, কেবল সঙ্গে ছিল।

শুনে সুধীর ভেংচি কেটে বলাইকে পরে বলছিল, 'টের পেয়ে পুলিস যদি গুলী ছুঁড়ত তো তোর মাথাটাও উড়ে যেতে পারত। ঠিক কি না?'

বলাই হেসে মাথা নেড়েছিল।

'বখরা না—রজনী শালা লুঠের মাল বেচে তোদের মাইনে দিচ্ছে?'

'তা ছাড়া কি!' সুধীর রাগ করে থুথু ফেলছিল, যেন হাড্ডিসার রজনীর চেহারা মনে করে থুথু ফেলছিল। 'আমি শালা আর ওর দলে থাকছি না।'

'তো করবি কি?' বলাই আদর করে সুধীরের কাঁধে হাত রেখেছিল। দুজন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে হাঁটছিল। সুধীরের জানাশোনা হোটেল আছে। সেখানে তারা ভাত খাবে মতলব করে ওদিকে এগোচ্ছিল। রেলপোলের কাছে গিয়ে তারা আর এগোতে পারে নি। পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। পুলিস দেখে তারা সোজা আবার মাঠের দিকে ফিরে এসেছে। একটা ফেরিওয়ালা ভাজাভুজি নিয়ে উল্টাডাঙ্গার বাজারের দিকে যাচ্ছিল। তার কাছ থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে দুজন খেয়েছে।

'আবার চাকরিতে ঢুকবি নাকি—হোটেল কি রেস্টরেণ্টের বয়গিরি?'

সুধীর মাথা নেড়েছে।

'স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে দাদা, আর ওসব কাজে মন বসবে না।' পর পর দুটো লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে সুধীর যেন হঠাৎ কি ভাবছিল, তার পর নিজের মনে বলছিল, 'জেলেপাড়ার রঘুর নাম শুনেছিস, রঘু নন্দী? বড় গুণ্ডা?'

বলাই মাথা নাড়ল।

'মানকের নাম জানি। মানিক পাল।'

'রঘুর চেলা মানিক। চেলার সঙ্গে না, খোদ কর্তার সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। রেস্টরেণ্টে মাঝে মাঝে চা খেতে আসত রঘু, তখন আলাপ।'

বলাইর দু চোখ বড় হয়ে যায়। সুধীর বলতে আরম্ভ করে: মুকুল ছুঁড়ি মেধোর সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর মন খারাপ করে রেষ্টুরেণ্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কদিন সে আলুটা বেগুনটা, পর্যন্ত লেবুটা নিয়ে রাস্তায় বসে বিক্রী করেছিল। কিন্তু ফুটপাথের ওপর দোকান নিয়ে বসার হাঙ্গামা কত বলাই নিশ্চয় জানে। যখন তখন হল্লা আসছে। সুবিধা পেল তো দোকানসুদ্ধ দোকানীকে গাড়িতে তুলে লালবাজার নিয়ে গেল। যাচ্ছেতা গালিগালাজ, জরিমানা, দরকার হলে রুলের গুঁতো তো আছেই। একদিন সুধীর চড়াদামে এক ঝুড়ি নতুন ফুলকপি কিনে সবে দোকান সাজিয়ে বসেছিল। এমন সময় হঠাৎ হল্লা-গাড়ি ছুটে আসে। একটু অন্যমনস্ক ছিল সুধীর। কাজেই দোকানটা পাশের বাঁরুর পানের দোকানের খুপরীর মধ্যে ঢোকাবার সময় পায় নি। পুলিস কপির ঝাঁকাটা তুলে নিয়ে যায়। সুধীর একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হাতের শেষ কটা পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছিল তার মাল কিনতে। আর সেই মালের এই দশা। গাড়িতে বসে জুতোর ডগা দিয়ে পুলিসের বড়বাবু ফুলকপিগুলি থেতলে দিচ্ছিল। সুধীরের চোখে জল এসে যায়। এমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ তার কাঁধে কে হাত রাখল। ঘাড়

ফিরিয়ে দেখে রঘু। মদ খেয়ে টং হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাল চোখ। সঙ্গে আর একটা কে। সম্ভবত সুধীরের চোখে জল দেখে রঘুর মায়া হয়েছিল। উঁহু, এভাবে কলকাতা শহরে বাঁচতে পারবি নে। ভালমানুষ হয়ে থাকলে কেবল লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে। তা হলে কি করব? সুধীর রঘুকে জিজ্ঞেস করেছিল। তা হলে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা করবি অমুক ঠিকানায়। বলে রঘু তার সঙ্গীকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'দেখা করেছিলি দলের সর্দারের সঙ্গে?' বলাই প্রশ্ন করল।

সুধীর মাথা নাড়ল।

'বলল, আগে ছিনতাই, পকেটকাটা বিদ্যাগুলো শিখে নে। তার পর বড় কাজে হাত দিবি। আমার চেলাদের সঙ্গে কদিন ট্রামে বাসে বাজারে স্টেশনে ঘুরবি। ওরা শিখিয়ে দেবে। তারপর যখন হাত পাকা হবে বুদ্ধি বাড়বে সাহস বাড়বে—'

'কদিন ছিলি রঘুর দলে?'

'তাই তো বলছি, শোন—' সুধীর হঠাৎ কি ভেবে বলল, 'না, রজনীর চেয়ে রঘুর আত্মা অনেক বড়। রঘুর চেলাদের সঙ্গে কদিন ট্রামে বাসে, হাটেবাজারে, সিনেমাহলের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হাত পাকিয়ে ফেললাম। বখরা-টখরা কিছু দিতে হত না রঘুকে। রাত্রে আড্ডায় ফিরে গিয়ে সারাদিনের রোজগার রঘুর হাতে তুলে দিতাম যখন রঘু আবার আমায় সব ফিরিয়ে দিয়ে বলত, তুই নে, তুই রাখ, ওসব হল আমার কাছে মশা মাছি—ঘড়ি পেন কানের রিং হার—গণ্ডার মোষ যেদিন এনে দিতে পারবি সেদিন নেব।'

বলাই হেসেছিল।

'গণ্ডার মোষ—মানে বড় শিকার?'

সুধীর হাসে নি।

'কিন্তু রঘুর দলে বেশিদিন থাকা হল না, যদি থাকতে পারতাম আজ কেউ-কেটা হয়ে যেতাম।'

'কি হয়েছিল?'

'রাত তখন এগারোটা, যেন ওটা লাস্ট ট্রাম ছিল—কাজেই ভিড় ছিল। হাওড়া টু পার্ক সার্কাস। লেডিজ সীটে একটা লোক বসে ঢুলছে। লেডিজ ছিল না গাড়িতে। আমি পিছনের সীটে বসা। লোকটার হাতে ঘড়ি। সোনার ব্যাণ্ড। আমার চোখ চিকচিক করছিল। শেয়ালদায় অনেক লোক নেমে গেল।

কিন্তু সামনের রোগা মানুষটা বসে আছে। ভাবছিলাম কোথায় ও নামবে! যদি হাতে টিকিট দেখতে পেতাম তবে আন্দাজ করা যেত। যা হোক, লোকটা যে ঢুলছিল বসে বসে তাতে আমার কেমন একটু আশা জাগছিল মনে। একে-বারে শেষ মাথায় গিয়ে নামবে হয়তো, ভাবলাম। ওদিকটা ফাঁকা। শেয়ালদা মৌলালী আমাদের কাছে তেমন সুবিধার জায়গা না, দোকান-পাট বেশি, লোকজন বেশি, আলো বেশি, আর পুলিস সার্জেন্টের ছড়াছড়ি। কাজেই যেন ঘুম পেয়েছে এমন ভান করে আমিও ঢুলতে লাগলাম। তোমায় বলতে ভুলে গেছি, আমার চোখে ধুলো দিয়ে রেস্টুরেন্টের সেই মেয়েটা যেদিন মেধোর সঙ্গে পালিয়ে গেল সেদিন থেকে আমি এত বড় একটা ছোরা কোমরে গুঁজে ঘুরছি।'

বলাই হাসল।

'না-না, হেসো না বলাইদা—আমি যেদিনই শালীর দেখা পাব ওর বুকে এটা বসিয়ে তার পর হাসতে হাসতে জেলে যাব।'

'ফাঁসি হবে!'

'আমি তৈরী।' সুধীর আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলাই গম্ভীর হয়ে যায়।

'হুঁ, কি বলছিলাম, ট্রামের সেই ঘড়িপরা লোকটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, কে-জানে, হয়তো মুকুলের বুকে ছুরি বসাবার আগে ওই লোকটার বুকে ওটা আগে বসাতে হবে। এতকাল কেবল গাঁট কেটেছি পকেট মেরেছি—কারো বুকে ছুরি-ছোরা চালাবার দরকার হয় নি, আজ না হয়—আসল কথা কি জান, মুকুলের দেখা পাচ্ছিলাম না বলে আমার যেন আর বাঁচতে ইচ্ছা করছিল না, ট্রামে বাসে হাটে বাজারে ঘুরে ঘুরে কেবলই একটা গাঁটকাটার জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাটা কিছু না, মানে একটা ঘড়ির জন্য আজ সাংঘাতিক কিছু করব—তারপর যদি জেলে যেতে হয় যাব, ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয় ঝুলব, এমন একটা মনের ভাব এসে গেছল সেদিন।'

'মানে ঐ লাইনটা তোর ভাল লাগছিল না আর কি।' বলাই মন্তব্য করল। 'তার পর?'

'মৌলালী ছেড়ে গাড়ি আবার চলল। কিছু লোক নামল, উঠল না কেউ। আর একটু নিশ্চিন্ত হলাম। হুঁ, সার্কুলার রোডের সাহেবদের সেই কবরখানার কাছে একটা স্টপে গাড়ি দাঁড়াতে হঠাৎ চমকে উঠলাম, সামনের রোগা মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার বুকের ভিতর তখন হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়াব কি বসে থাকব চিন্তা করছি যখন গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল, লোকটা নেমে

গেল, ব্যস্ত হয়ে আমিও নেমে পড়লাম। বাঁ-হাতি একটা অন্ধকার গলির মধ্যে রোগা মানুষটাকে ঢুকতে দেখে আমিও সেদিকে এগোতে লাগলাম। না, আমার পিছনে কেউ ছিল না। সাহস বাড়ল। একটা ছোট পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা পান চাইল। আমিও পান খাব বলে দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। লোকটা আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে কিনা দেখতে আমি আড়চোখে তার দিকে তাকাই। না, আমার দিকে তার নজর ছিল না। মুখে পানের খিলি পুরে পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে একটা দশটাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটিন গোল্ডফ্লেক চাইল। মনটা নেচে উঠল। হাতে কেবল সোনার ব্যাণ্ড লাগানো ঘড়ি পরে হাঁটা ফতো বাবু না, ভিতরে শাঁস আছে। মনিব্যাগ খোলার সময় ভাঁজ করা মোটা নোটের তাড়া চোখে পড়ল। সিগারেটের টিন ও চেঞ্জ পকেটে পুরে লোকটা আবার হাঁটে। দু পয়সার এক খিলি পান গালে পুরে আমিও হাঁটি। একটা ছোট গলির মধ্যে লোকটা ঢুকল। চুপচাপ চারদিক। ধারে কাছে কেউ নেই। আর দেরি করা ঠিক না চিন্তা করে কোমর থেকে ছোরাটা টেনে বার করলাম, কিন্তু—' সুধীর হঠাৎ থামল।

'কি হল!' বলাই হাঁ করে তাকিয়ে সুধীরের মুখ দেখছিল।

'আমার পায়ে চপ্পল ছিল, শব্দ শুনে লোকটা ঘাড় ফেরাল। আমার হাতের চকচকে ছোরা দেখে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। কি, তুমি বিশ্বাস করবে বলাইদা? আমি-তুমি হলে কি করতাম? ভয় পেয়ে দৌড় দিতাম, নয়তো চেঁচিয়ে উঠতাম—'

'ছুরি-ছোরা নিয়ে কেউ মারতে আসছে দেখলে আমি থোরাই কেয়ার করি।' বলাই হাসল। 'আমি তখন তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম—হাতের ছোরা কেড়ে নিয়ে তোকেই শেষ করতাম।'

'হ্যাঁ, তা-ও তুমি করতে পার, কিন্তু সে তা করে নি, দিব্যি হাসতে আরম্ভ করল, হেসে টিন থেকে সিগারেট বার করে সিগারেট ধরাল, তারপর আঙুলের ইশারা করে আমায় ডাকতে লাগল।'

'বেশ মজা তো—তুই কি করলি?'

'আমার মনের অবস্থাটা তখন কেমন হল জান, সেই যে ছোটবেলায় যখন ইস্কুলে পড়তাম – পিছনের বেঞ্চিতে বসে লুকিয়ে ব্লেড দিয়ে কেটে কাঁচা আমটা শশাটা খাচ্ছি আর হঠাৎ তা মাস্টারমশায়ের চোখে পড়ে গেল—মাস্টারমশায় গালমন্দ করলেন না, বা বেত হাতে ছুটে এলেন না, বরং ঠোঁট টিপে হাসতে

লাগলেন আর হাতের ইশারায় আমাকে তার টেবিলের কাছে উঠে যেতে ডাকলেন।'

'তার পর?'

'আমি অবশ্য গেলাম না, দাঁড়িয়ে রইলাম, রোগা লিকলিকে চেহারার মানুষটার হাসি দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেলাম, ঐ অবস্থায় কেউ এমন করে হাসতে পারে জানতাম না। লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অথচ নড়তে পারছি না—আমি যে গলি থেকে বেরিয়ে আসব সেই ক্ষমতা যেন আমার চলে গেছে।'

'সাবাস! সাবাস!' বলাই ঠাট্টার সুরে কি বলতে যাচ্ছিল—চুপ করে গেল। সুধীর এর পর যে নামটা উচ্চারণ করল তাতে বলাইকে চুপ থেকে সব শুনতে হল। ঐ রোগা মানুষটা আর কেউ না—রজনী। কোন কথা না বলে প্রথমেই সুধীরের হাত থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে রজনী নিজের কোমরে গুঁজল, তার পর সুধীরের পিঠে হাত রেখে আদরের সুরে জিজ্ঞেস করল, কবে থেকে সে এই লাইনে—কার দলে, আড্ডা কোথায় ইত্যাদি—তারপর নাকি সুধীরকে বলেছিল সন্ধ্যার পর অমুক ঠিকানায় দেখা করতে—কেবল তাই না, যদি দেখা না করে তবে শনিবার দুপুরের আগে সুধীরের লাস উল্টাডাঙ্গার খালের ধারে পুলিস দেখতে পাবে। কোন রকম উত্তেজনা না, তেমনি হাসতে হাসতে বেশ মোলায়েম সুরে কথাটা জানিয়ে দিয়ে রোগা লোকটা সিগারেট টানতে টানতে গলির রাস্তা ধরে হেঁটে চলে গিয়েছিল। এক শুক্রবার রাত্রের ঘটনা।

শুনে বলাই আর একটা কথা বলে নি। অর্থাৎ কবে কিভাবে সুধীরকে রঘুর দল ছেড়ে ঐ সাংঘাতিক শক্ত মানুষ রজনীর দলে ভিড়তে হয়েছিল, তখন হোটেলে ভাত খেতে যাবার সময় সুধীরের মুখে বলাই গল্পটা শুনেছিল। পোলের কাছে পুলিস দেখে দুজন যখন মাঠের এই গাছতলায় ফিরে আসে তখন সুধীর একটা মজার কথা বলেছিল। জামার তলা থেকে একটা ছোরা বার করে বলেছিল, 'এই এটা—রজনীর দলে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে রজনী আমাকে এটা ফিরিয়ে দিয়েছে, বলেছে—যারা গাট কাটে পকেট মারে, কি অন্ধকার রাস্তায় একলা কেউ চলেছে দেখে ছোরা দেখিয়ে টাকাকড়ি বা তাদের জিনিসপত্তর কেড়ে নেয় তাদের অস্ত্র আমি রাখি না। আমার দলে ভর্তি হয়েছিস, এখন আর ওসব দিয়ে কিছু হবে না, বোমা বন্দুক ছাড়া আমার এখানে কোন কাজ হয় না—কাজেই ছোরাটা জলে ফেলে দিতে পারিস। তোর জিনিস তুই ফেলে দে।

কারো কাছে বেচেও দিতে পারিস—চার-ছ আনা যা পাওয়া যায়—বিড়ি সিগারেটের পয়সাটা হবে।'

শুনে বলাই হেসেছিল।

'ভাল কথা বলেছে রজনী। ওয়াগন ভেঙ্গে মাল লুঠ করতে ছোরা ডেগার কিছু না। তা, ওটা আজও কোমরে গুঁজে রেখেছিস কেন?'

'ওই যে বললাম, মুকীকে খুন করব।' কথাটা বলে সুধীর একটা গরম নিশ্বাস ফেলেছে। মেয়েটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না ছোঁড়া। বলাই চিন্তা করছিল। তেলেভাজা খাবার খেয়ে সুধীর পুকুরে নেমেছে। এখনও জল থেকে উঠে আসছে না। অল্প বয়স। তাই মাথা গরম। মুকীর জন্য মাথা গরম, রজনীর কাছ থেকে মোটে দুখানা পাঁচ টাকার নোট পেয়ে মাথা গরম। নোট দুটো আবার সুধীরের জামার পকেটে পুরে রেখে বলাই ছোরাটা হাতে তুলে নিল, আঙুল বুলিয়ে ছোরার ধার পরীক্ষা করল। একটা কথা বলাইর মাথায় আসছে না। মেয়েটা রেস্টুরেণ্টে চাকরি করত—বলা যায় নষ্ট মেয়ে, আর এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গেল, আর ওই মেয়েটাকে সুধীর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এমন হয় কেন? কই, হাতের মুঠোয় মেয়ে পেয়েও বলাইর একদিন ইচ্ছা করে নি তাকে ধরে রাখে, বরং যতক্ষণ না মুক্তাকে আর কারোর কাছে গছিয়ে দিতে পারছিল সে শান্তি পায় নি। কুমারেশের কাছে মেয়েটা থাকল না, এখন কর্মকারদের কাছে রেখে আসতে পেরে বলাই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে—আর ওই সুধীর ছোঁড়ার কিনা বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে মুকুল না কার জন্য! সুধীরের এখন যে-বয়স বলাইর একদিন সে-বয়স ছিল। কিন্তু কোন মেয়েছেলের জন্য হায়-আফসোস করা কাকে বলে বলাই জানে না। আচ্ছা দাঁড়াও—যেন হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল বলাইর মাথায় কথাটা চিন্তা করতে গিয়ে।

'হেই—হল?' বলাই হাত তুলে ডাকে। জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সুধীরের চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। বলাইর ডাক শোনে সে ঘাড় নাড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ডুব দেয়। ডুবসাঁতার কেটে পুকুরের ওধারে চলে যায়। একটা পানকৌড়ি সুধীরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বলাই সুধীরের জামাটা হাতে তুলে নিশানের মত নাড়তে থাকে। তার অর্থ, শিগগীর চলে আয়—না হলে জামা নিয়ে আমি চললাম। জামার সঙ্গে পাঁচ টাকার নোট দুখানাও যাবে। পুকুরের ওধারে গলা জলে দাঁড়িয়ে সুধীর মাথা নাড়ে। তার অর্থ, ওই ছেঁড়া শার্ট আর দশটা টাকার জন্য আমি থোরাই কেয়ার করি। ইচ্ছা

হয় তুমি নিয়ে যেতে পার—আমার ওসবে মন নেই।

পাগল! বলাই নিজের মনে বিড় বিড় করে আর হাসে। আর কথাটা চিন্তা করে। একটা চায়ের দোকান খুলতে কি পরিমাণ পুঁজির দরকার, বলাই তা-ও যেন হিসাব করতে আরম্ভ করে। সুধীর জল থেকে উঠে এল।

'মাথা ঠাণ্ডা হল?' বলাই নতুন বিড়ি ধরায়। দেশলাইটা ঘাসের ওপর রেখে সুধীরের গা-মোছা মাথা-মোছা দেখে। সুধীর কথা বলে না। গা মাথা মোছা শেষ করে জামাটা গায়ে চড়ায়। কাগজের নোট দুটো ঠিক আছে কিনা পকেট হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে। তার পর বলাইর হাত থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে কোমরে গোঁজে। বলাই আবার ঠোঁট টিপে হাসতে আরম্ভ করে। সুধীর গ্রাহ্য করে না।

'বরং ওটা বেচে দে কারো কাছে, কটা পয়সা আসবে।' বলতে বলতে বলাই উঠে দাঁড়ায়। সুধীর দেশলাই ও বিড়ির বাণ্ডিলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয়। বলাই ইতিমধ্যে অর্ধেক বাণ্ডিল উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাতে যে সুধীর রাগ করল এমন ভাব তার চোখে মুখে প্রকাশ পেল না। বলাই খুশি হয়। 'এখন কি আড্ডায় যেতে হবে? রজনী কিছু বলেছে?'

সুধীর মাথা নাড়ল।

'বিষ্যুতবার—আজ রজনীর কাজকারবার বন্ধ।'

'আজ ছুটি—তাই বল্।' বলাই সুধীরের কাঁধে হাত রাখে। 'তো এখন যাওয়া হবে কোথায়?'

'নরকে।'

'সে আবার কোথায়!' বলাই বিড় বিড় করে।

'এসো তো—দেখবে।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে সুধীর হাঁটে। প্রস্তাবটা এখনই দেবে কিনা চিন্তা করতে করতে বলাই সুধীরের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটে। মাঠ পার হয়ে দুজন খালের ধারে এসে গেল। ডাইনে খাল রেখে সুধীর বাঁ দিকের জঙ্গলের রাস্তা ধরে। যেন আবার তারা সেই পড়ো গ্যারেজের দিকে যাচ্ছে। না, গ্যারেজ না—গ্যারেজ পিছনে রেখে সুধীরকে আরো এগোতে দেখে বলাই একটু অবাক হয়। রাস্তাটা যেমন সরু তেমনি নোংরা। যেন দুনিয়ার মশা মাছি পোকামাকড় এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। দুধার থেকে গাছের ডালপালা পথের ওপর ঝুঁকে আছে আর সেসব ডালপালা থেকে [illegible] পোকা ও আরও কি সব পোকামাকড় ঝুর ঝুর করে নীচে পড়ছে। বলাইর মাথায় কাঁধে

দুতিনটা শুঁয়ো পোকা একসঙ্গে ঝরে পড়তে সে লাফিয়ে উঠল। একটু রাগ হল তার সুধীরের ওপর, আবার হাসলও। গা থেকে পোকা ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে সে বিড় বিড় করে উঠল: 'হুঁ, এ যে নরকেই টেনে আনলি দেখছি।' সুধীর উত্তর না দিয়ে একটু দাঁড়ায়। কোমরের গামছাটা মাথায় কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে বলাই আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। একটা উগ্র পচা গন্ধে এখানকার বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। 'ব্যাপার কি—কোথায় নিয়ে চললি!' বলাই প্রশ্ন করতে সুধীর বলল, 'কাছেই ডোমপাড়া—পচা চামড়ার গন্ধ ওটা।' বলাই ভেবে পেল না ডোমপাড়ায় সুধীরের আবার কি কাজ! অবশ্য একটু পরেই বলাই বুঝতে পারল সুধীর কিসের লোভে এখানে ছুটে এসেছে।

॥ পঁচিশ ॥

বেড়া দিয়ে জায়গাটা ঘেরাও করা হয়েছে। ভিতরে প্রকাণ্ড একটা চালা। বেড়া নেই, চারদিকটা খোলা। মাঝখানে একটা কাঠের উঁচু টেবিল বসানো, টেবিলের ওপর ছককাটা একটা অয়েলক্লথ বিছানো রয়েছে। প্রত্যেকটা ছকের গায়ে নম্বর দেওয়া। টেবিলের উল্টোদিকে একটা খুঁটির মাথায় বন বন করে একটা চাকা ঘুরছে। চাকাটার গায়েও দাগ কেটে কেটে নম্বর বসানো হয়েছে। টেবিলের এধারে চার-পাঁচজন ঝুঁকে অয়েলক্লথের এক-একটা নম্বর মারা ছকের ওপর টাকা আধুলি সিকি রাখছে আর টেবিলের ওধারে একটা লোক উল্টোদিকের ঘুরন্ত চাকাটা তাক করে বন্দুক ছুঁড়ছে। এই বন্দুক সেই বন্দুক না। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে গুরুম করে আওয়াজ করে না। কেবল ফট ফট শব্দ হয় আর বুলেটের বদলে পাটের কুঁচি পরানো ছোট ছোট আলপিন ছুটে গিয়ে নম্বর মারা চাকার গায়ে বিঁধছে। মাঝে মাঝে চাকা থামিয়ে একটা লোক হেঁড়ে গলায় হাঁকছে: 'দু তিন উনিশ বিশ ডবল ট্রিবল।' আর হাঁকডাক শেষ করে টেবিলের সিকি আধুলি নোট সব একধার থেকে কাছিয়ে একটা টিনের বাক্সে তুলছে।

জুয়ার আড্ডা। সুধীর টেবিল ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলাই পিছনে। সুধীরের দুপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কারো কারো গায়ে দামী বেশভূষা। এক-জনের হাতে ঘড়ি। একজনের কানে সোনার মাকড়ি। বলাই কি ভেবে ঠোঁট টিপে হাসল। সুধীর পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে অয়েল-

ক্লথের ওপর রাখে। আরো কে কে এক-একটা নম্বর ধরে টাকা কড়ি রাখে। যেন ভাগ ভাগ করে পয়সার দোকান সাজানো হয়েছে টেবিলের ওপর। রেডি—ওয়ান টু থ্রি—হেঁড়ে গলায় হাঁক শুরু হল। চাকা ঘুরল। বন্দুক ছুটল।

দু টাকায় চার টাকা পেল সুধীর। পাঁচ টাকার নোটটা আর ভাঙানো হয় না। ওটা হাত দিয়ে ঠেলে আর একটা নম্বরের ওপর সরিয়ে দেয় সে, এবার পাঁচ টাকা দান ধরেছে। সোনার মাকড়ি পরা লোকটা দশ টাকার নোট ধরে ত্রিশ টাকা পেয়েছে। এবার লোকটা চারখানা নোটই আর একটা নম্বরের ওপর বিছিয়ে দেয়। বেকুফ! বলাই মনে মনে হাসে। এবার সব যাবে। মাথায় চাটি মেরে সুধীরকে ওখান থেকে সরিয়ে আনতে পারলে বলাইর ভাল লাগত। অনেক কষ্টের পয়সা তোর—ছেঁড়া জামা গায়ে—হাতে ঘড়ি নেই গলায় হার নেই কানে সোনার মাকড়ী নেই—তোকে এই ঘোড়ারোগে পেল কেন। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল বলাইর। কিন্তু সুধীর শুনবে না। যেমন তখন ডেকে জল থেকে তাকে তুলতে পারে নি। গোঁয়ার! যা মনে ধরবে তাই করবে। বলাই চুপ করে থাকে। সুধীরও চুপ করে আছে। দামী পোশাক পরা লোকগুলি চুপ করে আছে। নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে সব। রেডি—ওয়ান টু থি—চাকা ঘোরে—বন্দুকের ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ হয়।

সুধীরের নোটটা টিনের বাক্সে চলে যায়।

'চলে আয়—' বলাই সুধীরের হাত ধরে টানে।

মাকড়ী পরা লোকটা একতাড়া নোট পকেটে তুলে নেয়। জোড় বরাত শালার! যেন তাই ভেবে সুধীর চোখ বড় করে সেদিকে তাকিয়ে আছে। বলাইর ডাকে সাড়া দেয় না। সুধীর আর একটা নোট পকেট থেকে টেনে বার করছে। বলাই রাগ করে ওখান থেকে সরে আসে। হঠাৎ একটা পরিচিত গন্ধ তার নাকে লাগে। তা তো হবেই। মনে মনে হাসল সে। যেখানে জুয়ার আড্ডা সেখানে চোলাই মদের কারবার থাকতেই হবে। এবার সে চোখ তুলে দেখল চালার পিছনে মানকচুর জঙ্গলের ওধারে আর একটা ছোট ঘর। সেখানেও ভিড় মন্দ না। হৈ-হল্লা করছে সব। বেসুরো গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। এক পা এক পা করে বলাই চোলাইয়ের আড্ডার দিকে এগোয়। বৈঠকখানা বাজারের পুরনো দিনগুলির কথা বলাইর মনে পড়ল। কুমারেশকে মনে পড়ল। ভিতরে ঢুকে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর বসল সে! সুধীরের বিড়ির বাণ্ডিলটা চেয়ে আনতে ভুলে গেছে। এখন চিন্তা করছে সে নিজের নোটটা

ভাঙাবে কিনা। হুঁ, বিড়ি কিনতে। তখন সুধীরের পয়সায় তেলেভাজা খেয়েছে। সারাদিন সুধীরের বিড়ি পুড়েছে। এখন নিজের পয়সা খরচ করতে তার কষ্ট হচ্ছে। তাই হয়। মানুষ একবার যদি পরের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিতে পারে তো বার বারই তার ইচ্ছা হয় আর একজন তাকে চালিয়ে নিক। বলাই নোটটা ভাঙাল না। দু পয়সার বিড়ির জন্য নোট ভাঙাবে না ছাই! মদ সে যায় না। কোনদিন এই নেশা তাকে ছুঁতে পারে নি, অথচ কত লোককে গ্লাসে ঢেলে ঢেলে নিজের হাতে মদ তুলে দিয়ে সে নেশায় বুঁদ করে দিয়েছে। কথাটা ভেবে বলাই অবাক হয়। মদের নেশা নেই তার, বিড়ি সিগারেটের নেশাও যে খুব একটা আছে তা-ও না; হলে ভাল না হলেও চলে যায়। জুয়ার আড্ডায় এসে হুট্‌ করে পকেটে যা আছে বার করে দিয়ে সুধীরের মতন খেলায় মেতে যাওয়ার পাগলামি তার মধ্যে নেই। না, কোন নেশাই নেই বলাইর। মেয়েমানুষের নেশা থাকে মানুষের। সেই নেশাও সে জয় করেছে। মুক্তার মত পাঁচ-সাত গণ্ডা মেয়েকে সে শেয়ালদার ডেরাগুলি থেকে টেনে বার করতে পারত, কিন্তু তা সে করে নি। বস্তুত, কোন নেশা ছাড়া যে সে বেঁচে আছে এটা বড় অদ্ভুত। নিজের ওপর বলাই খুশি।

'কি চাই?'

'একটা বিড়ি দেবেন দাদা!'

'বিড়ি নেই।'

মাতালটা অন্যদিকে সরে গেল। বলাই এদের কাণ্ড দেখে হাসে। যেমন তখন চায়ের দোকানের নষ্ট মেয়েটার জন্য সুধীরের কান্না দেখে তার হাসি পেয়েছিল। যেমন আর এক দিন ব্যারাকপুরের রাস্তার ধারে ছাতিম গাছের নীচে বসে তাকে নিয়ে মুক্তার ঘর বাঁধবার বায়না শুনতে শুনতে সে মনে মনে হেসেছিল। কুমারেশের কথা মনে হলেও তার হাসি পায়। আর একটা মেয়েকে পেতে বৌটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল।

সুধীর এসে ভিতরে ঢোকে। বলাই তার চোখ দেখে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত মুখ দেখে বুঝবার উপায় নেই দুটো নোটই জুয়াড়ির টিনের বাক্সে দিয়ে এসেছে কিনা ছোঁড়া। বলাই উঠে দাঁড়াল। সুধীর এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন বলাই বুঝল। সুধীরের ধারণা বলাই বেশ কিছুটা গিলে নিয়েছে। বলাই কাছে যেতে সুধীর কথা বলল না। দুজন একসঙ্গে মদের দোকান থেকে বেরিয়ে এল। সুধীর আর জুয়ার আড্ডার দিকে

যায় না। কচু জঙ্গল ঘুরে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করে। বলাই হাঁটে। যেন দশ মিনিট ধরে দুজন কেবল হেঁটে চলল। কারো মুখে কথা নেই। রোদ পড়ে এসেছে। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। গরম কমছে না। দুজনই ঘামছে। খালের ধারে এসে তবে সুধীর হাঁটা বন্ধ করল। মাদার আর শ্যাওড়া জঙ্গলে ঘেরা চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়ে সুধীর ধপ্ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। কি ব্যাপার! বলাই ঠোঁট টিপে হাসে। সুধীরের পাশে বসে হাত বাড়িয়ে দেয়। মানে বিড়ি। বুঝতে পেরে সুধীর বিড়ির বাণ্ডিল ও দেশলাই পকেট থেকে বার করে বলাইর হাতে তুলে দেয়। কথা না কয়ে বলাই বিড়ি ধরায়। সুধীর ঘাসের দিকে চোখ রেখে চুপ করে আছে। যেন খুব ভাবছে। মুখের সবটা ধোঁয়া বার করে দিয়ে বলাই আবার ভাল করে সুধীরের মুখ দেখে।

'কি, দুখানাই গেছে বুঝি?'

সুধীর চোখ তুলল। 'হুঁ, সব না গেলে সব আসবে কেন—এর নাম জুয়া।'

বলাইর চোখ বড় হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

'সব আর এল কোথায়, পকেট তো ফাঁক করে এলি!'

এবার সুধীর খুক্ করে হাসল।

'মদ না খেয়েও মাতালের মত বকছ—মুখে তো গন্ধ পাচ্ছি না!'

'সব হেরে এসেও লম্বা কথা বলছিস—পকেটে আর একটা আধলা আছে বলে তো মনে হয় না।' যেন বিশ্বাস হচ্ছে না বলে বলাই বাঁ হাতটা সুধীরের সার্টের পকেটে ঢোকাতে চাইছিল। সুধীর খপ্ করে বলাইর কব্জি চেপে ধরল।

'খবরদার—'

বলাই দমে গেল। হাত গুটিয়ে এনে নরম গলায় বলল, 'কিছু এল নাকি? কটাকা জিতলি?'

সুধীরের চোখ দুটো চকচক করছে। 'যদি বলি এক শ?'

'বলব রজনী শালার দল ছেড়ে দিয়ে একটা চায়ের দোকান দে—হুঁ, ফুট-পাথের দোকান। পিতলের কলসীতে গরম চা থাকবে আর মাটির ভাঁড়ে ঢেলে ঢেলে তা বেচবি। তার পর যখন পুঁজি বাড়বে তখন ঘর ভাড়া নিয়ে—'

বলাইর কথা শেষ হয় না। সুধীর এমনভাবে মাথা নাড়ে যেন বলাইর প্রস্তাবটা সে গ্রাহ্যই করে না।

'যদি বলি পাঁচ শ টাকা জুয়ার আড্ডা থেকে তুলে এনেছি?' সুধীর কটমট

করে বলাইর দিকে তাকায়।

বিশ্বাস করে না বলাই, হাসে, কিন্তু তবু সুধীরকে সৎপরামর্শ দিতে সে ইতস্তত করে না, 'তবে আর কথা কি, আজই বৌবাজার কি ধরমতলায় ঘর ভাড়া নিয়ে রেস্টুরেণ্ট খুলে দে—আমায় কর্মচারী রাখবি—এখন পেটেভাতে থাকব, কারবার চালু হলে মাইনে দিবি।'

হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল ছেলেটা।

'কথা বলছিস না কেন?' বলাই তার হাত ধরে। সুধীর হাত ছাড়িয়ে নেয়।

'মেয়ে ছাড়া এদিনে চায়ের দোকান চলে না।' কথা শেষ করে সুধীর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'তা বটে!' বলাই বেশ বুঝতে পারে সুধীরের এখন আবার কী মনে পড়ে গেছে। 'তা মুক্তীকে আর পাবি কোথা?' একটু থেমে বলাই বলল, 'মাইরি কটাকা জিতলি শুনি না?'

'পাঁচ শ—'

'ধ্যেৎ!'

'তার কম হবে না। এই এতবড় নোটের তাড়া।'

'হাতী! গাঁজা খেয়েছিস?'

'সেই মাকড়ী পরা মেড়োটার পকেট মেরেছি।'

বলাইর মুখে হঠাৎ কথা সরে না। চোখ পাকিয়ে সুধীরকে দেখে। সুধীরও কথা বলে না। যেন যন্ত্রের মত তার ডান হাতটা জামার নীচে চলে যায়। কোমর থেকে এতবড় কাগজের বাণ্ডিলটা বার করে বলাইর চোখের সামনে ঘাসের ওপর রাখে। বলাই হাত বাড়াতে সাহস পায় না। সুধীরের কোমরে গোঁজা চকচকে ছোরাটা এইমাত্র তার চোখে পড়েছে। একটা গরম নিশ্বাস ফেলল সে। কিন্তু সুধীর হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে বলাই বুঝতে পারে না। ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ছোঁড়া আর নোটের তাড়াটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

'এই সুধীর!' বলাই তার মাথায় হাত রাখল।

ছোঁড়া কেবল কাঁদছেই। জলের ধারা গাল বেয়ে ঘাসের ওপর টপ টপ করে ঝরে পড়ছে।

'সুধীর!' বলাই ধমক লাগায়।

'আমি কি আজ একটা দোকান দিতে পারতাম না, ওর হাতে ক্যাশ থাকত,

আমি একটা পয়সা ছুঁতাম না, চাকরের মত সারাদিন খাটতাম, মুকুল-কাফে নাম দিয়ে এতবড় একটা সাইনবোর্ড লিখিয়ে নিতাম, উঃ—'

'তুই মেয়েমানুষ, পুরুষ না।' আজ বলাই সুযোগ পেয়েছে প্রস্তাবটা সুধীরের কানে তোলার। 'ছোঃ, কেবল মুকী মুকী—সংসারে আর মেয়ে নেই নাকি রে বোকা! তাই তো বলছি, দোকান খুলে দে—আমি মেয়ে দেব।'

সুধীর ফ্যাল ফ্যাল করে বলাইর মুখ দেখে। আর কাঁদছে না।

'বুঝলি, মলম না পড়লে ঘা শুকোয় না। তোর বুকে এতবড় একটা ঘা করে দিয়ে গেছে নষ্ট মেয়েটা। আর সেই পচা ঘা নিয়ে তুই কুকুরের মত ধুঁকছিস!'

সুধীর একভাবে তাকিয়ে বলাইর কথা শোনে, চোখের পলক পড়ে না। বলাই মিষ্টি করে হাসে।

'তোর মুকীর মতন ধাড়ী সেয়ানা মেয়ে না, পাখির মতন এইটুকুন—টুকটুকে নরম মিঠা মেয়ে—দেখলে চোখ জুড়োবে, বুক ঠাণ্ডা হবে।'

'তুমি বলছ বলাইদা, ওই মেয়েকে পেলে আমি মুকীর কথা ভুলতে পারব?'

'এক শ বার!' বলাই সুধীরের বুকের ওপর হাত রাখল, নোটের তাড়া ছুঁল না। 'একবার দেখলে চোখ আর ফেরাতে পারবি না।'

সুধীর এতবড় একটা ঢোক গিলল, হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছল।

'কোথায় আছে?'

'গাঁয়ে।'

'তোমার কুটুম নাকি?'

বলাই ঘাড় কাত করল।

'তা না হলে আর বলব কেন, আমার জানাশোনা ঘরের মেয়ে।'

সুধীর শোয়া ছেড়ে উঠে বসল।

'চায়ের দোকানে এসে সুবিধা করতে পারবে কি?'

'তালিম দিয়ে নিবি!' বলাই আবার হাসল।

যেন সুধীর কি ভাবে; রোদটা একেবারে মজে গেছে; পাখির কিচির-মিচির শুরু হয়েছে। বলাই আর একটা বিড়ি ধরায়। সুধীর ভাবছেই।

'হুঁ।' যেন ভেবে এক সময় সুধীর মন স্থির করল। 'আগে আমি ওই মেয়েকে বিয়ে করব। তার পর দেখা যাবে দোকানে রাখলে সুবিধে হবে কি ঘরের বৌ ঘরে থাকবে, কেমন?'

'তাই দেখবি।' বলাই খুশি হয়। 'ওই মেয়ে ছাড়া তোর বুকের ঘা

কেউ শুকোতে পারবে না।' জোরে টান দিয়ে বলাই বিড়ির টুকরোটা ফেলে দেয়। 'বললাম তোকে, আমার কিছু স্বার্থ নেই। মোটা টাকা কামিয়েছিস, এখন একটা দোকান-টোকান খুলে বসে যা—আমিও সঙ্গে থাকি, রজনীর দলে থাকলে বন্দুকের গুলিতে একদিন মাথা উড়ে যাবে।'

'না, আর ওই পথে নেই আমরা—কোন্‌দিকে তোমার কুটুমবাড়ি, চল এইবেলা, রওনা হওয়া যাক বলাইদা।' নোটের তাড়াটা কোমরে গুঁজে সুধীর উঠে দাঁড়াল।

ঝোপের ওধারে মানুষের গলার স্বর শোনা যায়। যেন দুজন কথা বলছে। বলাই ও সুধীর আবার মাথা গুঁজে ঘাসের ওপর চেপে বসে। কে জানে সেই মাকড়ি পরা লোকটা তার সঙ্গীকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকে চলে এল কি না। বলাই চিন্তা করে। 'শালা কি টের পেয়েছিল তুই পকেট মেরেছিস ?' সুধীরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলাই হিস হিস করে কথা বলে।

দাঁত বার করে সুধীর হাসে। 'টের পেলে হাত-পা নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম বুঝি ?' ফিসফিসে গলায় সুধীর জবাব দেয়। 'ওই বিদ্যাটা ভাল করে রপ্ত করেছিলাম বলাইদা।'

'তবে বোধ করি পারঘাটায় যাচ্ছে লোক দুটো—পাটকলের কুলি হবে।' বলাইর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে দক্ষিণদুয়ারীর জুটমিলের বাঁশী বেজে ওঠে। বাঁশীর আওয়াজ থামতে বলাই আবার বলল, 'নোটগুলো গুণে নিলি না ?'

'দরকার কি !' সুধীর একদলা থুথু ফেলল। 'ওই কাগজের বাণ্ডিল দেখে আমরা বুঝতে পারি পাঁচ শ কি হাজার আছে। সব দশ টাকার নোট।'

যেন হঠাৎ মুখ কালো করে ফেলল বলাই।

'তুই আমায় বিশ্বাস করিস না, কি জানি গুণতে গেলে যদি আমি থাবা মেরে দু-চার খানা তুলে নিই—কেমন ?'

'থাবা মেরে তুলে নেবে কি—আমার কোমরে আর একটা কি গোঁজা আছে জান তো।' সুধীর অন্যদিকে ঘাড় ফেরায়। কটমট করে বলাই ছেলেটার মুখ দেখে। সুধীর এদিকে ঘাড় ফেরাতে অবশ্য বলাইর চেহারা বদলে গেল। হাসি হাসি মুখ।

'বুঝলি, বিশ্বাস রাখবি, বিশ্বাসে কেষ্ট মেলে।'

সুধীরও হাসল।

'কেষ্ট পেয়ে আমার দরকার নেই—ওই যে বললে পাখির মতন টুকটুকে মেয়ে

—ওই আমাকে পাইয়ে দাও দিকিনি!'

'নে, এইবেলা উঠে পড় তা হলে—লোক দুটো চলে গেছে মনে হয়।'

জঙ্গল থেকে দুজন বেরিয়ে এল। অন্ধকার হয়ে গেছে।

'ওদিকে কেন?' সুধীর থমকে দাঁড়াল। 'উল্টাডাঙ্গার রাস্তা ওটা না?'

'না-না, ট্রেন ধরব না আমরা—মাঠের ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে চলে যাব, তারপর ব্যারাকপুরের রাস্তা ধরব। বলাই বাঁ দিকের সরু পথে পা বাড়ায়। 'রজনীর দলের লোক উল্টাডাঙ্গা স্টেশনে ঘোরাফেরা করতে পারে—ভাববে তোকে দল থেকে খসিয়ে নিয়ে আমি পালাচ্ছি।'

'কি যেন বললে গাঁয়ের নাম?' সুধীর আর আপত্তি না করে বলাইর সঙ্গে হাঁটে।

'শ্রীপুর—রাধাবল্লভপুর।' বলাই এক দলা থুথু ফেলল। মুখ নীচু করে হাঁটে সে। তাই তার চোখের দুষ্টু হাসিটা সুধীরের চোখে পড়ে না।

'রজনী শালা চশমখোর।' সুধীর বিড়বিড় করে বলে।

বলাই সে কথায় সায় না দিয়ে অন্য কথা বলে।

'সোদপুরের বাজারে ভাতের হোটেল আছে। সেখানে আমরা ভাত খাব, ভাত খেয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরব, তার পর আবার অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।'

'তোমার ভাতের পয়সা আমি দেব।' বলাইর কাঁধে হাত রেখে সুধীর হাঁটে। 'তখনো তো তেলেভাজার পয়সা আমি দিয়েছি—দিই নি?'

বলাই কথা বলে না, সুধীরের হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে জোরে পা চালায়। সুধীরও লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে।

॥ ছাব্বিশ ॥

সূর্য ওঠার আগে দামিনী হাউমাউ চিৎকার করে বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে দিল। দামিনীর চিৎকার শুনে সাবি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, পিসি বেরিয়ে এল, মুক্তা বেরিয়ে এল। উঠোনের সজনে গাছের ডালে রতির শরীরটা ঝুলছে। মতি? মতি তখন ঘুমোচ্ছিল। সারারাত তার ঘুম হয় নি। ভোরের দিকে বুঝি উত্তরের ভিটের ঘরে ঢুকে সে শুয়ে পড়েছিল। সাবি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়ে মতিকে ডেকে তুলল। বাইরে এসে মতি যা দেখার দেখল। কাঁদল না।

স্থির অবাক চোখে সজনে গাছটার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে পরে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। 'তোমার মনে এই ছিল দাদা!' যেন মনে মনে বলল সে, তারপর কটমট করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরে মুক্তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। মুক্তা মাটির দিকে চোখ রেখে চুপ করে আছে। তার পা দুটো কাঁপছে। মতির নাকের বাঁশী ফুলে ফুলে উঠছে। চোখদুটো রক্তজবা হয়ে আছে। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে। সাবি বুঝল। সাবি একটা কিছু অনুমান করতে পারল। মতির দু হাত চেপে ধরে সাবি কেঁদে ফেলল। 'মামা, যা হবার হয়েছে, ওকে কিছু বলো না। বাড়ির ঝি—তার ওপর বাস্তুহারা। মারধর করতে গেলে কেলেঙ্কারি হবে, লোক-জানাজানি হবে, তার চেয়ে—।' সাবি চুপ করে গেল, বাড়িতে লোক ঢুকছে। যোগী গায়েন আর সাধন নন্দী। ওরা কি লাঙল নিতে এল? তা নয়। যেন হাওয়ায় ওদের খবর দিয়েছে মনোহর কর্মকারের তেজী একরোখা জোয়ান ছেলে রতি কর্মকার গলায় দড়ি দিয়েছে। তাই তারা দেখতে এসেছে, জানতে এসেছে। অন্ধ মনোহর ঘরের পৈঠায় বসে মেয়েমানুষের মত বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছিল। 'চোখে দেখতে পায় না—ছেলের এই অবস্থা দেখতে পেলে বুড়োর কান্নায় আকাশ ফাটত।' যোগী বলছিল সাধনকে। সাবির হাত ছাড়িয়ে মতি নিজের কপাল মুছল। ঠাণ্ডা ভোরের হাওয়ায় দাঁড়িয়েও সে একটু একটু ঘামছে। মুক্তা এতক্ষণ পর মুখ তুলল। এই প্রথম মতির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। মতি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মুক্তা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

না, কেবল যোগী সাধন কেন, যেন হাওয়ায় গোটা গাঁয়ের মানুষকে রতির গলায় দড়ি দিয়ে মরার খবরটা জানিয়ে দিল। তাই দেখা গেল দলে দলে কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসছে মনোহর কর্মকারের বাড়ির দিকে। মানুষে মানুষে কর্মকারদের উঠোন ভরে যায়, দোকানের সামনের মাঠ ভরে যায়। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, সকলের চোখে এক বিস্ময়: 'এমনটা করল কেন রতি—রতির মনে কী অশান্তি ছিল!'

শহর-বন্দর জায়গা হলে তখনি দারোগা-পুলিস ছুটে আসত। কিন্তু পাড়াগাঁ। থানা দূরে। তা হলেও সনাতন চৌকিদার তখনই চলে গেল শ্রীপুরের হাটের দিকে। সেখান থেকে বাস ধরে সে চণ্ডিতলার থানায় খবর দেবে।

তা থানায় খবর পাঠাতে দেরি হলেও থানার দারোগা কনেস্টবলের গাঁয়ে

পৌঁছতে কিন্তু তত সময় লাগল না। থানার গাড়ি নিয়ে দারোগাবাবু আর তিনজন কনেস্টবল শ্রীপুরের হাটের বড় সড়ক ধরে রাধাবল্লভপুর যখন এসে পৌঁছলেন তখন সূর্য পূব আকাশের চৌহদ্দি ডিঙিয়ে সবে মাথার ওপর উঠতে আরম্ভ করেছে। তা হলেও এর মধ্যেই রোদের তেজ বেড়ে গেছে, বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। দারোগাবাবু ঘামছিলেন। তাঁর খাঁকি জামার পিঠের দিকটা ভিজে কালোমতন হয়ে গেছে। চোখে ভয় নিয়ে কৌতূহল নিয়ে গাঁয়ের মানুষ দারোগাবাবুকে দেখছিল। সজনে গাছের ডালে রতির ঝুলন্ত শরীরটার দিকে এক নজর তাকিয়ে দারোগাবাবু মতিকে আড়ালে ডেকে কি যেন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আর পেন্সিল দিয়ে খাতায় কি টুকে নিলেন। তারপর মতিকে সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু বাড়ির ভিতর ঢুকে অন্ধ মনোহরের সামনে দাঁড়ালেন। দারোগার কোন প্রশ্নের জবাব মনোহরের কাছে পাওয়া গেল না। ছোট ছেলের মতন বুড়ো বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল শুধু। বুড়ী পিসিকে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করা হল। সাবিকে জিজ্ঞাসা করা হল। আর কে আছে বাড়িতে? না, আর কেউ নেই।

আছে একটা দাসী, অনেকদিনের চাকরানী। বোবা। দারোগাবাবু দামিনীকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে পরে বিরক্ত হয়ে খাতাটা পকেটে পুরলেন। কেননা দামিনী তখনও হাউ হাউ করে কেঁদে চলেছে। তার গলার বিকৃত দুর্বোধ্য স্বর বলে দিল সে কথা বলতে পারে না।

মুক্তার কথা মতি চেপে গেল। কেননা মুক্তা তখন উঠোনে ছিল না। মতির সঙ্গে চোখাচোখি হবার পর সেই যে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সে উঠোন ছেড়ে গুদামঘরে গিয়ে ঢুকেছে আর বেরোয় নি।

বস্তুত দারোগা কনেস্টবল বাড়িতে ঢুকেছে কথাটা তার কানে ঢুকেছিল। ছ মাস শিয়ালদায় কাটিয়ে এসেছে মুক্তা। পুলিস কি বস্তু তার ভাল জানা আছে। একটা পকেটমার ধরা পড়লে স্টেশনের পুলিস কি সব কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তুলেছে মুক্তা চোখের ওপর দেখেছে। কেবল কি পকেটমারার ঘটনা, দিনরাত কত কি সব ঘটছে সেখানে আর পুলিস সার্জেন্ট ছুটে এসে দোষীকে যদি না ধরতে পারল তো যে দোষ করল না, হয়তো ধারে কাছে ছিল, তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল—নিয়ে চলল থানায়। কেউ একবেলা থেকে ফিরে আসে, কেউ তিনদিন পর ফেরে—কেউ হয়তো আর ফিরলই না। মাস যায়—হাজতে পচতে থাকে। আর এখন এখানে? দুর্ভাবনায় মুক্তার মুখ নীল হয়ে গেল। এখানে

দোষী হাতের কাছে রয়েছে। হুঁ, ওই বাস্তুহারা মেয়েটার জন্য দাদা এমনটা করল। মতি যে দারোগাকে বলে দেয় নি তার ঠিক কি? কান খাড়া করে চুপচাপ স্থির হয়ে বসে রইল মুক্তা। হয়তো এখনি দরজায় দারোগার ভারি জুতোর শব্দ হবে। কে আছ ঘরে? বেরিয়ে এসো। এই তো, এই তো আসামী। শিয়ালদার মেয়ে? তাই বটে। এসব মেয়েকে বাড়িতে ঢুকিয়েছ কেন? দারোগা মতিকে বলবে। ভিটে মাটি ছেড়ে এসে এরা এখন জলে ভাসছে। দু মুঠো ভাতের জন্য একটা চালের নীচে মাথা গুঁজবার জন্য এরা কত কি করছে তোমরা কি জান না? চল, শিয়ালদা স্টেশনে চল দেখবে। মতির সঙ্গে কথা শেষ করে দারোগা কনেস্টবল দুজনকে বলছে, নাও হে, আসামীকে এবার গাড়িতে তুলে নাও—

এসব ভাবছিল মুক্তা, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় তার মনে হয় বাড়িটা যেন একেবারে নীরব হয়ে গেছে। শব্দের মধ্যে কেবল শোনা যাচ্ছিল বুড়ো বাপের বিনিয়ে-বিনিয়ে কান্না আর শালিকের কিচিরমিচির। না, আর একটা শব্দ শোনা গেল। যেন রতির জন্য বাড়ির কুকুরটা শোক করছে। কাঁইকুঁই করে রান্না দোকানঘরের ওধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কিন্তু আর কোন শব্দ তো কানে আসছে না। তবে কি—

দরজা নড়ে উঠল। মুক্তা চোখ তুলল। সাবি। কেঁদে কেঁদে সাবির চোখ দুটো ফুলে গেছে, লাল হয়ে গেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটা মুক্তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'বড়মামাকে নিয়ে গেল পুলিস।'

শুনে মুক্তা চমকে উঠল। তারপর বুঝল রতির লাস পুলিস নিয়ে গেছে। 'কুথায় নিয়া যাবে গো?' কাতর ফিসফিসে স্বরে মুক্তা প্রশ্ন করল। গলা দিয়ে তার আওয়াজ বোরোয় না এমন। ভয়ে মেয়েটা এরকম করছে, সাবি বুঝতে পারল।

'রাণাঘাট নিয়ে যাবে। ছোটমামা সঙ্গে গেছে।' সাবি মাটিতে বসে পড়ল। 'রাণাঘাট ছাড়া এ তল্লাটে আর লাসকাটা ঘর নেই যে।';

মুক্তা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। তার মনে পড়ল শিয়ালদার কুসুমের বাবাকে। রাত্রে স্টেশনের পায়খানায় ঢুকে নিত্যানন্দ মোদক গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। পরদিন সকালে পুলিস এসে নিত্যানন্দর লাস গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। লাসকাটা ঘরে কাটাকুটি করে পরে আবার পুলিস নিত্যানন্দর ধড়টা নাকি

নিত্যানন্দর দুই ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। নিমতলার শ্মশানে বাপকে পুড়িয়ে শশী আর শশীর ছোট ভাই সেই রাত দুটোয় শিয়ালদার ডেরায় ফেরে মুক্তার মনে আছে। তা নিত্যানন্দ বাস্তুহারা মানুষ। কষ্ট সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। কিন্তু মতি?

একটা বড় ঢোক গিলল মুক্তা।

'শেষ কামডা রাণাঘাটে সেইরে আসবে বুঝি ছোট কত্তা?' মুক্তা আস্তে শুধায়।

'মনে হয়। এখানে লাস ফিরিয়ে আনার অসুবিধা আছে। কত দূরের পথ। ছোট মামার সঙ্গে যোগী সাধন আর যেন গাঁয়ের কে কে গেল।' সাবি এত বড় একটা ঘটনার পর কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছে। কাল রাত্রে কতক্ষণ ছিল মুক্তা মামাদের সঙ্গে দোকানঘরে সাবি বলতে পারে না, ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। লাল ফোলা চোখদুটো স্থিরভাবে মেলে ধরে এখন ও বাস্তুহারা মেয়েটাকে দেখছে। যেন কি খুঁজছে ওই মুখের মধ্যে।

আর মুক্তা চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, রতিকে পুড়িয়ে মতি কখন ঘরে ফিরবে। এই ভয়? এই জন্য কি রতির 'শেষ কাজ' কোথায় সারা হবে ও জানতে চাইছে। না, আর একটা ভয় নতুন করে মুক্তার বুকের ভিতর ডেলা পাকাতে আরম্ভ করেছে। কেবল মতির ঘরে ফিরে মুক্তাকে মার-ধর করার ভয় না। লাসকাটা ঘরে পুলিস গলায় দড়ি দিয়ে মরা কি বিষ খেয়ে মরা মানুষটাকে নিয়ে যায় কেন? সেখানে তারা লাসটাকে কেটে চিরে পরখ করে মানুষটা এমন করে 'পরাণটা' দিল কেন? যেন শিয়ালদায় কার মুখে শুনেছিল মুক্তা। মানুষটার মনের কথা বুকের মধ্যে, তার কলজের মধ্যে লেখা থাকে—কোন্ দুঃখে সে গলায় দড়ি দিল, বিষ খেল!

তবে কি রতির বুকের মধ্যে, কলজের মধ্যে সেরকম কিছু লেখা থাকবে? রতির গলায় দড়ি দেওয়ার সঙ্গে মুক্তা জড়িয়ে আছে? মতি জড়িয়ে আছে? মতির কথা, মুক্তার কথা জানতে পুলিসের দেরি হবে না। রতির লাস পরখ করে পরে আবার তারা এবাড়ি ছুটে আসবে। কই, বাস্তুহারা মেয়েটা গেল কোথায়? ওই মেয়েটা রতি কর্মকারের সঙ্গে পীরিত করতে গেচে, তাই দেখে ছোট ভাই রাগ করে, আর সেই দুঃখে তো রতি সজনে গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগায়। হুঁ, মেয়েটার দোষ, মেয়েটাই দোষী। নষ্ট মেয়েকে সায়েস্তা করতে হয়। যেন দারোগার মোটা গলার আওয়াজটা এখনই

দরজার বাইরে শুনতে পায় মুক্তা, আর ভয়ে ও শিউরে ওঠে।

'এমন করছ কেন ভাই?' সাবি শুধায়। একটা হাত মেয়েটার হাঁটুর ওপর রাখে। 'এমন কাঁপছ কেন?'

'কেমন ভর ভর লাগছে।' মুক্তার ঠোঁট দুটোও কাঁপে।

'কিচ্ছু ভয় নেই, তোমার কিচ্ছু হবে না।' সাবি সান্ত্বনা দেয়। 'তোমার সেই মানুষ কাল পরশু চলে আসবে না? এলে চলে যাও।'

হায় রে মানুষ! সেই মানুষের জন্য না আজ মুক্তার এত বিপদ! না, বলাই আর আসবে না। মুক্তার মন বলছে। কদিন থেকে সে বুঝতে পারছে বলাইয়ের মনে অন্য কথা, অন্য ইচ্ছা। কে জানে ওই শিয়ালদার আর একটা মেয়ের সঙ্গে না লোকটা—মুক্তার বয়সের আরো চার-ছ গণ্ডা মেয়ে স্টেশনে ডেরা বেঁধে আছে। বাসনা, সুধা, রাণী, চপলা, কামদা, লক্ষ্মী। সবগুলো মুখ মুক্তার মনে পড়ছে। বলাই চাকরি খুঁজছে না ছাই করছে! সেই বেশ, সেই বাদাম-চানা-চুরের ঠোঙাভর্তি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে শিয়ালদার রাস্তায়, স্টেশনে বাস্তুহারা মেয়েগুলির ডেরার সামনে দিয়ে ঘুরছে বাবরিচুল লোকটা। মুক্তার জন্য তার একটুও ভাবনা নেই। ভাবতে সে চায় না। ঝোঁকের মাথায় মুক্তাকে সেখান থেকে টেনে বার করে এখন সরে গেছে। মাথায় বোঝা নিতে বলাই রাজী না। মেয়ে নিয়ে ঘর বাঁধবার, সংসার পাতবার মানুষ অন্যরকম। তার জাত আলাদা। যেন ক্রমেই কথাটা বেশি বুঝতে পারছে মুক্তা। আ, কতবড় ভুল করল সে শিয়ালদা থেকে বেরিয়ে এসে। আর তো সেখানে তার ফিরে যাওয়ার মুখ নেই। এখন গাছতলা ছাড়া তার জায়গা কোথায়?

বড় বড় জলের ফোঁটা মুক্তার গাল বেয়ে চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছিল। সাবির হাতের ওপর দু-তিনটা ফোঁটা পড়ল।

'কেঁদো না ভাই। এমন করে কাঁদে না। ছোটমামা লোক ভাল। আর দু দিন তুমি এবাড়ি থাকতে পারবে। আমি বলে দেব মামাকে। তারপর সেই লোক এলে চলে যাও।' সাবি প্রবোধ দিল, তারপর একসময় বুড়ী পিসির ডাক শুনে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

একটা ভয়ঙ্কর দুপুর পৃথিবীর ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। যেন সব মরে রইল। শালিকগুলোর আর শব্দ ছিল না, কুকুরটা কাঁদছিল না; কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে বুড়ো মনোহর কখন জানি চুপ করে গেছে। মেঝের ওপর তেমনি হাঁটু তুলে কান খাড়া রেখে মুক্তা বসে রইল। ঝাপের ফাঁক দিয়ে গরম বাতাস ভিতরে ঢুকল, উঠোনের কিছু ধুলো। এর মধ্যে মুক্তা অনেকবার ঘামল, আঁচল দিয়ে ঘাম মুছল, কাঁদল, হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছল, ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য ক্লান্তি কোনরকম বোধ যেন ছিল না—যেন একটুকরো কাঠ হয়ে গেছে, একখণ্ড লোহা হয়ে গেছে ও। এ বাড়িতে আজ আর উনুন ধরল না। রান্নাঘরের ওধারে কাঁঠালতলায় চুপচাপ বসে থেকে দামিনী কখন যেন আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল, তারপর ভুঁসভাঁস নাক ডাকছিল ওর। বড় ঘরে মনোহর বসে থেকে ঝিমোচ্ছিল আর মাথাটা বার বার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তক্তাপোশের সঙ্গে ঠকাস ঠকাস করে বাড়ি খাচ্ছিল, অথবা এমনও হতে পারে শব্দ করে আর না কেঁদে বুড়ো চুপ থেকে ছেলের শোকে মাথা ঠুকছিল। বুড়ী পিসিও যেন একটা মাটির তাল হয়ে মেঝের ওপর বসে রইল। পায়ের কাছে সাবি। সাবি মেঝের ওপর শুয়ে ছিল। কপালে নাকে দুটো মাছি বার বার এসে উড়ে বসছিল আর আঁচল নেড়ে সাবি মাঝে মাঝে মাছি তাড়াতে চেষ্টা করছিল। ক্রমে বিকেল হয়। উঠোনে ছায়া নামে। তখন আবার শালিক চড়ুইগুলি কিচিরমিচির করে ওঠে। কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বিশ্রী একটা আওয়াজ বের করে পরমুহূর্তে থেমে যায়। তারপর উঠোনের ছায়া মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকার নামে। সন্ধ্যা হয়ে গেল না? রাত হল না? যেন তখন মুক্তার চমক ভাঙে, শরীর নড়ে ওঠে, শরীরে আবার রক্তের চলাচল আরম্ভ হয়েছে টের পায় ও। তার হৃদপিণ্ড দুব্ দুব্ করছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কোণার দিকে বসে দামিনী কুটমুট শব্দ করে কি খাচ্ছে। কখন ও ঘরে ঢুকল মুক্তা টের পায় নি। অন্ধকারে বসে কি খায় বোবা? সারাদিন উপোস থেকে ওর বুঝি খুব খিদে পেয়েছে। সত্যি ক্ষুধা পেয়েছিল দামিনীর। আঁচলের খুঁটে চাল নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল।

মুক্তা একটা ঘন নিশ্বাস ফেলল। তার পর নিশ্বাস বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে রইল। অপেক্ষা করছিল সে কতক্ষণে চাল চিবোনো শেষ করে দামিনী ঢকঢক

করে জল গিলে পেট ঠাণ্ডা করে শুয়ে পড়বে। আর শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ বুজে আসবে, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে নাক ডাকবে। সেই ফাঁকে মুক্তা ঘর থেকে বেরোতে পারবে। আজ কি চাঁদ উঠবে? কাল চাঁদ উঠেছিল কিনা মনে নেই ওর। কাল অনেক রাতে দোকানঘরের বেড়ার সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে মুক্তা যখন মতির হা-হা হি-হি হাসি শুনছিল, তখন একটা তামাটে রঙের ভাঙা চাঁদ লাউমাচার পিছনে থেকে যে ঢুলু ঢুলু চোখে মুক্তাকে দেখছিল, মুক্তা একেবারে ভুলে রইল। আজ চাঁদ উঠবে না ভাবছিল ও। 'আইজ আমার চান্দের দরকার নাই। অমাবইস্যার আন্ধারে জগত কালি অইয়া যাউক। আমি কালা মুখ লইয়্যা এইখান থন সইরা যাই। আ, আবাগী যেইদিকে চায় সাগর শুকাইয়া যায়।' যেন মুক্তার এখন ইচ্ছা করছিল যদি কোনরকমে ও শিয়ালদায় গিয়ে পৌছতে পারে। রাস্তাঘাট জানা নেই, কিন্তু তা হলেও তো মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে ও হাঁটাপথের সন্ধান পাবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার আবার মনে হয় শিয়ালদায় গিয়ে সে কী করবে! খুড়ি তাকে দেখলে বঁটি নিয়ে তেড়ে আসবে। একটা মানুষও মুক্তার পক্ষে থাকবে না। 'নষ্ট মাইয়্যা। ইস্টিশনের ডেরা ছাইড়া পলাইয়া গেছিল সুখের পায়রা। সুখ না পাইয়্যা ফিরা আইছে, মুখে গোবর লেইপা দেও, থুথু দেও।' বাস্তহারা মানুষগুলির ক্রুদ্ধ গলার সমবেত গর্জন মুক্তা এখান থেকে শুনতে পায়, এখনই শুনতে পাচ্ছে। ভয়ে তার বুকের ভিতরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। না, তা হয় না, আর সেখানে ফিরে যাবার উপায় নেই। অনন্ত শীলের মেয়ে বাসন্তি যেদিন পালিয়ে গেল, সেদিন এবং তারপর থেকে রোজ স্টেশনের মানুষগুলি কী সব বলাবলি করছিল মুক্তা কি ভুলে গেছে?

তবে উপায়? মুক্তা আবার কাঁদতে লাগল।

উপায় আছে। কর্মকারদের বাড়ির পুব দিকের পুকুর মজে গেছে। কিন্তু উত্তরের ডোবায় এখনও অনেক জল। কলমি জঙ্গলে ঢাকা কালো ঠাণ্ডা শিরশিরে জলের চেহারাটা মুক্তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে বুকের ভিতর কেমন ধ্বক্ করে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুক দমে যায়। কিছু হবে না জলে নেমে। সাঁতার জানে সে। সাঁতার জানা লোক জলে ঝাঁপ দিয়েও ডুবে যেতে পারে না।

তবে? বিষণ্ণ ক্লান্ত চোখদুটো তুলে ও কড়িকাঠের দিকে তাকায়। পাটের দড়িদড়া ঝুলছে অনেক। বস্তা বাঁধতে, গরু ছাগল বাঁধতে দড়ির দরকার, জালের জন্য দড়ির দরকার। এ বাড়িতে দড়ি-সুতোর অভাব কি।

কিন্তু কড়িকাঠের দিকে চোখ পড়া মাত্র সে চোখ নামিয়ে নেয়। ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। শিয়ালদার নিত্যানন্দ মোদকের ফাঁস-আটকানো চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। জিভটা একটু বেরিয়ে আছে। চোখের মণিদুটো ওপরের দিকে উঠে গিয়ে সাদা অংশটা বেরিয়ে পড়েছে। কেবল কি নিত্যানন্দ মোদক? রতির চেহারাটাও মুক্তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সজনের ডালে মানুষটা ঝুলছে। যেন সাঁড়াশি দিয়ে ঠোঁটদুটো ফাঁক করে জিভটা কে টেনে বার করে দিয়েছিল। চোখের মণি দেখা যায় না, সাদা অংশ দেখা যায় না—কেবল দুটো রক্তের পিণ্ড দুই ভুরুর তলায় চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আছে। ভয়ে মুক্তা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। 'না, আমি পারুম না—গলায় দড়ি দিয়া মরণ বড় কষ্টের—'

তবে এমন কি উপায় আছে, যাতে যন্ত্রণা নেই, কষ্ট নেই—খাঁচা ছেড়ে পাখির উড়ে যাওয়ার মতন টুক করে মুক্তার প্রাণটা এই শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে! ভেবে মুক্তা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাতের কাছে বিষ নেই। বিষ খেয়ে মরার যন্ত্রণা কম। কম কি? জানে না সে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা এসে তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। কেবল গলায় দড়ি দিয়ে মরার লাস না, বিষের মরার লাসও কাটাচেরা করে দেখে ওরা। কথাটা মুক্তা প্রথম দিনই শুনেছিল। ইস্! মুক্তা শিউরে উঠল। মুক্তার শরীরটায় ছুরি বসিয়ে এখানে ওখানে চিরবে। বঁটি দিয়ে লাউ কুমড়া যেভাবে কাটে? না কি মাছের মতন পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করবে। কলজেটা বার করে আনবে ওরা? মুক্তার কলজের ওপর কি লেখা থাকবে, কেন ও বিষ খেল? হুঁ, পুরুষমানুষের নাম লেখা আছে। কার নাম, কে সেই পুরুষ? বাস্তুহারা মেয়ের দুঃখের সঙ্গে পুরুষ জড়িয়ে আছে। অবাক কাণ্ড! লাসকাটা ঘরের মানুষগুলি হাসছে। একজন না, তিন-তিনটে পুরুষের নাম লেখা। কে ওরা? বলাই, রতি আর মতি। ছি ছি ছি! ভাল হয়েছে। মেয়েটা বিষ খেয়ে মরে সংসার জুড়িয়ে গেছে। না হলে আগুন জলত। সেই আগুনে আর দু-একটা জোয়ান পুড়ে মরত। এই মেয়ে মেয়ে না। ডাইনী, রাক্ষসী। জগৎ-সংসার জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে এদের জন্ম। শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। শাস্তি আর দেব কি। বিষ খেয়ে মরে তো এখানে এল। তা হলেও শাস্তি দিতে হবে। কলজেটা কুচিকুচি করে কেটে ফেল। চোখের মণিদুটো উপড়ে ফেলে ছুরির বাঁট দিয়ে থেঁতলে দাও। বেঁচে থাকতে এই চোখ দিয়ে মেয়ে বলাইয়ের দিকে, রতির দিকে, মতির দিকে তাকিয়ে ওদের

মাথা গরম করে তুলেছিল।

মধুসূদন! মাটিতে শুয়ে পড়ে মুক্তা কাঁদতে লাগল। না, বিষ খেয়ে তার মরা হবে না। আ, যদি তার একটা শক্ত অসুখ করত, কলেরা বসন্ত যক্ষ্মা। ব্যারামে ভুগে মরলে এই শরীর পুড়িয়ে ফেলা হবে, লাসকাটা-ঘরে চালান যাবে না। কিন্তু ব্যারাম হলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মরে যায় না। দুঘণ্টা থাকে, চার ঘণ্টা থাকে, পাঁচ দিন দশ দিন মাস বছর পর্যন্ত বেঁচে থেকে ভোগে। তার খুড়ি আজ দেড় বছর যক্ষ্মায় ভুগছে। তবে? অসুখে পড়লে সে কোথায় থাকবে? গাছতলায়? রাস্তার ধারে? অসুখ হয়ে গাছতলায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকলেও যুবতী মেয়ের নিস্তার নেই। পচা ফলের গন্ধে মাছি যেমন ভিড় করে আসে তেমনি পচা শরীরের লোভেও কিছু কিছু পুরুষ—

চমকে উঠল মুক্তা। দরজা নড়ে উঠল।

'কে, সাবি?'

'আমি।'

মতি এসে ভিতরে ঢুকল। অন্ধকার। না হলে বোঝা যেত রক্ত সরে গিয়ে মুক্তার মুখটা মোমের মতন সাদা হয়ে গেছে। মতি কাছে আসে।

'তুমি কি এখনো এখানে বসে আছ?'

মুক্তা চুপ। কাঁপছে। যেন শীত করছে তার।

'বেরিয়ে যাও।' নীরস গলায় মতি হুকুম করল। 'হুঁ, এখুনি বেরিয়ে যাও।'

মুক্তা উঠে দাঁড়ায়।

'আশ্চর্য!' মতি বলতে ছাড়ল না, 'ভাবছিলাম দাদাকে পুড়িয়ে বাড়ি ফিরে দেখব তুমি চলে গেছ। নেই। এসে দেখি ঠিক জায়গা মতন শুয়ে আছ —তোমার লজ্জা-সরম নেই, কেমন?'

মুক্তা দরজার কাছে সরে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে ও বুঝতে পারে বাইরেটা চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে মুক্তা উঠোনে নামল।

'তুমি কোথায় চললে এখন?' চাপা গলায় মতি পিছন থেকে হেঁকে উঠল।

ঘাড় ফেরাল মুক্তা। জ্যোৎস্নায় কালো চোখদুটো চকচক করছে ওর।

'কোথায় যাচ্ছ শুনি?' মতি ফের প্রশ্ন করল। গলার স্বরটা যেন আরো তেতো হয়ে গেছে তার। মুখ নামিয়ে মুক্তা দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলে না।

'শোন, শুনে যাও।' মতি ডাকল। এক পা এক পা করে মুক্তা চৌকাঠের

কাছে ফিরে এল। 'দুপুর রাতে কোথায় চললে শুনি?' মেয়েটার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি লাগায় মতি। মুক্তা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদে। 'কুথায় জানি না, এইখানে তো আর আমার থাকন অইব না।'

'এইখানেই থাকবে তুমি'; তেমনি চাপা গলায় গর্জন করে উঠল মতি। 'এ বাড়ি ছেড়ে তোমার যাওয়া হবে না।'

চোখের আঁচল সরিয়ে মুক্তা রতির ভাইয়ের মুখ দেখে। যেন বুঝতে পারছে না ও এই পুরুষকে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তার। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল মুক্তা। আর ঠিক তখন পিছনে এসে দাঁড়ায় সাবি। টের পেয়ে বড় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। 'তুমি কি এখনি রওনা হচ্ছিলে নাকি!' অবাক হয়ে সাবি শুধায়, 'তোমাকে এখনি চলে যেতে কে বলল?'

'ওই পুরুষ। তোমার মামা। তোমার মামা রাগ করে আমায় চলে যেতে বলছে, আবার আদর করে কাছে ডাকছে। এখন আমি কি করমু?' যেন বলতে চাইছিল মুক্তা সাবির কানে কানে। পারল না। মাটির দিকে মুখ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে দূরের একটা গাছে কোকিল ডেকে উঠল। হাওয়ায় ভেসে আসছিল সদ্যফোটা ভাঁট ফুলের গন্ধ। চাঁদের আলো ছোপানো উঠোনটা দেখতে দেখতে সাবি বলল, 'মেয়েটা ভাল মামা, দুঃখে পড়ে তোমাদের কাছে থাকতে এসেছিল, তুমি ওকে—', একবার থেমে সাবি মতির দিকে চোখ তুলল, 'ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন।'

যেন হঠাৎ গুদামঘরের ভিতরে কে বিকৃত গলায় হেসে উঠল। দামিনী। বোবা দামিনী স্বপ্নের মধ্যে হাসছে, মতি বুঝল।

কিন্তু ও কি? মতি এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল কেন? থুথু ফেলছে। সাবি অবাক হল, মুক্তার বুকের ভিতর আবার ধক্ করে উঠল।

'কি হল মামা?' সাবি ঢোক গিলল।

ডান হাতটা পিছনের দিকে তুলে কি বারণ করার মত মতি হাতটা নাড়ল। সাবি বুঝল না। মুক্তা বুঝল। বুঝতে পারল মতির মন আবার ঘুরে গেছে, কি মনে পড়ে আবার সে শক্ত হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় মানুষের মুখের সব কটা রেখা পরিষ্কার দেখা যায় না। কিন্তু তা হলেও মামার মুখের বিকৃতি সাবির চোখ এড়ায় না। ভয় পায় ও।

'বলে দে, এখান থেকে ও সরে যাক—এখনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাক।' সাবি কথা বলার আগে মতি গর্জন করে উঠল। তারপর ছুটে বড় ঘরের দাওয়ায়

উঠে গেল। সাবি আঁচল দিয়ে চোখ চাপা দেয়।

এক পা এক পা করে মুক্তা মনোহর কর্মকারের উঠোন পার হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কামারশালার দরজা বন্ধ। কুকুরটা দাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল। যেন মুক্তা বাইরে রাস্তার দিকে যাচ্ছে টের পেয়ে রাজা উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দেয় আর বিকট শব্দ করে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। রাস্তার ধারের বড় কাঁঠাল গাছটার নীচে এসে মুক্তা কেমন ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামল। আর একটা শব্দ তার কানে এল। কে কাঁদছে। সাবির গলা না, দামিনীর গলা না, মতি কাঁদছে। হাউ হাউ করে কাঁদছে। ভাইয়ের শোকে কাঁদছে, রতির জন্য কাঁদছে। কান্নার ধরন শুনে মুক্তা বুঝল মরাকান্না। আর দাঁড়ায় না ও। ঘাসের ওপর দিয়ে কুমারীর সিঁথির মত সাদা সরু পথ চলে গেছে। সেই পথ ধরে মুক্তা হাঁটতে আরম্ভ করল। এক সময় মাথার ওপর কি একটা গাছে পাখির ডানার ঝাপটা শুনল ও, ভয় পেল না; আর ভয় পেলে তাকে চলবে না। জোরে পা চালাতে শুরু করে ও।

॥ আটাশ ॥

কিছুক্ষণ পর মুক্তার শীত-শীত করতে থাকে। সিরসিরে হাওয়া চালিয়েছে। হাওয়া আর ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় মিলে রাতের সে কী অপরূপ চেহারা। চারদিক চুপচাপ—নির্জন নিঃসাড় গাঁয়ের পথ ধরে মুক্তা কতক্ষণ হাঁটল কিছুই বুঝতে পারে না। ওটা বুঝি রাধাবল্লভপুরের হাট পার হয়ে এল সে। সারি সারি শূন্য চালা ঘর আর ঝাপ নামানো দোকানঘরের চেহারা দেখে ও বুঝল। তাদের দেশের গাঁয়েও এরকম হাট বাজার আছে, মুক্তার মনে পড়ে। একটা চালার নীচে কটা গরু শুয়ে আছে। যেন ওরা জাবর কাটছে। গরুর দাঁতের কচকচ শব্দ ছাড়া এত বড় বাজারটায় আর কোন শব্দ ছিল না। একটা মানুষ চোখে পড়ে নি মুক্তার। দোকানীরা দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মুক্তা নিশ্চিন্ত হল। তা না হলে কেউ না কেউ তাকে এমন দুপুর রাতে একলা পথ চলতে দেখে কোথায় যাবে, কোথা থেকে এল, সঙ্গে কেউ নেই কেন হাজারটা প্রশ্ন করত। শূন্য হাট পার হয়ে আবার মাঠের রাস্তায় নেমে মুক্তা ধীরে ধীরে হাঁটে। হাটের ওপর দিয়ে আসার সময় তাকে বেশ জোরে পা

চালাতে হয়েছিল—কেউ না তাকে দেখে ফেলে। তবে এটা সে বুঝতে পারল, পশ্চিম দিক ধরে ও হাঁটছে। রতি মতি এই হাটে যাচ্ছিল সেদিন পাঁঠা বেচতে। বলাইর সঙ্গে মুক্তা উল্টোদিক থেকে আসছিল, আর তখন দু ভাইয়ের সঙ্গে তাদের দেখা; কাজেই মুক্তা এখন বুঝল এই পথ ধরে এগোলে সে চওড়া সড়কটা পেয়ে যাবে। বাস্‌-এর রাস্তা। না, তখন আর তার কোন ভয় নেই, কোন গাঁয়ের গেরস্ত বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে আসে নি। পাকিস্তানের মেয়ে, সোজা বনগাঁর ওদিক থেকে সে হেঁটে আসছে। সেদিন বলাই বলছিল, পাকা রাস্তাটা বনগাঁর দিকে চলে গেছে। 'হুঁ, কইলকাতার দিকে চলছি আমি—তামা কাসা সোনা-দানা কিছু আইনবার পারলাম না। সব পাকিস্তানে রাইখ্যা আইছি।' যেন ওই রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলে মুক্তা তখন যা হোক একটা উত্তর দিতে পারবে। মনে মনে উত্তরটা সে তৈরী করে রাখে। 'তবে কি আমি কইলকাতা ফিরা যাইছি—আবার সেই শিয়ালদা ইস্টিশান?' কথাটা চিন্তা করে মুক্তা এক সময় থমকে দাঁড়ায়। খুড়ীর চেহারা মনে পড়ে। 'না, শিয়ালদা যাওয়া অইব না—আমি পথে পথে ঘুইরা ভিক্ষা কইরা খামু।' মুক্তা মনে মনে ঠিক করে ফেলে। 'আর বলাইর দেখা পামু না। অত বড় শহরে লাখ লাখ মানুষ হাঁটাচলা করে—কে কার খোঁজ রাখে, কে কার মুখ দেখে। বলাইর সাথে আর যেন আমার দেখা না হয় মধুসূদন।' মুক্তা এখন ঠাকুরের কাছে অন্যরকম প্রার্থনা জানায়। কাল পরশু যদি বলাই শ্রীপুরের মনোহর কর্মকারের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়, ওদিকে টাকাপয়সার যোগাড় করে মুক্তাকে নিয়ে আসবে বলে রতির ভাই মতির কাছে কথাটা তোলে তো মতি বাস্তহারা মেয়েটা সম্পর্কে কী বলবে, মুক্তা যেন এখনি তা শুনতে পাচ্ছিল। 'কেলেঙ্কারি কইরে গেছে আপনার বইন—আমার ভাই গলায় দড়ি দিয়েছে শয়তানটার জন্য—লাথি মেইরে বাড়ি থেইকে তাড়িয়ে দিছি।' তখন বলাইর মনের অবস্থা কেমন হবে মুক্তা চিন্তা করে শিউরে উঠল। 'তাই বলাইর সাথে এই জন্মে যেন আমার দেখা সাইক্ষাত না হয়, মধুসূদন।'

মাঠ পার হয়ে মুক্তা আবার গাঁয়ের সরু মাটির পথ পেল। দুধারে গাছ গাছালি আর ফাঁকে ফাঁকে টিন টালি ছাওয়া ছোট বড় কত ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কোঠাবাড়িও চোখে পড়ল। যেন কাল পরশু চুনকাম হয়েছে। তাই হবে। বলাইর সাথে সেদিন এদিকে আসবার সময় বাড়িগুলি মুক্তা দেখছিল। এখন

মনে পড়ল। পাকিস্তানের মানুষেরা এদেশে নতুন করে বাড়ি তৈরী করছে, পুকুর কাটিয়েছে, ক্ষেত-খামারের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। মুক্তার বুকের ভিতর হু হু করে উঠল। 'এমন একখান ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছিলাম, সঙ্গে ছোট একখান ক্ষেত, দুইখান গরু, দুইডা ছাগল, কিছু হাঁস পায়রা।' মুক্তার চোখে জল এল। কিছুই হল না তার—একটা বাড়ির সামনে একটু সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ও। বাড়ির সামনে আখের ক্ষেত। এখনও ছোট রয়েছে গাছগুলি। চাঁদের আলোয় পাতাগুলি ছুরির ফলার মত চকচক করছে। বাঁশ আর কাঁটা তার দিয়ে চারধার ঘিরে দেওয়া হয়েছে। গরু ছাগলের ঢোকার সাধ্য নেই। ওপাশে খড়ের গাদা। ঘরের চালে কুমড়া লতা তুলে দেওয়া হয়েছে না? যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছবি দেখছিল। হঠাৎ তার পা কেঁপে উঠল বুক কেঁপে উঠল। বাড়ির ভিতর এক সঙ্গে তিনচারটি মেয়েছেলে উলু দিয়ে উঠল। ঝড়ো হাওয়ার মত শব্দটা মুক্তার কানে আসতে ভয় পেয়ে সে আবার জোরে জোরে পা চালায়। গেরস্তবাড়ি ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে। না কি ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ জেগে উঠল! আহ্লাদে হঠাৎ এমন করে দুপুর রাতে উলু দিয়ে উঠল কেন সব? আলো জ্বলছে না, বাদ্যভাণ্ড নেই—কাজেই মুখে ভাত না, বিয়েবাড়ি না। তবে? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে মুক্তার ক্ষীণ শুকনা ঠোঁটের কিনারে এক চিলতে হাসি জাগল।

ঠোঁটে হাসি জাগল কিন্তু বুকের ভিতর নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল। একটা ক্ষীণ ইচ্ছার সুতোয় ছোট স্বপ্নের ফুলটা তার বুকের ভিতর আগে আগে ঝুলত। যখন বলাইর সঙ্গে নতুন ভাব হয়, বলাইর হাত ধরে শেয়ালদা থেকে পালিয়ে আসে—বিয়ের পর তার ছেলেপুলে হবে একদিন। আজ সেই সুতোটা ছিঁড়ে গেছে—স্বপ্নের ফুল শুকিয়ে গেছে। এখন কথাটা মনে পড়ল তার। দুপুর রাতে ওই বাড়ির কোন বৌ-ঝির বাচ্চা হয়েছে—খুশি হয়ে বাড়ির অন্য মেয়েরা উলু দিচ্ছে। একবার না, দুবার না—সাত বার—সাত বার উলুর শব্দ ঘুমন্ত গাঁ-টাকে কাঁপিয়ে দিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। ছেলে হয়েছে কোন সোহাগীর। ভাবতে ভাবতে মুক্তা একটা রাস্তার বাঁকে ঘুরল। চাঁদটা এবার ঢলে পড়েছে। ওটা অশ্বত্থ গাছ না? কত কালের পুরনো গাছ! ডাল পালা ছড়িয়ে ছোট বড় হাজারটা ঝুড়ি নামিয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। হাওয়ায় গাছের পাতার সর সর শব্দ হয়। বাঁ দিকে চোখ পড়তে মুক্তা চমকে ওঠে—ভয় পেয়ে আরো জোরে পা চালায়। শ্মশান হবে। পোড়া বাঁশ আধপোড়া কাঠের

টুকরো, মাদুর কাঁথার পোড়া-ছেঁড়া টুকরো দেখে মুক্তার গা ছমছম করতে থাকে। যেন ওই অশ্বত্থ গাছ থেকে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। মুক্তার কপাল ঘামছে, আর শীত করছে না, বরং দু কান দিয়ে গরম হাওয়া বইছে। জল তেষ্টা পেয়েছে, গলা শুকিয়ে গেছে। এক রকম ছুটতে ছুটতে ও শ্মশানের মত জায়গাটা পার হল। তার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করল পুকুরটুকুর আছে কি না ধারে কাছে। জল না খেয়ে আর যেন হাঁটতে পারছে না—পা দুটো কেমন অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু পুকুর দীঘি ডোবা নালা কিছুই চোখে পড়ছে না। কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। বনতুলসীর গাছ। পাতার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। এখানে দমকা হাওয়া নেই। পথের দু পাশে ঢিবির মত উঁচু পাড়। আর ঘন জঙ্গল। কি সব পোকা যেন জঙ্গলের ভিতর ঝিরঝির শব্দ করছে। রাস্তাটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গেছে। যেন চড়াই বেয়ে উঠছে মুক্তা। তবে কি সে ভুল পথে চলে এল। কিন্তু তা হলেও তাকে এগিয়ে যেতে হবে। ডাইনে বাঁয়ে আর রাস্তা নেই। না, এটাই ঠিক পথ। সেদিন বলাইর সঙ্গে কথায় কথায় ও এত মেতেছিল যে ভাল করে তাকানো হয় নি পথের দু পাশে উঁচু ঢিবি আর বনতুলসী আশশ্যাওড়ার বন ছিল কি না। চাঁদটা বুঝি একেবারে ডুবল। এক ফালি জ্যোৎস্না আর চোখে পড়ে না। তবে কি রাত ফুরিয়ে গেল, ভোর হয়ে এল? মনে কেমন খটকা লাগল তার। ভোর হবার মুখে চাঁদের আলো মজে যায় না? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে। চোখ তুলে মুক্তা আকাশ দেখল। ডাইনে দেখল বাঁয়ে দেখল সামনে দেখল— একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের আকাশ দেখল। কালো আকাশে তারা জ্বলছে। ভোরের আকাশের চেহারা না। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে আবার সে হাঁটে। আরও উঁচুতে উঠল ও, যেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলল। দুধারে জঙ্গল এখন আরো ঘন হয়ে আছে। সেই ঝিরঝির শব্দটা এখানে নেই। সেই শব্দ পিছনে ফেলে এসেছে। হঠাৎ মুক্তার পা দুটো স্থির হয়ে গেল। পোকার ঝিরঝির শব্দ না, অন্য একটা শব্দ তার কানে এল। -ঠুনঠুন আওয়াজ। যেন রাস্তার ওদিক থেকে মিঠা আওয়াজটা এদিকে এগিয়ে আসছে। ওধারটা বুঝি ঢালু। তাই মুক্তা ঠিক দেখতে পারছে না, বুঝতে পারছে না কিসের শব্দ। শিয়ালদার ডেরায় থাকতে গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভেঙে যেত ঠুনঠুন মিঠা আওয়াজটা সে শুনত। রিক্সার শব্দ। মুক্তা চমকে উঠল। তবে কি ওদিক থেকে একটা রিক্সা আসছে? কিন্তু এখানে তো টানা রিক্সা চলে না। ব্যারাক-

পুরের চওড়া সড়কে সেদিন সে সাইকেল-রিক্সা দেখেছে, সেই রিক্সার ঘণ্টা বাজে না। পোঁ পোঁ আওয়াজ করে। ব্যাপার কি। একটু পরেই অবশ্য তার ভুল ভাঙল, ভয় ভাঙল। আওয়াজটা বেশ কাছে চলে আসছে টের পেয়ে ও পাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অপেক্ষা করতে লাগল। ওদিকের ঢালু বেয়ে প্রকাণ্ড দুটো মোষ এদিকে উঁচু রাস্তায় উঠে এল। মোষের গলায় ঘণ্টা বাজছে। পিছনে একটা মানুষ। পাগড়ীর মতন করে মাথায় কাপড় জড়ানো। হাতে লাঠি। মোষ দুটোর পিঠে লাঠির গুঁতো মেরে লোকটা মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে হেঁট হেঁট আওয়াজ বার করছে। মোষ নিয়ে লোকটা এধারের ঢালু বেয়ে নেমে যেতে মুক্তা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। নিশ্চয় রাধাবল্লভপুরের হাটে যাচ্ছে মোষ বেচতে। কাল কি রাধাবল্লভপুরের হাট? ভাবতে ভাবতে মুক্তা আবার হাঁটে। এবার ঢালু পথ। যেন পা দুটো আপনা থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ চড়াই বেয়ে উঠতে তার কষ্ট হচ্ছিল। এখন আর কষ্ট নেই। কিন্তু জল তেষ্টাটা কমছে না। কাগজের মত শুকিয়ে খসখসে হয়ে আছে গলার ভিতরটা। ডাইনে বাঁয়ে তাকায় মুক্তা। জঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে। মাঠ চোখে পড়ছে। এবার তার আশা হল। জল পাওয়া যাবে। মাঠ থাকলে নালা ডোবাও থাকবে। বনতুলসীর ঘন গন্ধটা কমে গেছে। দুপাশে কচু কাঁটানটের জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। পোকার শব্দ নেই। যেন মাঝে মাঝে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। মুক্তার আর সন্দেহ রইল না। ধারে কাছে জল আছে।

চলতে চলতে আবার এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল ও। রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর সাদা মতন কি একটা চোখে পড়ল তার। কাগজ? রুমাল? প্রথমে পায়ের নখ দিয়ে ওটা নেড়ে চেড়ে দেখে ও, তারপর নুয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নেয়। কে একটা রুমাল ফেলে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুক্তা ওটা হাত থেকে ফেলে দেয়। যেন কালচে রক্তের দাগ লেগে আছে জায়গায় জায়গায়। ওটা যে রক্তের দাগ অন্ধকারেও কি করে যেন টের পেয়ে গেল ও। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। তারপর অবশ্য ভয়ের ভাবটা কেটে যায়—কেমন একটা ঘেন্নায় নাকের ডগাটা কুঁচকে থাকে, আর সেই অবস্থায় ও আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। ফুরফুরে মেঠো হাওয়া চোখে মুখে লাগছে। এবার তার মনে হল হাওয়ায় ভোরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রাত ফুরিয়ে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আকাশ দেখে ও—আকাশের কিনার—যেখানে সূর্য উঠবে। কিন্তু পুব দিক

কোনটা গুলিয়ে যাচ্ছে; যেন হঠাৎ কুয়াশা পড়তে আরম্ভ করেছে। একটা ধোঁয়াটে পর্দায় আকাশের চারিদিক ঢেকে যেতে শুরু করেছে। রুপার ফুটকির মত তারাগুলিকে এখন কেমন লালচে লালচে লাগছে। দুটো তাল গাছের পাশ কেটে একটা বড় বাঁক ঘুরে রাস্তাটা সত্যি সত্যি নিচু মাঠের বুকে নেমে গেছে। ধূ ধূ মাঠ।

মাঠের ওপর এসে মুক্তার নতুন করে ভয় করতে লাগল। শক্ত শুকনা মাটি। কোন কালে এখানে ধান পাটের চাষ হয়েছিল কি না বোঝা যায় না। জায়গায় জায়গায় দূর্বা ঘাস আর কাঁটানটের ঝোপ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না। ধারে কাছে ঘর বাড়ি নেই। যেন চারদিকে দু তিন মাইলের মধ্যে কোন বাড়ি নেই অনুমান করা যায়। কুয়াশার জন্য সব বোঝা যায় না যদিও। ভূত পেত্নীর ভয় না, চোর ডাকাতের ভয় না; মাঠের সঙ্গে মিশে একাকার হয় রাস্তাটা ঠিক কোনদিকে এগিয়ে গেছে বুঝতে না পেরে মুক্তা ভাবনায় পড়ে গেল। এমনও তো হতে পারে বাকী রাতটুকু সে এই মাঠের মধ্যেই ঘুরবে—ফর্সা হবার আগে বাস-এর সড়কে গিয়ে উঠতে পারবে না। বা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে আবার কোন গাঁয়ে গিয়ে হাজির হবে। দু হাতে চোখ রগড়ে ও দৃষ্টিটা ধারালো করে নেয়, তারপর পায়ে চলা পথের সাদা দাগ ধরে ধরে সাবধানে এগোয়, যাতে কোনরকম গোলমাল না হয়, রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে না চলে যায়। কিন্তু নালা ডোবা দীঘি পুকুর কিছুই চোখে পড়ছে না —কেবল শুকনা খরখরে মাটি আর ঘাসের চাপ আর কাঁটানটের ঝোপ দেখতে দেখতে ও এগোচ্ছে। এখন আর শুধু গলা না বুকের ভিতরটাও শুকিয়ে গেছে, আবার শীত-শীত করছে তার। কপালের রগ টনটন করছে, চোখ দুটো জ্বালা করতে আরম্ভ করেছে। পা-ও চলছে না। যেন আর হাঁটতে পারবে না, একটু সময়ের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কে জানে, হয়তো এই মাঠেই ও পরে মরে থাকবে। এটা একরকম মন্দ না, চিন্তা করল ও, ইচ্ছা করে চেষ্টা করে তাকে মরতে হল না, আপনা থেকে মরে গেল—সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। কিন্তু এখানে এভাবে মরে পড়ে থাকলে তাকে কি কেউ পোড়াতে আসবে না? কারো চোখে পড়বে না? কোন চাষী কি এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ের হাটে যায়, কি কুটুমবাড়ি যায়—এমন কোন না কোন মানুষের চোখে তার মরা শরীরটা পড়বে না? মুক্তা তা-ও চিন্তা করল। না কি এই মাঠের মাঝখানে পড়ে থেকে থেকে শরীরটা পচবে আর কাক-শকুনে ঠুকরে ঠুকরে খাবে, শেয়াল-

কুকুরে টানাটানি করে ছিঁড়বে। এক তাল হতাশা নিয়ে এত বড় একটা নিশ্বাস তার বুক ঠেলে উঠে এল।

আরো কিছুটা পথ চলার পর মুক্তার আর সন্দেহ রইল না রাত ফুরিয়ে এসেছে, একটু একটু করে ফর্সা হয়ে যাচ্ছে চারদিক, কিন্তু তা হলে হবে কি, কুয়াশার পর্দাটা যেন এখন আরো মোটা হয়ে গেল—দু হাত দূরের জিনিস চোখে পড়ছে না। 'আমার জীবনটার মত, কাইল কি অইবে জানি না, পরশু কুথায় থাকমু জানিনা।' মনে মনে বলল ও, 'সব ঘোলা অইয়া গেছে।'

হঠাৎ ওর দু পা আড়ষ্ট হয়ে এল, বুকের ভিতর ধক্ করে উঠল; দাঁড়িয়ে পড়ল মুক্তা। প্রথমে মনে করেছিল মাঠের ওপর গরুটরু একটা শুয়ে আছে বা মরে পড়ে আছে। হাতের তেলো দিয়ে ভাল করে চোখ কচলায়, তারপর যতটা পারে চোখ দুটো বড় করে মেলে ধরে ও দু-তিন হাত দূরের মানুষটাকে দেখে। ঘুমোচ্ছে? মরে গেছে? মুক্তা আর এক পা এগোয়। মুখটা মাটির দিকে ঘোরানো লোকটার। পিঠের দিকে জামাটায় লাল লাল দাগ না? রক্ত! মুক্তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তারপর এক সময় তার হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠল; বাবরি চুল মাথায়, হাত-পাগুলি বড় বেশি চেনা চেনা—অস্ফুট আর্তনাদের মত মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বার করে ও ছিটকে দু হাত দূরের মানুষটার কাছে চলে গেল। হাত কাঁপছে তার, পা কাঁপছে; অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে মানুষ যেমন করে কাঁপে মুক্তা সেভাবে কাঁপছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে ও মাটির দিকে ঘোরানো মুখটা তুলে ধরে। বলাই! মুক্তা নিজের বাঁ হাতটা উপুর করে ধরে বলাইর নাকের ছিদ্রের সামনে বাড়িয়ে দেয়—এখনও শ্বাস আছে। রক্তমাখা জামাটা সরিয়ে পিঠের কাছে ঘাড়ের কাছে দুটো জখমের চিহ্ন দেখতে পেল ও—ডান হাতের একটা আঙুলের মাথায়ও কাটা দাগ—এখনও একটু একটু রক্ত চোঁয়াচ্ছে। পাগলা ষাড় কি মোষের সামনে পড়েছিল? না, না, যেন দায়ের কোপ—ছুরিছোরার ঘাই। কি ভেবে মুক্তা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, কিন্তু যা ভেবেছিল তা করা হল না। এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে কেউ শুনবে না—ধারে কাছে মানুষ দূরে থাক কাকটা পর্যন্ত নেই। তবে কি মুক্তা বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—যদি তখন কাউকে এদিকে আসতে দেখা যায়, কিন্তু ততক্ষণ—

ঘাড় নামিয়ে বলাইর মুখটা আর একবার দেখল ও। চোখ দুটো আধ-বোজা হয়ে আছে—ঠোঁটের একটা কোণা ঝুলে পড়েছে; কে জানে, ধিকি-

খিকি করে যে শ্বাসটা বইছিল তা যে একেবারে থেমে গেল না কে বলবে! পায়ে মাথায় শিউরে উঠে মুক্তা আবার নুয়ে হাতের তেলোটা বলাইর নাকের সামনে মেলে ধরে। আছে, এখনও শ্বাস আছে। আর দেরি করে না ও, বিদ্যুৎবেগে ছুটতে আরম্ভ করল। কোন্ দিক ধরে ছুটছে খেয়াল নেই। কিন্তু যেদিকেই যাক এক আধটা ঘরবাড়ি তাকে খুঁজে বার করতে হবে। ঘরবাড়ি থাকলে সেখানে মানুষ থাকবে। তখন মুক্তা তাদের খবর দিয়ে বলাইকে মাঠ থেকে সরাবার ব্যবস্থা করতে পারবে—কিন্তু ধারে কাছে ডাক্তারবাবু কেউ আছেন কিনা চিন্তা করল, চিন্তা করলেও দাঁড়িয়ে থাকল না ও, কুয়াশা ঠেলে অন্ধের মত এগোতে লাগল। লাভ হল না, যত এগোচ্ছে জঙ্গল বাড়ছে; এখন আর হাঁটু সমান কাঁটানটের গাছ না, মাথা উঁচু ঘন বেত জঙ্গলের মধ্যে ও ঢুকে যাচ্ছে, বেত কাঁটায় হাত ছড়ে গেল, পরনের কাপড়টা ছিঁড়ল। একটা ঘু ঘু ডাকছে। চোখে জল এসে গেল মুক্তার। ভুল পথ ধরেছে। এদিকের আশা ছেড়ে দিয়ে ও বাঁ দিকে ঘুরে গেল। আস্তে আস্তে জঙ্গল মিলিয়ে গেল, পরিষ্কার মাঠ পেয়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করল। এবার মুক্তা জলের দেখা পেল। এত বড় দীঘি। উঁচু পাড়। কিন্তু জল দিয়ে কী হবে? জলতেষ্টা তার নেই। এখন সে মানুষ খুঁজছে। দীঘি ডাইনে রেখে আর একটু এগোতেই বেশ চওড়া একটা রাস্তা পেয়ে গেল। এবার তার আশা হল, এই রাস্তা বরাবর এগিয়ে গেলে নিশ্চয় কারো না কারোর দেখা পাবে। যেন একটু হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। কুয়াশার পর্দাটা নড়ে চড়ে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে ও। ওটা কি? একটা গাড়ি না? গরুর গাড়ি মনে হয়। মধুসূদন! মুক্তা বিড়বিড় করে ঠাকুরকে ডাকল। তাই তো, গাড়িটা এদিকে আসছে। এসে অবশ্য ওদিক দিয়ে ঘুরে যাবে, কেননা রাস্তাটা এখান অবধি এসে বাঁয়ে ঘুরে গেছে, কাজেই মাঠের যেদিকটায় বলাই পড়ে আছে গাড়ি সেখানে যাবে না। একটা হাত শূন্যে তুলে 'এই—এই' চিৎকার করতে করতে মুক্তা ছুটল। ছইওলা গরুর গাড়ি। ভিতরে মেয়েছেলে থাকতে পারে। কুটুমবাড়ি যাচ্ছে বুঝি।

॥ উনত্রিশ ॥

গাড়োয়ান অবাক হয়ে মেয়েটাকে দেখছে। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে ও, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ছইয়ের ভিতর থেকে সুন্দর চেহারার আর একটি পুরুষ গলা বাড়িয়ে মুক্তাকে দেখতে লাগল।

'কি হয়েছে, কি ব্যাপার ?'

'আপনারা একটু এই দিকে আইসবেন, বড় বিপদ !'

'বিপদ ! তুমি কোথায় থাক ?'

বলতে বলতে সুন্দর পুরুষটি গাড়ি থেকে নামল। পায়ে জুতো, গায়ে একটা ছাই রঙের সার্ট, গলায় মাফলার জড়ানো। মুক্তা কিন্তু অবাক হয়ে বার বার গারোয়ানের মুখটা দেখছে। হাতের পাঁচন রেখে গাড়োয়ানও নেমে এল। মুক্তার মুখের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে পরে পাশের জামা জুতো পরা মানুষটির কানে কানে কি যেন বলল। সম্ভবত কুয়াশা ঠেকাতে কানে মাথায় কাপড় জড়িয়ে রেখেছে সে। কাপড়টা সরাতে মুক্তা এবার তার সবটা মুখ দেখতে পায়। চমকে ওঠে ও। রতি মতির ভাগ্নীকে নিয়ে সেদিন শ্রীপুর গিয়েছিল গাড়ি নিয়ে লোকটা। গাড়োয়ানও মুক্তাকে চিনে ফেলেছে।

'তুমি মোহন কর্মকারের বাড়ি থেকে আসছ ?'

'হুঁ।'

'তা ওবাড়ির খবর কাল বিকেলে আমরা পেয়েছি।' এবার সুন্দর পুরুষটি বলল, 'তুমি কর্মকারদের বাড়ির বিপদের কথা বলছ, বড় ছেলে রতির ওভাবে মারা যাওয়ার সংবাদ, কেমন ?'

মুক্তা হঠাৎ কেমন থতমত খায়। 'না, আমার নিজের বিপদ। আমার ভাইয়ের অবস্থা খারাপ।' পর পর দুটো ঢোক গিলে মুক্তা যা হোক করে গুছিয়ে কথাটা বলল। কর্মকারদের বাড়িতে এখন অশান্তি, কাজকর্ম বন্ধ। এদিকে তার ভাই আসছে না—অসুখবিসুখ হয়ে 'কইলকাতায়' পড়ে আছে কিনা মুক্তা বুঝতে পারছে না। দু দিন আগেই তাকে এসে দেখে যাওয়ার কথা ছিল মানুষটার। তার ওপর কর্মকারদের বড় ছেলে যেভাবে মারা গেল, তার ভয় ভয় করছিল 'তেনাদের' বাড়িতে থাকতে। তাই কাউকে না জানিয়ে ও চলে আসে ভাইকে দেখতে যাবে মনে করে। এখন রাস্তাঘাট ভাল জানা নেই ;

কোনদিকে বাস চলে, 'রেল ইস্টিশান' কোনদিকে ঠিক করতে না পেরে অনেকটা ঘুরপথে আসতে হয়েছে তাকে। ওই মাঠ ধরে যখন আসে দেখে তার ভাই ঘাসের ওপর পড়ে আছে; গায়ে জখমের চিহ্ন, জামায় কাপড়ে রক্ত—এখনো শ্বাস আছে।

'কোথায়, কোনদিকে!' দুজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

আর কিছু না বলে মুক্তা আগে আগে ছুটল। গাড়িটাকে সেই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে গাড়োয়ান এবং সঙ্গের বাবু মতন লোকটি মুক্তার পিছনে ছুটল।

কুয়াশাটা একেবারে কেটে গেছে, যেন রোদের চিকি দেখা দিতে শুরু করেছে। ঘাসের ওপর চাপ চাপ রক্ত। লোকটা বুঝি মরেই গেছে। দুজন এক সঙ্গে নুয়ে বলাইয়ের শ্বাস পরীক্ষা করল। না, এখনো বেঁচে আছে। মুক্তা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। জামা জুতো পরা সুন্দর মানুষটা বলাইয়ের পায়ের দিকে ধরল, গাড়োয়ান মাথার দিকে ধরে বলাইকে মাটি থেকে টেনে তুলল। তারপর তারা গাড়ির দিকে চলল। মুক্তা সকলের পিছনে হাঁটে।

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল। যেন যেদিক থেকে তারা আসছিল আবার সেদিকে ফিরে যাবে।

'কোথায় যাওয়া অইছে?' মুক্তা মনে মনে প্রশ্ন করছিল, 'বলাইকে তারা কোনখানে লইয়া যাইছে?' গাড়ির ছইয়ের ভিতরে বলাইকে শুইয়ে দেওয়া হল। মুক্তাকেও উঠে বসতে বলা হল। গাড়োয়ান আর গাড়িতে উঠল না। বাবুমতন লোকটি যেন নিজেই গাড়ি চালাবে, গলার মাফলার খুলে কষে কোমরে বেঁধেছে তারপর লাফিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়োয়ানের জায়গায় বসেছে।

'গোলক, তুই ছুটে যা। বিষ্টুপুরের বাজারে মফিজ মিঞার লরী দাঁড়িয়ে আছে। ইট নিয়ে চাকদা যাবার কথা। বলবি, শিবকুমার একটা লোককে রাণাঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাবে, যেন লরী রাখে।'

গোলক গাড়োয়ান ঘাড় কাত করে তাই বলবে জানিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল। ছইয়ের ভিতর অচেতন বলাইর পাশে বসে মুক্তা এখন নতুন করে চমকে উঠল। তবে কি এই সাবির স্বামী? শিবকুমার—মতির ভাগ্নীর মুখে শোনা নামটা মুক্তার মনে পড়ছে। তাই, বিষ্টুপুরের বাজারের কথা বলল না? বিষ্টুপুরের পাশের গাঁ-ই তো নিশ্চিন্তপুর—সাবির

শ্বশুরবাড়ি। ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে শ্রীপুর যাচ্ছিল তারা। তাই হবে, আজকালই সাবির ফেরার কথা, দুদিনের জন্য মামাদের দেখতে গিয়েছিল, আর ইতিমধ্যে রতি কেমন কাণ্ডটা করল। ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে মুক্তা গাড়ির সামনে বসা মানুষটিকে দেখছিল, হেঁট হেঁট শব্দ করে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়িটা এখন ছুটে চলেছে। মুখটা দেখা যাচ্ছিল না, পিছনটা দেখছিল মুক্তা। 'খুব ভালমানুষ অইব—দেখতে যেমন সুন্দর ভিতরখানাও সুন্দর সাবির বরের।' মুক্তা মনে মনে বলল। 'কিছু আর জিজ্ঞাসাবাদ করল না আমারে, কতরকম সন্দ অইতে পারত—বলাইর অবস্থা দেইখা আর একখান কথা না বইলা গাড়িতে তুইলা লইল।' মুক্তার বুকের ভিতরটা কেমন হাল্কা হয়ে গেল একটু সময়ের জন্য। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না এই ভাবটা। আবার তার দুশ্চিন্তা আরম্ভ হল। রাণাঘাট যাচ্ছে বলাইকে নিয়ে। রতির লাস রাণাঘাট নিয়ে গেল না ওরা? কিন্তু বলাই যদি হাসপাতালে যাওয়ার আগে রাস্তায় মরে যায়? মুক্তার তখন কী হবে! সাবির বর কি বলবে, আমার সঙ্গে চল—আমাদের বাড়িতে চল, সেখানে থাকবে কাজকর্ম করবে? ভাবতে মুক্তার বুকের ভিতর কেমন গুরগুর করে উঠল। যদি সাবি মামাবাড়ি থেকে ফিরে এসে সেসব কথা শিবকুমারকে বলে দেয়! না, বলবে না। মুক্তা যখন ওবাড়ি ছেড়ে চলে আসে সাবি কাঁদছিল। সাবি তাকে ভালবাসে। মুক্তার মনটা এখন কেমন করে উঠল ওই মেয়েটার জন্য। যেন তার মনে হল সংসারে ওই একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ তাকে ভালবাসে না, ভাল চোখে দেখে না। তাই কি? বলাইর মাথাটা তার কোলের কাছে। চোখ দুটো এখনও আধবোজা হয়ে আছে, ঠোঁটের কোণাটা ঝুলে আছে। 'না, কথাখান ঠিক অইল না—এই মানুষটাই আমারে ভালবাসে—গরীব, টাকা-পয়সার জুগাড় করতে না পেইরে আমারে লোকের বাড়িতে রাখছিল—কে জানে, টাকাপয়সার জুগাড় কইরা হয়তো আমারে ফিরাইয়া নিতে কইলকাতা থেকে রওনা অইছিল—পথে ডাকাইতে ছুরি মাইরা সব লইয়া গেল।' ভাবতে ভাবতে মুক্তার বুক হু হু করে উঠল, আবার চোখের কোণায় জল জমতে লাগল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে এক ফোঁটা জল বলাইর কপালের ওপর ঝরে পড়ল। আঁচল দিয়ে মুক্তা বলাইর কপাল মুছে দিল।

॥ ত্রিশ ॥

এক মাস পর। চৈত্রের একটা দুপুর। প্রচণ্ড রৌদ্র। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া ওঠে। তখন ধুলোর ঝড় বইতে আরম্ভ করে। তারপর আবার সব চুপচাপ। গাছের পাতাটা নড়ে না। বলাইকে দেখা যায় একটা খড়ের ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে আছে। সামনে বাগিচা। শশা ক্ষেত। কচি নধর সবুজ শশাগুলি মাচার নীচে ঝুলছে। পাতার ছায়া পড়েছে। পাতার ওপরে রৌদ্র। নীচে ছায়া। কটা শালিক ওখানে খেলা করছে। কিচিরমিচির শব্দ করছে। বলাই এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তার দৃষ্টি শশা ক্ষেতের দিকে থাকলেও মন সেখানে নেই। যেন খুব একটা কি চিন্তা করছে সে। যেন এই রৌদ্র ছায়া ঘাস শালিক ধুলো ঝিঁঝিঁর ডাকের জগৎ থেকে অনেক দূরে, আর কোথাও তার মন চলে গেছে; সেখানকার ছবি দেখছে শব্দ শুনছে, সেই জগতের শব্দ বুকে নিয়ে মগজে নিয়ে এখানে মন খারাপ করে বসে আছে। মাথার বাবরিটা নেই। চুলগুলি এইটুকুন করে কেটে দিয়েছে হাসপাতালের লোকেরা। বলতে কি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিশ্চিন্তপুরে এসে ভাল করে সে কারোর সঙ্গে কথাই বলছে না। শিবকুমার সত্যি শিবের মতন মানুষ। সাবি সব তাকে খুলে বলেছে। বাস্তুহারা মেয়ে—তার ওপর বলাইর কোন কাজ জুটছে না। তাদের চাষবাসের অনেক কাজ। বলাই লাঙল ধরতে জানে না। তাতে কি? ক্ষেত খামারের কাজ দেখা শোনা করতে তাদের আর একটা লোকের দরকার। শিবকুমার একলা সব দিক সামাল দিতে পারে না। স্ত্রীর কথায় শিবকুমার রাজী হয়। তা ছাড়া মুক্তাও বসে থাকছে না। ঘর-গেরস্থালীর কাজ করছে। সব দিক বিবেচনা করে শিবকুমার তার পুকুরপাড়ের এক ফালি জমি ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে একটা খড়ের ঘর উঠেছে, উঠোনে বেগুন গাছ শশা গাছ লাগান হয়েছে। বলাইর আস্তানা। এখনও সে ওই ঘরে একলা আছে। রাত্রে একলা শোয়। মুক্তার জন্য সাবি বাড়ির ভিতর ঢেঁকিঘরের সঙ্গের ছোট চালাটা ছেড়ে দিয়েছে। মুক্তা রাত্রে শোয়। তবে রাত্রির ওই ক ঘণ্টা ছাড়া বাকি সময়টুকু সে সাবির সঙ্গে সঙ্গে আছে। ঘর-গেরস্থালীর কাজ করার কথা বটে, কিন্তু মুক্তাকে আজ পর্যন্ত কিছু করতে হয় নি, সাবি করতে দিচ্ছে না। দুজনে কেবল গল্প আর গল্প

নিয়ে সারাক্ষণ মেতে আছে। থালায় ভাত বেড়ে মুক্তা যখন বলাইর কাছে যায় সাবিকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। পুকুরপাড়ের রাস্তাটা দুজনে গল্প করতে করতে পার হয়। 'আমার কেমন ডর ডর লাগে ভাই তুমার চাইলতা তলাটা পার অইতে।' মুক্তা বলে। সাবি বিশ্বাস করে না। আসল কথা, বলাই মুখ গোমরা করে থাকে, মুক্তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, একটু হাসি নেই মুখে, যেন কি কেবল ভাবছে সারাক্ষণ। সাবি এটা লক্ষ্য করে। এবং সেজন্য তার মনেও কম অশান্তি না। মুক্তার কথা ভাবে। তারপর ভাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। চৈত্র মাসটা কাটুক। বৈশাখ আসুক। আর কটা দিন। পুরুত ডাকিয়ে বলাইকে দিয়ে মেয়েটার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিলে বলাইর মুখে হাসি ফুটবে। মুক্তাও জানে বৈশাখ মাসে তাদের বিয়ে হবে। বলাইকেও বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে যে সে খুশি হয়েছে তা না। এর মধ্যে একদিন কবে মুক্তাকে একলা পেয়ে বলাই বলছিল কলকাতায় ফিরে যেতে। সেখানে কালীঘাটে না হয় বিয়ের কাজটা সারা যাবে। এখানে তার মন টিঁকছে না। বলতে কি, একটা কাজ সে যোগাড় করে ফেলেছে। লোকটার কাছ থেকে কিছু আগাম টাকা সে নিয়েছে। ওই টাকা নিয়ে শ্রীপুর আসবার সময় না পথে তাকে ডাকাতে ধরল। সুধীরের টাকা কেড়ে নিতে গিয়েছিল বলে সুধীর ছোরা মেরে বলাইকে জখম করে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল, এদের কাছে কথাটা সে বেমালুম চেপে গিয়েছে। তারা অবশ্য ডাকাতের কথাই বিশ্বাস করেছে। কিন্তু মুক্তার একেবারে ইচ্ছা নেই কলকাতায় ফিরে যেতে। আসল কথা সাবির কাছ ছাড়া হতে চায় না ও। কলকাতায় গেলে বলাইর মন আবার ঘুরে যেতে কতক্ষণ, মুক্তার সেই ভয়।

আজ দুপুরেও দুজনের মধ্যে সেকথা হচ্ছিল। বড় ঘরের দাওয়ায় বসে মুক্তা সাবির চুল বেঁধে দিয়েছে। সাবির উঠোনে অতসী ফুল ফুটেছে। কলাপাতায় করে এক রাশ ফুল তুলে এনেছিল মুক্তা; সাবির খোঁপায় কটা ফুল গুঁজে দিয়ে আরসীটা ওর গাল ও কানের কাছে তেরছা করে ধরে মুক্তা বলছিল, 'দেখ ভাই, কেমন খোঁপাখান অইছে, পরীর মতন লাগছে।'

'আয়, তোকে পরী সাজিয়ে দিই।' বলে সাবি মুক্তার চুল বাঁধতে বসে। মুক্তা খুশি হয়। হাঁটু গেড়ে সাবির সামনে বসে।

'আজ চৈত্রের বাইশ—দেখতে দেখতে বাকি দিন কটা কেটে যাবে।' সাবি কিসের ইঙ্গিত করছে মুক্তা বুঝতে পারে। কিছু বলে না। হঠাৎ যেন মুখটা কালো করে ফেলে।

'ওঁকে বলেছি পুরুত ঠাকুরকে খবর দিতে—এসে পাঁজি দেখে একটা দিন দেখে দিক তো আগে—আমাদের তৈরী হতে হবে।'

বিয়ে, বিয়ে! দুজনের মাথার ওপর একটা ভোমরা গুনগুন করে উড়ছিল। কিন্তু সেই গুনগুনানিতে মুক্তার মন সায় দিচ্ছে না। দিতে পারছে না। কেমন ভার ভার ঠেকে বুকের ভিতরটা।

'বড় বড় করে নিশ্বাস ফেলছিস কেন?'

সাবির ধমক খেয়ে মুক্তা কেমন করে হাসল। শুকনা হাসি।

'ক্যান জানি মনে কয় ও থাকবে না ভাই—ওকে ধইরে রাখতে পারমু না আমি।'

'কোথায় যাবে শুনি?' মুক্তার মাথায় জোরে জোরে চিরুনি চালায় সাবি। 'কেবল তোর এক জোড়া চোখ তো না, আমারও এক জোড়া চোখ আছে, ওঁর আছে এক জোড়া। তিন তিনটে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় ও পালাবে শুনি?' একটু থেমে পরে সাবি বলল, 'বেশ তো, যায় যাবে—এখানে মন না টেঁকে কলকাতায় গিয়ে চাকরি করবে। বিয়েটা তো হয়ে যাক। তার পর শহরে যাবে। তুই এখানে থাকবি—কলকাতায় বাসা করে খরচ চালাবার মতন যখন শক্ত সমর্থ হবে তোর বর তখন তোকে নিয়ে যাবে—এখন না।'

মুক্তা আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'মন দিয়া যদি বাঁধতাম না পারলাম, চোখে চোখে রাইখা কি কাউরে আটকান যায়, ভাই—আমার মনে কয় তারিখের কথা শুইন্যা ও সইরা পড়বে।'

'পড়ে—পড়বে।' বিরক্ত হয়ে সাবি হাতের চিরুনি মাটিতে রাখে। 'তুই তো আর জলে পড়ে নেই, আমি যখন আছি তোর একটা দিক হবেই, ভয় পাস কেন।'

শুনল মুক্তা। ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে সাবিকে দেখল। চোখে জল এসে গেছে ওর। সাবির চোখ জোড়াও ছলছল করতে আরম্ভ করে। দুজন আর কথা বলে না ভোমরাটা গুনগুনিয়ে উড়ছে।

॥ একত্রিশ ॥

শালিক দুটো উড়ে গেছে। মাচার নীচে ঘাসগুলি তখনও অল্প অল্প কাঁপছে। যেন এবার আলতো হাওয়া ছেড়েছে চৈত্রের। একটা শুকনা শশাফুল ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে। সেদিকে চোখ রেখে বলাই বিড়ি ধরায়। না, শশাফুল ঘাস মাটির দিকে চোখ রাখলেও তার মন অন্য জায়গায়—আর এক ছবি চোখের সামনে ভাসছে। রাস্তার পীচ তেতে উঠে এখন গলতে আরম্ভ করেছে, ফলের দোকানে ঘাস রঙের নতুন আঙুরের ছড়া ঝুলছে; পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা নল দিয়ে টেনে টেনে অরেঞ্জ স্কোয়াস গিলছে—হাতে ঘড়ি চোখে চশমা। একটা নতুন মেয়ে দেখা যাচ্ছে। পানের দোকানের আশে-পাশে ঘুরঘুর করে। দুপুর বেলা শিকার ধরতে বেরিয়েছে। রাস্তাটা জাম্ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ওধারে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ট্রাম বাস রিক্সা লরী সব দাঁড়িয়ে আছে। সার্জেণ্ট হাত তুলে তুলে সব আটকে দিচ্ছে। কেউ এগোতে পারছে না। বাদাম চানাচুরের থলে কাঁধে ঝুলিয়ে বলাই ওদিক দিয়ে রাস্তা পার হয়। পীচ গলা গরম রাস্তায় টায়ারের চটি আটকে যায়—জোরে টান পড়তে ফিতা ছিঁড়ে যায়—তাই কোনরকমে পায়ের আঙুল দিয়ে চেপে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে এগোয়, তারপর এক সময় অবাক—কেমন বোকা বোকা চোখে সে প্ল্যাটফর্মের এধারের পাঁচিল ঘেরা জায়গাটা দেখে—ছেঁড়া চট মাদুর গাছের বাকলের ডেরাগুলি নেই, মানুষগুলি নেই! কটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একপাশে—ওপাশে কিছু রিক্সা—ঝাড়ুদারে ঝাট দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখছে। কোথায় গেছে ওরা, মানুষগুলি কোথায় গেল!

হুঁ, এক দল আন্দামান গেছে, একদল গেছে দণ্ডকারণ্য—কিছু গেল বাঁকুড়ায়, কিছু বীরভূম। যেন ফাঁকা জায়গাটা অট্টহাস্য করে চেঁচিয়ে উঠল: ওরা ঘর পেয়েছে জমি পেয়েছে—তোর কিছু হল না, তুই এখান থেকে গেলি। কড়া সিটি শোনা গেল ওধারে—ঝক্ ঝক্ ঝক্—একটা ট্রেন প্লাটফরম ছেড়ে চলল। থলেটা এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে ঝুলিয়ে বলাই স্টেশনের চৌহদ্দী পার হয়ে রাস্তায় নামল। যেন গলা ধাক্কা খেয়ে সে ওখান থেকে বেরিয়ে এল। আগুন ঝরছে আকাশ থেকে—রাস্তাটা তপ্ত কড়াই। কিন্তু এই রাস্তা ধরে

বলাইকে হাঁটতে· হবে—আজ হাঁটতে হবে, কাল হাঁটতে হবে, পরশু—রোজ। ওই যে আগে আগে চলেছে বেওয়ারিস কুকুরটা ওটার মত। তার ঘর নেই ঠিকানা নেই। বা লাইটপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকা ওই ভিক্ষুকটার মত। ফুটপাথই ঘরবাড়ি। যেন হাঁটতে হাঁটতে বলাইর কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে—যেন ব্রহ্মতালুটা ফেটে যাবে রোদের হলকায়। পা দুটো কাঁপছে, এত ক্লান্ত! একটু কি জিরিয়ে নেবে কোথাও—কিন্তু কোথায় বসবে; না বসে জিরোন যায়? বসা দূরে থাক দাঁড়াবার জায়গাও এখানে নেই; কাতারে কাতারে মানুষ আসছে এদিক থেকে, কাতারে কাতারে মানুষ আসছে ওদিক থেকে। তবু যেন এক পায়ে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা খুঁজে সে একটুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারত। কিন্তু পারছে না। সবাই কেমন এক নজর তাকে দেখে মুখ টিপে হাসছে। পানের দোকানের লোকটা হাসছে, চশমা পরা বাবুটা হাসছে; পর্যন্ত ওই মেয়েটা, নতুন শিকার ধরতে বেরোল যে। বেশ্যারও ঘর আছে, নিজের মতন করে একটা সংসার গড়ে। তোর ঘর নেই—তুই ভবঘুরে। চিন্তা করে বলাইর দাঁড়ান হয় না, মুখ নীচু করে হাঁটে—হাঁটে। জামাটা ছিঁড়ে ফেটে এমন অবস্থা হয়েছে যে কাল পরশু ওটা ফেলে দিতে হবে; না হলে লোকে তাকে ঠিক পাগল ঠাওরাবে। বড় চিরুনিটা অনেকদিন আগেই গেছে—ছোট একটা জোগাড় করেছিল, কাল সেটা মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে দুখান হয়েছে। এতবড় বাবরি—তেল পায় না এক ছিটা। কাজেই মাথার চুলের এখন যেরকম চেহারা হয়েছে তাতে তাকে পাগল বলে ধরে নিতে মানুষের বাধা কোথায়!

শিয়ালদা পিছনে রেখে প্রায় মৌলালির কাছাকাছি এসে গেছে বলাই, আর তখন ডানহাতি একটা দোকানের দরজায় হঠাৎ চোখ পড়তে তার হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠল। সুধীর! চায়ের দোকান খুলে বসেছে। কত বড় দোকান! নিশ্চয় পাঁচশ, না—অনেক বেশি টাকা মাকড়ী পরা মাড়োয়ারীটার পকেট থেকে তুলে নিয়েছিল—আর সেই টাকায় এখন—বলাইর সঙ্গে চোখাচোখি হয়; মুখটা কালো হয়ে ওঠে সুধীরের—ওয়াক করে থুথু ফেলছে দরজায় দাঁড়িয়ে, বলাইর মনে হল তাকে দেখে ঘেন্নায় সুধীর ওরকম করছে। থুথু ফেলে আর যাতে বলাইকে দেখতে না হয় এমনভাবে চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে। মানে, তুই যদি আমার মতন পকেটমার গাঁটকাটা হতিস তোকে ঘৃণা করতাম না; তুই বিশ্বাসঘাতক—কাঁধে হাত রেখে বন্ধু ডেকে যে-লোক বিশ্বাস-

ঘাতকতা করে তার মুখ দেখলে থুথু ফেলতে হয়। সুধীরের মনের ভাব বুঝতে পেরে বলাইর মুখটা আরো নীচের দিকে নেমে যায়, যেন মুখ থুবড়ে পেভমেন্টের ওপর পড়ে যাবে—তাই যত তাড়াতাড়ি পারে সুধীরের দোকান পার হয়ে সে এগোতে থাকে; কিন্তু দু পা গিয়ে বলাই আবার থমকে দাঁড়ায়। ইয়াসিন! তাকে দেখে ঠোঁট টিপে হাসছে—সঙ্গে ওটা কে! এক সেকেণ্ড দেরি হয় না সাদা পোশাক পরা পুলিসের লোকটাকে চিনতে। চোলাইয়ের দোকানে থাকতে সব কটা মুখ সে চিনে রেখেছিল। শরীরটা ঘুরিয়ে বলাই ডানহাতি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল; তারপর পড়ি মরি করে ছুটতে আরম্ভ করল। ইয়াসিন এমন করে হাসল কেন? আর পুলিসের লোকটাই বা তার সঙ্গে কেন? চট করে বলাই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েছে রাজকুমারের সঙ্গে। তাই ইয়াসিন এখন রাজকুমারের দলের সব কটাকে ধরিয়ে দিতে চাইছে। বা পুলিসের কাছ থেকে মোটা টাকা খেয়ে ইয়াসিন একাজ করছে। কিন্তু, বলাই চিন্তা করল, সুধীরও তো দলে ছিল, ওয়াগন ভেঙ্গে ভেঙ্গে—অথচ বড় রাস্তার ওপর দিব্যি চায়ের দোকান খুলে বসে আছে ছোঁড়া! অবশ্য চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মত উবে গিয়ে আর একটা কথা বলাইর মনের ওপর চেপে বসল। ইয়াসিনের হাতে কিছু গুঁজে দিতে পেরেছে সুধীর, তাই ইয়াসিন সেদিকে চোখ বুজে আছে। বলাই একটা ফুটো পয়সাও ইয়াসিনকে দিতে পারবে না। কাজেই তার গায়ের ছাপ কোনদিন মুছবে না; চুরি করে সে বৈঠকখানা বাজারে চোলাই মদ বেচত, চিনাবাদাম বেচবার নাম করে কতদিন শিয়ালদা স্টেশনে রিফুইজিদের ডেরার আশে পাশে ঘুর ঘুর করত, উল্টাডাঙ্গার নামকরা গুণ্ডা রাজকুমারের দলে ভিড়েছিল ব্যাটা—ধর ধর শালাকে। কতক্ষণ ছুটবার পর বলাইর মনে হল কেবল ইয়াসিন আর সেই লোকটা না, যেন অনেক লোক, পঞ্চাশ—একশ, না আরো বেশি—দু-তিন শ লোক পিছনে ছুটে আসছে তাকে ধরতে: ডাকু পালাচ্ছে, চোর পালাচ্ছে—শালা পাগল; না না পাগল না, পাগলের বেশে ছেলেধরা এসেছিল এ-পাড়ায়; মার শালাকে, মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দে। পিছনের মানুষগুলি চিৎকার করছিল—এবার বলাই চোখ তুলে দেখল তার সামনেও ভিড় জমে গেছে। কাজেই আর তাকে ছুটতে হল না—পালাবার রাস্তা বন্ধ। পিছনে মানুষ, সামনে মানুষ—তার দু পাশের গলি থেকের শয়ে শয়ে মানুষ বেরিয়ে এসেছে—অর্থাৎ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, এখন তাকে ইঁদুরের মত টুকরো টুকরো

করে ছিঁড়ে ফেলা হবে। চোখে অন্ধকার দেখল বলাই, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ল।

এমন একটা ছবি। এখানে খড়ের ঘরের দাওয়ায় বসে থেকেও বলাই পায়ে মাথায় শিউরে উঠল। হাতের বিড়িটা অনেকক্ষণ নিবে গেছে। খেয়াল নেই। হাঁ করে শশা মাচার ওধারে বাতাবিলেবু গাছটার দিকে চোখ রেখে সে ভাবছিল—ভাবছিল। বস্তুত এমন একটা সাংঘাতিক ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেন ঠিক করতে না পেরে তার মন খারাপ হয়ে যায়। হাত পা কেমন অসাড় হয়ে আসে। গুম মেরে একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকে। সূর্য হেলে যায়। গাছের ছায়া লম্বা হতে থাকে। তার পর এক সময় মনে মনে কি ঠিক করে নিয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে সে হাতের বিড়িটা ধরায়—বিড়ি ধরিয়ে আবার যখন সে চোখ তুলল চমকে উঠল। পুকুরপাড়ের বাসকঝোপ নড়ছে। ঝোপের ভিতর দুটি মুখ। খোঁপায় ফুল। জঙ্গলের জন্য শরীর দেখা যায় না। যেন পাতার ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে সুন্দর মুখ দুটো এদিকে এগিয়ে আসছে। হতভম্ব হয়ে গেল বলাই। ওরা যত এদিকে এগিয়ে আসছে, তার বুকের—মগজের যন্ত্রণাটা কমে যাচ্ছে। এতক্ষণ কী অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল মাথার ভিতর। আর তার মনে হল চমৎকার একটা গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে। মাটি, ঘাস, কচি শশা, বাতাবিলেবুর পাতা, আর ওই যে ওদের খোঁপার ফুলের গন্ধ মিশিয়ে গন্ধটা।

বুক ভরে সে গন্ধটা নেয়। যেন তার ভিতরের সব ময়লা কেটে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায় মন; শরীরটা হাল্কা ঝরঝরে লাগছে। আর বসে থাকে না—বেড়ার গায়ে একটা খুরপি গোঁজা ছিল, টেনে নিয়ে উঠোনটা পার হয়ে শশা মাচার ওপাশে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়ল বলাই।

'কে, কে গো ওখানে?'

'আমি—নিশ্চিন্তপুরের নতুন মানুষ, তোমরা কে?'

'আমরা নিশ্চিন্তপুরের মেয়ে।'

আর কেউ কথা বলে না। বলাই এক মনে পেয়ারা চারা দুটোর গুঁড়ির মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে নরম করে দেয়। চৈত্রের খরায় মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। বলাই টের পায় দুজন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের পায়ের চাপে আনারস পাতায় খচমচ শব্দ হয়—না কি আনারসের নতুন ডগাটা পা

দিয়ে মাড়িয়ে ওরা ভেঙে দিল। টুস্ করে শব্দ হল না? রেগে যায় সে—তার মন খারাপ হয়। হয়তো মুখ তুলে বলাই বলতে চেয়েছিল: 'চোখ মেলে পথ চলতে শেখনি—তোমরা মেয়েরা বেজায় অসাবধান!' বলা হয় না। একটা চাপা হাসির শব্দে বাগানটা ভরে ওঠে। 'হুঁ, নিশ্চিন্তপুরের মানুষ—আমরা তো জানি শিয়ালদার ফেরিওয়ালা—কিষির কাজ আবার শিখল কবে!'

'কেন?' বলাই আর ঘাড় গুঁজে বসে থাকল না, খুরপি হাতে করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। 'আমার বাবার মতন অমন চমৎকার পাটক্ষেত নিড়াতে কেউ জানত নাকি—সেই বাপের বেটা আমি।'

শুনে সাবি মুখ থেকে আঁচল সরায়। মুক্তার চোখ তখনও মাটির দিকে। দুটিকে এক সঙ্গে দেখে নিয়ে বলাই আকাশের দিকে চেয়ে অনেকটা নিজের মনে বলল: 'আর আমার ঠাকুর্দার মত অত বড় ঘরামী সেদিন ছিল নাকি আমাদের তল্লাটে—তার নাতি আমি—'

বলাইর মুখের কথা শেষ হয় না, সাবির গলায় খুশির ঝিলিক উঠল।

'তবে তো ভালই হল—ঘরের কাজও যখন জানা আছে, এবার ওই ছোট ঘরখানা ভেঙে বড় করতে হবে—বৈশাখ মাস এসে গেল, মনে থাকে যেন দাশমশাই।' সাবি এখন ওই নামে বলাইকে ডাকছে। সাবির দৃষ্টি অনুসরণ করে বলাই তার ছোট খড়ের ঘরের চালের ওপর একবার চোখ বুলায়, তারপর সাবির চোখে চোখ রেখে অল্প অল্প হাসে। অর্থাৎ এমন ভাব দেখায়, কথাটা মনে আছে। সাবি আড়চোখে মুক্তাকে দেখে। কথা বলছে না, হঠাৎ মুখটা লাল করে মেয়েটা মনোযোগ দিয়ে পায়ের কাছের ঘাস দেখছে। বলাইও চোখটা আড় করে হঠাৎ কানে মাথায় লাল হয়ে ওঠা মেয়েটাকে দেখে। তার পর আর কোনদিকে না তাকিয়ে পেয়ারা চারার মাটি খুঁড়তে বসে যায়। এখন তিনজনই নীরব। যেন পাতার সরসর আর ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই পৃথিবীতে।

॥ শেষ